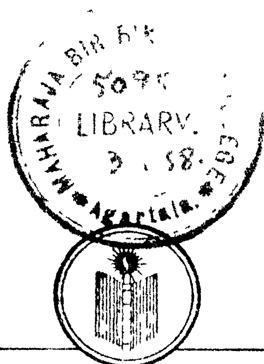
শুভাশুভ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৬১

মূল্য—চার টাকা মাত্র।

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, বাণী-শ্রী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে একটি স্বখ্যাতনামা ছোট নূতন মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে লিখতে স্বরু করেছিলাম। কয়েক মাস প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং যথারীতি আমারও বইটি শেষ করার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়।

এতদিন পরে আবার নতুন করে গোড়া থেকেই বইটি লিখে ফেলেছি

নতুন উপন্যাস ফাঁদার চেয়ে খানিকটা লেখা উপন্যাস লিখে শেষ করা সাধারণত সহজ হয়—যদিও নিয়মটা সব ক্ষেত্রে খাটে না। প্রথম লাইনটি লিখবার আগেই বেশ কিছুদিন উপন্যাসটি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়—কতগুলি দিক ভেবে রাখতে হয়, কমপক্ষে আসল কাহিনীর মূল ভিত্তিটা মনে মনে ছকে নিতে হয়।

অর্থাৎ আরম্ভ করা উপন্যাসে অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকে।

এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।

উপন্যাস লেখার পুরাণো একটি রীতি অথবা নীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন—সেটা এই যে উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল।

আমার প্রথম উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় আমি প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ করি।

কয়েকটি ছোটখাট চরিত্রের বেলা তো বটেই, দু'টি প্রধান চরিত্র মতি ও কুমুদের বেলাতেও কুমুদের সঙ্গে ট্রেনে মতিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়ে সেইখানে ছেদ টেনেছিলাম—লিখেছিলাম যে সন্তানের প্রয়োজনে

হয় তো ওদের কোনদিন নীড় বাঁধার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেটা ভিন্ন কাহিনী, দরকার হলে ভিন্ন বই লিখে সে কাহিনীকে রূপ দেব!

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বইয়ে লম্বা ভূমিকা দেওয়া আমার অভ্যাস নয়। এ বইয়ে এত দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়ার কৈফিয়ৎটাই উপরে সরলভাবে লিখে দিলাম।

এক

লোকে আজও তাদের বড়লোক বলে।

অবস্থা অবশ্য পড়ে গেছে। আগেকার সেই হালচাল নেই। তবু, যে রকম কাহিল অবস্থা চারদিকে সকলের, নুন আনতে ঘরে ঘরে যেভাবে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে—ক্ষয় হয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রাণ—তার সঙ্গে তুলনা করলে আজও তারা বড়লোক বৈকি!

অভাবের কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে পুটি মোরলা পুঁচকে মাছেরা। রুই কাতলা না হলেও তাদের সঙ্গেই গভীর জলে সাঁতার কেটে বাঁচবার মজা তো ভোগ করছে রামনাথেরা।

লোকে জানতে বুঝতে সুরু করেছে যে রাঘব বোয়াল রুই কাতলার পিছু পিছু আরামে সাঁতার কাটার দিন মাঝারিদের আর নেই।

পাল্লা চলেছে গ্রাসের চেষ্টা ঠেকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর।

তবু ক'জন খবর রাখে লোকসানে আর দেনায় দেনায় তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে?

নানাদিক থেকে গুটিয়ে আনতে আনতে আজ কি অবস্থা হয়েছে তাদের কারবারের?

বিলাতী কোম্পানীগুলি রাতারাতি ভোল পাল্‌টে ভারতীয় কোম্পানী বনে যাবার পর থেকেই যেন কেবলি তারা পা পিছ্‌লে পিছ্‌লে আছাড় খাচ্ছে ক্রমাগত।

মহিম বেঁচে থাকতেই এসব ব্যাপার টের পাচ্ছিল সমরেশ।

ভালভাবেই টের পাচ্ছিল। মহিম মারা যাবার পরেই হাড়ে হাড়ে টের পেতে আরম্ভ করেছে।

এই বিরাট সংসারের দায় ঘাড়ে নিয়ে কি করে মহিম টিঁকিয়ে রেখেছিল কারবারটা ?

সে ভাবতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না ব্যাপারটা।

প্রায় ভরাডুবির অবস্থাতে এসে গেলেও কারবারটা কোন ম্যাজিকে সত্যি সত্যি চালু অবস্থাতে রেখে যেতে পেরেছে ?

প্রথমে সত্যিই হেঁয়ালি মনে হয়েছিল।

প্রায় যোয়ান বয়স থেকেই মহিমের বিশ্বস্ত অধীনস্থ বুড়ো বনমালী এ যাত্রা টিঁকে না গেলে বাপের ব্যবসা চালিয়ে যাবার আসল কৌশল চিরদিনের জন্য হেঁয়ালিই থেকে যেত সমরেশের কাছে।

কারবারও খতম হত ছ'মাস কি ন'মাসের মধ্যে।

একই রোগে ধরেছিল মহিম আর বনমালীকে। বয়সও দুজনের একই দশকের কোঠায়।

বনমালীকেই বরং ঢের বেশী বুড়ো আর জীর্ণ শীর্ণ মনে হত তার বাবা মহিমের চেয়ে।

আজ সমরেশ বুঝতে পারে যে মহিমের ভুঁড়ি মোটা নাদুসনুদুস চেহারাটা আসলে ছিল ফাঁপা—কারবারে দুরবস্থা অস্তত তার আহার বিহার ব্যায়াম বিলাসে ঘাঁটতি পড়তে দেয় নি।

তারই কারবারের জন্য সারাজীবন কম খেয়ে বেশী খেটে বাঁচার লড়াই চালিয়ে আসার ফলে বনমালীর চেহারাটা দেখতে ঢের বেশী বুড়োটে হয়ে গেলেও হাড় তার শক্ত হয়েছিল বেশী।

তাই যে রোগ বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের পাহারা বসালেও তিন

দিনে মহিমকে শেষ করে দিল চোদ্দ দিন সেই রোগে ভুগে সামান্য চিকিৎসাতেই বনমালী উঠল সেরে।

কলেজের আনাড়ি বুদ্ধি নিয়ে তার প্রায় বছর খানেক লেগেছে কারবারটা চালু থাকার হেঁয়ালি বুঝতে।

কারণ, বনমালী তাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই করেনি।

সে ক্ষমতাও অবশ্য তার নেই।

বার বার ঠেকে ঠেকে সামলে সামলে, ঠেকে গিয়ে কিভাবে সামলাতে হবে বনমালীর কাছে বার বার তার উপায় বাৎলে নিয়ে নিয়ে, হাতে নাতে তাকে জানতে হয়েছে বুঝতে হয়েছে কৌশলটা। শিখেছে কি না কে জানে!

মুখে বলতে সোজা কাজে করতে কঠিন কায়দা।

এক বছরে এমন অবস্থা কয়েকবার হয়েছে যে অঙ্কশাস্ত্রে পুরো নম্বর পাওয়া ছেলে সমরেশ ভেবে কুল কিনারা পায়নি—পরদিনের ক্রাইসিস কি করে ঠেকানো সম্ভব।

বনমালী বাৎলে দিল উপায়।

আগের বছর ক-বাবুর কাছে কিছু দেনা করে একটা নতুন প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

লাভ হয়নি। তবে লোকসানও যায় নি।

খ বাবুর কাছে আরও কিছু বেশী টাকা ধার করে ক-বাবুর দেনাটা ঠিক সময়ে মিটিয়ে দিতে ক-বাবু গদ গদ হয়ে গিয়েছিল।

সুদ নয়, সুদের হিসেবে টাকাটা দেনা করা যায়নি। লাভের একটা বখরা দেবার কথা ছিল। নগদ ফেরত পেয়ে ক-বাবু খুসীতে গদ গদ হলেও লাভের বখরা না পেয়ে ক্রমে ক্রমে ক-বাবু অনেক বেশী ক্ষুব্ধ এবং ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছে।

গ-বাবুর কাছে অল্প কিছু টাকা নিয়ে ক-বাবুর লাভের বখরাটা মিটিয়ে দিয়ে তাকে খুসী করে আরেকটা প্ল্যানের জন্য তার কাছ থেকে মোটা রকম দেনা আদায় করা যাবে।

চুক্তি করতে হবে লাভের বখরাটা বাড়িয়ে। লাভ যে সত্যই বাড়বে, হিসাব ছাড়িয়ে গিয়ে বেশী রকম বাড়বে, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে ক-বাবুকে।

: কিন্তু দেনা শুধবেন কি করে বুনো দাদু? লোকসান গেলেও লাভের বেশী বখরা দেবেন কোন হিসাবে ?

তার এই রকম শত-শত আকুল-ব্যাকুল প্রশ্নে বনমালী কোনদিন এতটুকু বিচলিত হয়নি।

: এমনি ভাবে এদিক ওদিক ঠেলেটুলেই খারাপ সময়টা কাটিয়ে দিতে হয়। মন্দার বাজার এমনিভাবেই সামলাতে হয়। বাজারের মোড় ঘুরলে বন্যার মত লাভ জমা হবে না বাবা? চাইতে এলে সামান্য দেনা নাক সিঁটকে নগদ ফেলে মিটিয়ে দেব।

এই সহজ কথাটা বুঝতে বছর কেটে গেছে সমরেশের।

এর কাছে দেনা করে ওকে খানিকটা সামলাও, ওর কাছে দেনা করে একে খানিকটা সামলাও।

এইভাবে কাটিয়ে দাও দুর্দ্দিনের কয়েকটা বছর!

যুদ্ধটুদ্ধ আর কি বাঁধবে না? ব্যবসার জগতের হাওয়া কি আর ঘুরবে না ?

তখন দেখে নেওয়া যাবে কে কার পাওনাদার!

সমরেশ প্রায় আঁতকে ওঠে।

: আরেকটা যুদ্ধ বাধবে ?

ধীরে ধীরে কাণে গোঁজা আধপোড়া সস্তা সিগারেটটা ধরিয়ে বনমালী বলে, বাধবে না? যুদ্ধ বাধার ভরসাতেই তো আছি!

সমরেশ ভাবে, তবেই হয়েছে!

কিন্তু মুখে কিছু বলার উপায় নেই। বনমালীর মুনাফার সঙ্কট তো সহজে মানবে না অতীত ভবিষ্যতের হিসাব!

জগৎ জুড়ে রব উঠেছে আর যুদ্ধ চাই না, শান্তির আওয়াজে কাণের পর্দ্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে যুদ্ধবাজদের—বনমালী ভরসায় আছে আরেকটা যুদ্ধের!

কুমার শুনে হেসে বলে, বনমালীরা কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধবাজ নয়, যুদ্ধবাজদের তাঁবেদারও নয়। যুদ্ধ বাধাবার জন্য বনমালী কস্মিনকালে এতটুকু চেষ্টাও করবে না। যার খুসী যুদ্ধ বাধাক—যুদ্ধ বাধলে বাজার ফাঁপে, ওর কারবারে বেশী পয়সা আসে, এইটুকুই ও জানে। আসল দাম কমে পয়সা যে হাল্কা হয়ে যায়, ক'বছর বাদে ওদের আরও সাংঘাতিক বিপদের ব্যবস্থা তৈরী হয়ে থাকে—এসব কথা বনমালীদের মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

সমরেশ বলে, ব্যবসা বাণিজ্য টাকা পয়সার ব্যাপারটা আমার মাথাতেও ঠিক ঢোকে না ভাই।

: কেন, মোট কথাটা বোঝা তো কঠিন নয়? এ তো সোজা হিসাব! যুদ্ধ তো চিরকাল চলতে পারে না পৃথিবীতে! বাজারও চিরকাল ফেঁপে থাকতে পারে না। যুদ্ধকে একদিন শেষ হতেই হবে, ফাঁপা বাজারটাও খেলনা বেলুনের মত চুপসে যাবেই।

সমরেশ বলে, আখেরে লাভ নেই, এটুকু বুঝি। যুদ্ধে হিউজ্ স্কেলে

মানুষ মরে, জখম হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্ভিক্ষ গজায়—ওসব জানি। যুদ্ধের মোটা লাভ শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে না, তাও তো দেখছি। বাবা কি সোজা টাকা লুটেছিল যুদ্ধের সময়! নিজের ঘরের খবর সব জানি তো। আসল বড়লোক ছিল ঠাকুর্দার বাবা আর তার বাবা ঠাকুর্দা শুধু ঠেকিয়ে গিয়েছিল, বাবা ডুবতে বসেছিল—যুদ্ধটা বাধায় যেন মনে হয়েছিল সামলে গেল।

সমরেশ ঝাঁঝালো হাসি হাসে।

: সব দুদিনের ভেলকি বাজী। কদিন খুব বড়লোকামি চলেছে—তারপর আবার যে কে সেই—নেই নেই নেই। দেড় দু'হাজার থেকে পূজার খরচ বিশ হাজারে উঠেছিল, এবার অনেক ঝগড়া ঝাঁটি মারামারি করেও বনমালীর কাছে পূজার খরচ আদায় করা গেল না।

কুমার আশ্চর্য্য হয়ে বলে, বনমালী মালিক নাকি এখন?

সমরেশ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলে, মালিক নয়, কর্তা—ম্যানেজার। বাবাই ব্যবস্থা করে গেছে। বনমালী ব্যবসা চালাবে—ওর কথার ওপর কারো কোন কথা চলবে না। সংসারের খরচ স্যাংসন করবে, আমাদের হাত খরচ স্যাংসন করবে।

এবারও পূজায় সরগরম হয়েছে হয়ে উঠেছে বাড়ীটা। পূজা হবে না তবু বেশ কিছু আপনজনেরা এসে হাজির।

সব চেয়ে আগে হাজির তিন বোনের তিন স্বামী আর এক কুড়ি ছেলে মেয়ে।

আগে থেকে চিঠিপত্র লিখেই এসেছে। সমরেশের বাবার মরণে নাকি বড়ই কাতর তার বিবাহিতা মেয়ে তিনজন।

আরেকজন বিবাহিতা মেয়ে অবশ্য বিয়ের পর একটা বছর না যেতেই বাপের ঘরে এসে ডেরা বেঁধেছে।

বাপের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজটা তারা বাপের বাড়ীতেই করতে চায়। এমন বাবা জগতে আর হয় না। মেয়েদের খাইয়ে পড়িয়ে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে যথারীতি বিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য ব্লাড প্রেসার অগ্রাহ্য করে কী খাটাই না খেটে গিয়েছিল।

মাসী পিসী মামাদের জন কুড়ি মানুষের ভীড়ে নয়, এই তিন বোনের তিনটে স্বামী আর একুশটা ছেলেমেয়ের জন্যই যেন পৈতৃক বাড়ীটা ঠাসাঠাসি হয়ে যায়।

পূজার তিনটা দিন কেটে গেল হৈ হুল্লোড়ে। বাপের মরণের অজুহাত নিয়ে বোনেরা ঘাড়ে চেপেছে—এ দায় সামলাতে হবেই।

নইলে তার জন্মই বৃথা।

কিন্তু কি করে সামলাবে?

সামলে গেল বনমালী।

হাসিমুখেই সামলে গেল। কে বলবে যে প্রাণ দিয়ে মহিমের কারবার সামলাতে নেমে দু'চোখে সে অন্ধকার দেখছে। চারিদিকে দেনার পাহাড়, কারবারের ডুবু ডুবু অবস্থা—সব ছেড়ে দিয়ে একদিন কাশীবাসী অথবা বনবাসী হবার সাধটা মাঝে মাঝে বনমালীর প্রাণে উঁকি দিচ্ছে।

বিজয়ার রাত্রি প্রভাত হতেই কিন্তু বনমালীর অন্য চেহারা সকলের চোখে ধরা পড়ে।

এবার পূজা হয় নি। বাড়ীতে রকমারি খাবার জিনিষের ছড়াছড়ি নেই। বনমালী হিসেব করে রোজকার খাবার-দাবার আনিয়েছে, সকলকে খাইয়েছে।

মহিম মরেছে। পূজা হল না। জামা কাপড় না পাওয়ার দুঃখ কেউ গায়ে মাখে নি।

গতবার পূজা হলেও ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে রাজভোগ খাওয়ার সুখ পাওয়া যায় নি, এবারও পাওয়া গেল না। কিন্তু পূজার কদিন নষ্ট না করে গত বারের মতই এবারও যে যত পারে খাওয়াবার নিয়মটা বজায় আছে।

বিজয়ার পরদিন সকালেও ঘরের মানুষ এবং বাইরের যত মানুষ বিজয়া করতে এল সবাই আগের মতই পেট ভরে মিষ্টি খেল।

ক্রাইসিস দেখা দিল রাত্রির ভোজনের ব্যাপারে।

সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বনমালী বার হয়েছিল বিজয়ার নিয়ম রক্ষা করতে—ব্যক্তিগত নিয়মরক্ষা নয়, ব্যবসার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দরকারী খাতির রক্ষা করতে।

সারাদিন তার দেখা নেই।

এতগুলি মানুষের রাত্রির খাওয়ার ব্যবস্থা করতে কি ভুলে গিয়েছিল বনমালী?

তেল ঘি. চাল ডাল তরকারী সবই আছে কিছু কিছু—চার পাঁচ জনের মত আছে!

বিকাল হয়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। বনমালী ফেরে না।

ছোট বড় প্রায় চল্লিশ জন মানুষের রাত্রের খাবার জন্য রান্না চড়ানো যায় না।

বড় উনান দুটো ধরাবার মত কয়লা পর্য্যন্ত বাড়ীতে নেই।

সমরেশের মা কল্যাণী ব্যাকুল ভাবে বলে, এম্‌নি হাত খালি তোর? একটা বেলা চালাতে পারবি না?

: পয়সা-কড়ি আমায় কিছু দেয় নাকি?

মা কোথা থেকে লুকানো একটা ভাঙা সোণার সেকেলে জিনিষ এনে দিয়ে বলে, যাক গে, বনমালী চিরকাল পাগল। ওর নিজের কি স্বার্থ আছে বল? কীই বা খায়—পাখীর আহার। তোদের ভালর জন্যই পাগলামি করছে।

অনেক রাতে বাজার নিয়ে বনমালী বাড়ী ফেরে।

কল্যাণীর অনুযোগের জবাবে হাই তুলে বলে, টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম—তবিলে কি কিছু আছে আর? ছুটির বাজার,, টাকা যোগাড় করা কি সোজা ব্যাপার! কাল পরশু বাদে কি হবে তা শুধু ভগবান জানে!

জোরে জোরে সকলকে শুনিয়েই বনমালী এসব বলে।

সমরেশের মুখটাই সব চেয়ে বেশী লাল হয়ে যায়।

অন্য আত্মীয়েরা অনেকেই পরদিন বিদায় নেয়, বাকী ক'জনও কেটে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যে।

বোনেরা নড়ে না। তিন স্বামী আর একুশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে।

সেদিন রাত্রেই নিজেরা পরামর্শ করে, বনমালী ফিরে আসার পর রাত দুটো পর্য্যন্ত।

পরদিন দুপুরে মাকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসে। সমরেশকেও তারা ডাকত কিন্তু শোনা গেল, খেয়ে দেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বেরিয়ে গেছে।

পরামর্শ যত না হল, কল্যাণীকে বোঝানো হল তার চেয়ে ঢের বেশী। কল্যাণী থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে। তিন মেয়ে কথা বন্ধ রেখে তাকে সামলায় আর বোঝায়।

কল্যাণী বার বার বলে, ছেলেমানুষ সমু কি সামলাতে পারে রে? কে জানে কি কাণ্ড হচ্ছে!

মেয়েরা বলে, ভাবছ কেন মা? আমরা তবে রয়ে গেলাম কেন? তোমার জামাইরা তো পাকাপোক্ত মানুষ—ব্যাপার সব বুঝে শুনে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে নিশ্চয়। সমু ছেলেমানুষ, বুনো দাদু পাগলা, কিন্তু তোমার জামাইদের তো ভীমরতি ধরে নি! অত ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বনমালী সেদিন বাড়ী ফেরে রাত দশটায়। মহিম বেঁচে থাকতেই তার সকাল আর রাত্রির ছাঁকা আহারের ব্যবস্থা বাঁধা ছিল। সামান্য আহার, কল্যাণীর ভাষায় সত্যই পাখীর আহার—কিন্তু সেটুকু ছাঁকা জিনিষ।

এবার পুজো পর্য্যন্ত সে নিজেই বজায় রেখেছিল নিজের আহারের ব্যবস্থা। সকাল আটটায় কারবার করতে বেরিয়ে রাত নটা দশটায় ফিরে সে আহার করত আধ ছটাক চিঁড়ে ভেজা, ছটাক খানেক দুধ আর কিনে আনা একটি সন্দেশ।

আজ বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সবে সে জপ সেরেছে, তিন বোন তাকে একরকম পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে খেতে বসায়, বলে, খাবে এসো বুনো দাদু।

আসন পেতে তার খাওয়ার জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাছ, মাংস পোলাও ডাল তরকারী ভাজাভুজি—

বনমালী ফোকলা মুখে এক গাল হাসে, বুঝেছি দিদিরা, বুঝেছি। তোদের বুনো দাদু এসব খেত তিরিশ বছর আগে। তোমাদের তো মনে থাকার কথা বড়দিদি মেজদিদি? মহিমকে কিভাবে সামলাতে হত। পেটে যায়গা নেই, মুখে রুচছে বলেই খেয়ে চলেছে।

বনমালী আরও ব্যাপকভাবে হাসে, নাতনী তোমরা, গিন্নি হয়েছ, তবু তোমরা বুঝবে বৈকি। যোয়ান যোয়ান যে শালাদের জন্য আসলে এসব রেঁধেছ, তাদের খাওয়াওগে না? এ বুড়োকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি কেন!

তারা কেউ ভাবতেও পারে নি বনমালী এভাবে তাদের ষড়যন্ত্র ঘায়েল করে দেবে। মহিম চিরদিন তার সঙ্গে অধীনস্থ কর্মচারীর মত ব্যবহার করত। বাড়ীর সকলের সামনেই যখন তখন কত তর্জন গর্জন করত আর গালাগালি যে মহিম তাকে দিত—সে সব তো মনে আছে মহিমের বড় মেয়েদের।

তবে, এটাও অবশ্য ঠিক যে বাড়ীর অন্য কেউ বনমালীকে একটা কড়া কথা শোনালে, তার সঙ্গে কর্তালি মার্কা কোনরকম রূঢ় ব্যবহার করলে মহিম ক্ষেপে যেত।

বনমালীর সামনে দাঁড় করিয়ে ক্ষমা চাইয়ে নিয়ে তবে বাড়ীর মানুষকে রেহাই দিত।

ক্ষমা চাওয়ামাত্র বনমালী কি ভাবে ক্ষমাপ্রার্থিনীকে শীর্ণ দেহের শক্ত পাঁজরায় জড়িয়ে ধরে একটু ধমকের সুরেই বলত—মহিম, কি পাগলামি করছ? সে স্মৃতিও মন থেকে মুছে যায় নি। যাবার কথাও নয়।

মহিম হিসাব করত না, যে মেয়েকে ক্ষমা চাইতে এনে দাঁড করিয়েছে সে যুবতী না বালিকা। ক্রমাগত মেয়ের বাপ হতে হতে সে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল যে মেয়েরা আঁতুড়ে সব শিশুর মতই ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে কিন্তু কয়েক বছরেই তারা হয় বালিকা, আরও কয়েক বছরে তরুণী এবং আরও কয়েকটা বছর পরে যুবতী।

ব্রততীর বিয়ে হয়েছিল, একটি ছেলে হয়েছিল। বনমালীই সব

ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। হাসপাতালে নেওয়া থেকে সপুত্র তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত শুধু নয়, ছেলের পাঁচ মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার কবরেজ আনানো আর ওষুধ পথ্য খাওয়ানোর সব ব্যবস্থাই করেছিল।

ব্রততী জানত, মাইনে করা ভাড়া করা অধীন লোকেরা এসব করেই থাকে। কর্তার কাছে খাতির বাড়ে বলে করে থাকে।

হঠাৎ চিঠি এসেছিল। একদিনের মধ্যেই তাকে রওনা দিতে হবে স্বামী শ্বশুরের সংসারের দিকে। অনেক গাওনা গেয়ে, অনেক অজুহাত কষে পাঁচ মাস সে বাপের বাড়ী কাটিয়েছে—এবার ফিরে যেতেই হবে স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী ননদদের ঘরে, তার নিজের সংসারে।

ভোর সাতটায় এই চিঠি পোষ্ট করা হল বেলা তিনটার গাড়ীতে তার দেওর রওনা হবে।

ভোর বেলা পৌছবে।

ভোরের গাড়ীতেই যাতে রওনা হওয়া যায় সেজন্য ব্রততী যেন তৈরী হয়ে থাকে। ব্রততীর শ্বশুরের মর মর অবস্থা, নাতিকে দেখবার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে, সুতরাং কোন কারণেই রওনা হতে যেন বিলম্ব না করা হয়।

এতই উত্তেজিত বিচলিত হয়েছিল ব্রততী যে চিঠিখানা দেখাতে বা মুখে জানাতে ভুলেই গিয়েছিল মা বাবা কিম্বা বনমালীকে যে ভোরবেলা তার স্বামী আর শ্বশুরবাড়ীর প্রতীক একজন যোয়ান বয়সী দেওর এসে হাজির হবে তাকে নেওয়ার জন্য।

আবছা ভোরে দু'চারজন মানুষ তখন জেগেছে। কলের ভোঁ বাজেনি। জপ তপ সেরে বনমালী সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে নিমের ডাঁটা দিয়ে দাঁতগুলি ঘষে মেজে চলেছিল প্রায় আধ শতাব্দীর অভ্যাসের জের টেনে।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আঁটোসাঁটো পোষাক পরা বিরাম। এ রকম টাইট পোষাক সচরাচর চোখে পড়ে না, সে যেন সর্বাঙ্গে সংসারত্যাগীদের একমাত্র অবলম্বন ল্যাঙট এঁটেছে সার্ট আর প্যান্টের কায়দায়।

: বৌদিকে নিতে এসেছি। দেরী করতে পারব না। মোড়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। খবর দাও তো গিয়ে। এখুনি যেতে হবে, আধঘণ্টার মধ্যে।

বনমালী দাঁত ঘষতে ঘষতেই বলেছিল, তোমার নাম কি হে ছোকরা বাবু? কোন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছ?

ব্রততীর বোধ হয় জানাই ছিল। ব্রততী বোধ হয় তৈরী ছিল, আড়ালে ছিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিল, এ আমার দ্যাওর বুনো দাদু। আমায় নিতে এসেছে।

: বেশ তো। এসো গিয়ে। যাত্রা শুভ হোক।

টুক্ করে ভেতরে ঢুকে বনমালী সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। দ্যাওরের সঙ্গে ব্রততী এভাবে শ্বশুরবাড়ী যেতে চায়—যাক।

তার পাঁচ মাসের ছেলে এখানেই থাক। তার জিনিষপত্র বাক্স প্যাঁটরাও থাক।

দুহাতে দরজা ঠেলে ঠেলে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে পাগলিনীর মত ব্রততী অনেকক্ষণ চেঁচিয়েছিল, দরজা খোল, শীগগির দরজা খোল।

বনমালীর বিনয়নম্র অনুরোধ উপেক্ষা করে শেষ পর্য্যন্ত দরজা খুলেছিল কল্যাণী। বাড়ীতে ঢুকেই ব্রততী বনমালীকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছিল। লাথি চড় মেরেছিল। বিরাম তাকে ফেলেই হয়তো গলির মোড়ে দাঁড় করানো ট্যাক্সিতে পালিয়ে যেত—কিন্তু তারও

তো বয়স কম। যতই বিকৃত করে দেওয়া হয়ে থাক—তার মনেও তো শত শত বছরের প্রকাণ্ড গাছগুলির শিকড় গাঁথা।

প্রীতি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে এনেছিল। সমরেশকে দিয়ে ট্যাক্সির মালপত্র আনিয়ে নিজের গোনা গাঁথা টাকা পয়সা থেকেই ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি বিদায় করেছিল।

মহিম বেড়ানো সেরে বাড়ী ফিরেছিল ঘণ্টাখানেক পরে।

মুখ হাত না ধুয়ে, কিছু না খেয়ে যথারীতি গড়গড়া টানতে বসেছিল।

গড়গড়া টানতে টানতে ডেকে পাঠিয়েছিল সকলকে, মন দিয়ে সকলের কথা শুনেছিল।

শেষ কথা বলেছিল ব্রততী, কতদূর আস্পর্দা ভ্যাখো বুনো দাদুর। শ্বাওরের সামনে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়! পাড়ার লোক চেয়ে আছে—

মহিম উল্টে তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, চুপ কর। এতবড় আস্পর্দা তোর শ্বাওরের, রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে সদর দরজায় এসে হুকুম ঝাড়ে চটপট বৌদিকে আসতে বল! তোকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত হয় নি।

তারপর হুকুম জারি করেছিল, যেহেতু ব্রততী বনমালীকে লাথি মেরেছে সেই হেতু ব্রততীকে তার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

বনমালী কড়া সুরে বলেছিল, তোমার মাথা ঠিক নেই মহিম। বামুনের মেয়ে আমার পায়ে হাত দেবে কিরকম ?

: ও বামুনের মেয়ে নয়—চাঁড়ালের মেয়ে। নইলে শ্বাওর এসে ওভাবে তু তু করে ডাকতেই যেতে রাজী হয়? বাপের অপমানের কথাটা খেয়াল করে না ?

বিরাম হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিল, চিঠিতেই তো সব কথা লেখা

হয়েছে? আপনার অপমান হবে কেন? গাড়ী টাইম মত পৌছলে এইভাবে ট্যাক্সি করে বৌদিকে তুলে নিয়ে গেলে ফেরার ট্রেনটা ধরতে পারব। নইলে সেই সন্ধ্যার গাড়ী। বাবা ওদিকে পাগল হয়ে গেছে—

ব্রততী মাথা হেঁট ক.ে ছিল। মহিমের হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল গড়গড়ার নল।

: বেয়াই পাগল হয়ে গেছে?

: দাদা তো সব খুলে লিখেছে চিঠিতে? দাদার চিঠি পান নি?

হেঁট মাথা ব্রততী ব্লাউজের ভেতর থেকে খামের চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিয়েছিল। বাপের নামের খামের চিঠি খুলেছে বলে নয়, সবাই খুলে থাকে বাড়ীর ঠিকানায় লেখা চিঠি। মহিমের সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনে এমন কোন গোপনতাই ছিল না যে খামের চিঠি বৌ ছেলে মেয়ে খুলে পড়লে তার অসুবিধা হত।

পাঁচমাসের ছেলেটা ককাচ্ছিল বলে তাব পুঁচকে বালিসের নীচে খামটা গুঁজে দিয়ে সারাদিন ছেলে সামলাতে বিব্রত হয়ে থেকে চিঠির কথা ভুলে গিয়েছিল বলেও নয়। রাত্রে মহিম বাড়ী ফিরলে খেয়াল করে তাকে চিঠিটা দেয়নি বলেও নয়।

সে যদি চমকে উঠে বলত, ওমা, চিঠিটা খোবনের বালিশের নীচে রেখেছিলাম—একেবারে ভুলে গেছি। জ্বর আমাশায় ভুগে ভুগে একেবারে শেষ কবে দিলে খোকাটা আমায়।

বলে একবার কি দু'বার কপাːটা চাপড়ে দিয়ে উঠে গিয়ে সে যদি ছেলের বালিশের তলা থেকে খামটা এনে মহিমকে দিত—মহিম শুধু মনে মনে আপশোষ করে ভাবত যে চাকরে জামায়ের হাতে মেয়েটাকে দিয়ে কি বিশ্রী রকম বোকামিই সে করেছে—মেয়েটা হয়ে গেছে ন্যাকা।

ট্যাক্সি নিয়ে বিরাম আসার পর বনমালী গোলমাল সুরু করলে সে ছেলের বালিশের তলা থেকে খামটা বুকের কাছে ব্লাউজের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

এ বাড়ীতে একমাত্র সেই চব্বিশ ঘণ্টা ব্লাউজ পরে।

খামটা হাতে নিয়ে মহিম বার বার ব্রততীর হেঁট করা মুখের দিকে চেয়েছিল। কে জানে কি ভেবেছিল মহিম। সমরেশ আজও ভেবে পায় না। খুব ছোট ছিল কিন্তু চোখের সামনে আজও জ্বল জ্বল করছে এই সব দৃশ্য।

খাম খুলে চিঠিটা আগাগোড়া দু'বার পড়েছিল ধীর ভাবে।

পত্রখানা জামাইয়ের। নাতিকে দেখার জন্য তার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে—যায় যায় অবস্থা।

ডাক্তাররা পরামর্শ করে নাকি তাকে বলেছে যে নাতিকে তাড়াতাড়ি আনা দরকার।

তারপরেই ঝোঁক চেপেছে নাতিকে আনবার। বসে বসে হিসাব করেছে যে কে যাবে, কোন ট্রেনে যাবে, কিভাবে কত তাড়াতাড়ি আনা যাবে কলকাতা থেকে নাতি আর তার মাকে।

মহিম উঠে দাঁড়িয়েছিল, বোধ হয় ব্রততীকে একটা চাপড় কষিয়ে দেবার জন্যই, বনমালী উঠে এসে তাকে ধরে জোর করে বসিয়ে দেবার পর সে ব্রততীকে বলে, আজকেই চলে যাবি। আর কোনদিন আসবি না। এমন চিঠি যে চেপে রাখে সে আমার মেয়ে নয়।

এই সোরগোলের মধ্যেই হঠাৎ টেলিগ্রাম এসে গিয়েছিল যে ব্রততীর শ্বশুর মারা গেছে।

টেলিগ্রামে এ নির্দেশও ছিল যে তাড়াহুড়ো করে ব্রততীর যাবার দরকার নেই।

বিরাম পাগলের মত চীৎকার করে বলেছিল, আমি তবে কি করব ?

মহিম বলেছিল, কি আবার করবে, সন্ধ্যার গাড়ীতে ওদের নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।

বিরামের মাথা ঘুরছিল, কান্না আসছিল—দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বসেছিল চুপচাপ।

অর্থাৎ ব্রততী আর তার বাচ্চাটাকে নিয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা দেবে, এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল।

দুপুরে সমরেশের সামনেই ব্রততী ঘণ্টাখানেক বিরামকে বুঝিয়েছিল, পরামর্শ দিয়েছিল। সমরেশ কিছু বুঝবে না, এই ছিল তার ধারণা।

ব্রততী বলে গিয়েছিল, বিরাম একটা চিঠি লিখে ফেলেছিল মহিমের কাছে। 'শ্রীশ্রীচরণেষু তালুই মশাই' সম্বোধন ফেঁদে লিখেছিল যে টেলিগ্রামে যখন স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে বৌদিকে নিয়ে যেতে হবে না, বৌদিকে নিয়ে যাওয়ার সাহস তার নেই। নিয়ে যাওয়া উচিতও হবে না। বাপ মরার খবর পেয়ে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। পথে হয় তো বিপদ-আপদ ঘটে যাবে। সুতরাং সে একলাই বিদায় নিল।

মেয়েকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে সন্ধ্যার আগে বাড়া ফিরে বিরাম মালপত্র নিয়ে বিদায় হয়ে গেছে শুনে এবং তার চিঠি পড়ে মহিম বলেছিল, ভারি চালাক চতুর ছেলে। কিন্তু একদম তেজ নেই। চিঠিতে লিখে রেখে পালিয়ে না গিয়ে কথাগুলো আমার মুখের ওপর বলতে তো পারত ? আমি কি ওকে কয়েদ করেছিলাম !

ব্রততী বলেছিল, কয়েদ করতে পাব ভেবেই হয় তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

সকালের পাওনা চড়টা কী জোরেই যে পড়েছিল ব্রততীর গালে— তার নাতির মা মেয়ের গালে!

বনমালী আপশোষ করে বলেছিল, মহিম, ব্রেক সারাও, ব্রেক সারাও। এবার অ্যাকসিডেন্ট হবে যে!

অনেককাল আগেকার কথা এসব। সে তখন ছিল বালক। স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে ঘটনাগুলি।

তারপর যথা নিয়মে চিঠিপত্র লেখালেখি করে জামাই এসে এক রাত্রি শ্বশুর বাড়ী থেকে ব্রততী তার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল।

কারো সঙ্গে হাসিমুখে একটি মিষ্টি কথা বলেনি সোমনাথ। নেহাৎ যেন কায়ক্লেশে শ্বশুর বাড়ীর আদর যত্ন সহ্য করেছিল—উপায় নেই বলেই অনেক কিছু চুপচাপ মেনে নিয়েছিল।

টের পাওয়া গিয়েছিল যে তার বড়ই রাগ আর অভিমান। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার রাগ অভিমান ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল বাড়ীর সকলে।

কেবল সমরেশকে সে খাতির করেছিল। সব সময় কাছে ডেকে রেখেছিল, হাসি গল্প চালিয়েছিল আর থেকে থেকে এটা চাই ওটা চাই বলে নিজের দরকারগুলি মিটিয়েছিল।

শ্বশুর বাড়ীর ওপর রাগ দেখিয়েছিল নিদারুণ অনিচ্ছা দেখিয়ে খেয়েছিল মাছ মাংস সন্দেশ রসগোল্লা।

কে কি ভাববে অগ্রাহ্য করে ব্রততী নাকে মুখে ডাল ভাত গুঁজে তাকে সামলাতে গিয়েছিল।

আধঘণ্টার পর ব্রততীকে আর ভাল লাগেনি সোমনাথের।

চোঁয়া ঢেকুর তুলতে তুলতে সমরেশকে বলেছিল, একটা সোডা এনে দিতে পার?

বনমালী মহিমকে ব্রেক সারাতে বলেছিল, সতর্ক করে দিয়েছিল যে নইলে দুর্ঘটনা ঘটবে।

আজও সমরেশের মনে প্রশ্ন জাগে—বনমালী কি টের পেয়েছিল দুর্ঘটনা কিভাবে আসবে?

শরীর খারাপ বলে রাত্রে কিছু না খেয়েই মহিম শুয়ে পড়েছিল। সংসারের সকলের খাওয়া দাওয়ার ঝন্‌ঝাট মিটিয়ে নিজে খেয়ে স্বামীর বিছানার মাথায় কাচের টিপয়ে জলের গ্লাসটা রাখতে গিয়ে মহিমের শোয়ার ভঙ্গি দেখেই খটকা লেগেছিল কল্যাণীর মনে।

খাটের পাশে বসে নিত্যকার মত মাথা নামিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই টের পেয়েছিল, জিজ্ঞাসার চেষ্টা বৃথা।

মহিমের ঘুম আর কোনদিনই কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না, সে আর জাগবে না, সে আর খাবে না।

দুই

তিনমেয়ে মাকে ভরসা দিয়েছিল যে বনমালী যদি গণ্ডগোল কিছু ঘটিয়েই থাকে তাদের বাপের কারবারে—তার তিন পাকাপোক্ত বুদ্ধিমান জামাই সব ঠিকঠাক করে দেবে।

কারবারের ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে না দেবার পাকাপোক্ত অধিকার মহিম বনমালীকে দিয়ে গিয়েছিল—ইচ্ছা করলেই সে জামাইদের খাতাপত্র দেখাতে অস্বীকার করতে পারত, জেরার জবাবে নিজে কিছু বলা দূরে থাক, লোকজনকে পর্যন্ত জবাব দিতে নিষেধ করে দিতে পারত।

জামাই আদরে তিনজনকে চা মিষ্টি খাইয়ে দলিলটা নাকের ডগায় ধরে বলতে পারত, আচ্ছা, এবার তোমরা এসো গিয়ে।

কিন্তু সে যেন বেশী রকম আগ্রহ নিয়ে তাদের সব কিছু দেখায় শোনায় জানায়—এবং বোঝায়!

দু'দিনেই আগ্রহ ঝিমিয়ে যায় জামাইদের। জরুরী কাজের অজুহাতে একে একে তারা একরকম পালিয়েই যায়। তবে মহিমের তিনমেয়েকে এবং ছেলেমেয়েকে রেখে যায়।

খরচের টাকা দিয়ে যায়। তারা খরচ দিয়ে থাকবে, বাপের বার্ষিক কাজটা সারবে।

এখন সময় নেই, উপায় নেই—তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবার সময় কারবারের একটা সুব্যবস্থা করে যাবে।

প্রায় এক সময়েই তিন জামাই বিদায় নেয়, তবে একসঙ্গে এক বেলাতে নয়।

তিনজনে যাবে তিনদিকে, তিন'ট ভিন্ন গাড়ীতে।

পারিবারিকভাবে একদিন ভোরে সুরু হয়ে বিকালেই শেষ হয় জামাই-বিদায়ের পর্ব্ব। বেশ বেলা থাকতেই।

বড় মেয়ে বিছানা নেয়। অন্য দু'জন পরস্পরের চুল বেঁধে দেবার জন্য আসে ব্রততীর ঘরে।

আশ্চর্য্য এই যে বড় বড় কুমারী বোনেদের চুল বাঁধার তাগিদ থাকলেও তারা দিদিদের এই চুল-বাঁধা সম্মেলনের ধারে কাছে উঁকি দেয় না।

কাছাকাছি বয়সের তিনজন কম বেশী ছেলেমেয়ের মা গিন্নিবান্নি মেয়েমানুষ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে মিনিট চারেক চুপচাপ থাকতে পারে—এই অদ্ভুত ব্যাপার একমাত্র সমরেশ ছাড়া কারো নজরে পড়ে না।

ব্রততীর কাছে কয়েকটা টাকা নেওয়ার জন্য সে পাশের ঘরে ওৎ পেতে ছিল।

ওদের চাপেই ভোরের গাড়ীর বদলে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হতে রাজী হয়ে সোমনাথ ভোরবেলা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে বিদায় হওয়ার পরেই ওরা এসে জুটেছিল ব্রততীর ঘরে।

মিনিট কয়েকের বেশী কি আর। চুপচাপ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে পারে মেয়েরা।

ব্রততী প্রথম মুখ খোলে।

: তার মানেই বাবার কারবার শেষ হয়ে গেছে। দু'হপ্তা থাকবে ঠিক করে এসেছিল, দরকার হলে আরও এক হপ্তা যাতে থাকতে পারে

সে ব্যবস্থাও করে এসেছিল। বাবার কারবারের অবস্থা আঁচ করেই পালিয়ে যাচ্ছে।

বড় বোন সতী বলে, পালাবে কেন, লেজ গুটিয়ে পালাবার মানুষ ওরা নয়। ফাঁকা চেষ্টায় কিছু করা যাবে না, সব কিছু চুলোয় গেছে, অসম্ভব দায় না নিয়ে তাই কেটে পড়ল। উনিও তাই বলছিলেন। নিজেদের খরচে থেকে নিজেদের খরচে বাবার কাজটা করে যাব তাতে কোন দায় নেই, কয়েকটা টাকার মামলা। বাবার কারবার চুলোয় গেছে, ঠেকানো যাবে না।

কাজের কাজ শেষ হয়, দু'একদিনের মধ্যে ফিরে আসছে জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গিয়ে জামাইরা কেউ তাদের নিতে আসে না। চিঠি আসে তিনজনের, নিজের নিজের ষ্টাইলে লেখা পৃথক চিঠি কিন্তু তিনটি চিঠিরই মোদ্দা কথাটা এক রকম।

জরুরী ব্যাপারে জড়িয়ে গেছে, এখন আর তাদের কলকাতা আসা সম্ভব নয়।

একথা স্পষ্টই বোঝা যায়, কারবারের অবস্থা দেখে তারা এমন ভড়কে গেছে যে দায় ঘাড়ে চাপার ভয়ে তারা কেউ আর শ্বশুরবাড়ীর ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না।

তিন বোনও হঠাৎ যেন নিজেদের ঘর সংসারে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বনমালী অবশ্য কেবল আর একটা যুদ্ধের আশাতেই বসে ছিল না, অন্য প্যাচ কষার সুযোগও খুঁজছিল।

প্যাচ তার মাথায় আসে, সুযোগও জুটে যায় কিন্তু কারবারের ব্যাপারে প্যাচ কষতেও কিছু টাকা দরকার হয়।

বনমালী কল্যাণীকে বলে, বৌমা, তোমায় তো একবার ভায়ের কাছে যেতে হয়। কিছু টাকা আনতে হবে।

কল্যাণী বলে, টাকার জন্য ভবানীর কাছে আমাকে যেতে বলেছেন? আমি পারব না।

বনমালী বলে, একেবারে মরণ বাঁচনের কথা কিন্তু বৌমা। সামান্য মান অভিমানকে বড় কোরো না। টাকাটা পেলে কারবারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া যাবে। এ সুযোগ ফস্কে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কল্যাণী বলে, আপনি তো সব জানেন। গিয়ে কি হবে? টাকা দেওয়া দূরে থাক, হয় তো কথাই বলবে না। তিনি অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার পর দশ বছর একখানা চিঠি লেখে নি। আমি যেচে সমুকে মাঝে মাঝে পাঠাই, ওর সঙ্গে পর্যন্ত ভাল করে কথা কয় না।

বনমালী ভেবে চিন্তে সমরেশকে বলে, ছোটমামী তোকে না খুব ভালবাসে?

: শরীর ভাল থাকলে আদর যত্ন করে, নইলে করে না।

: তা হোক, তুমি একবার মামীর কাছে যাও। বুঝিয়ে বল গিয়ে যে এই বিপদ, মামাকে বলে তিনমাসের জন্য টাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বলবি যে মামার কাছে টাকাটা কিছুই নয়, ফিরে না পেলেও মামার কিছু আসবে যাবে না—কারবারটা ডুবলে তোদের সব্বোনাশ হয়ে যাবে, হয় তোদের সবার দায় শেষ পর্যন্ত মামাকে ঘাড়ে নিতে হবে।

সমরেশ বলে, তুমি গেলেই তো পার বুনো দাদু? ভাল করে সব কথা মামাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

বনমালী মাথা নেড়ে বলে, আমার কথা কি কাণে তুলবে তোর মামা? তোর মার সঙ্গেই সম্পর্ক তুলে দিয়েছে। বখাটে হয়ে গেছে বলে রাত্তির বেলা বাড়ী ফিরতেই মহিম বললে, ঘুম ভেঙ্গে এ বাড়ীতে

তার মুখ দেখলে ওই মুখে জুতো পায়ে লাথি মারবে। সেদিন বেশী রাত করে নি। মহিমের হুকুমে তোর মা ওর সঙ্গে কথা কইলে না, তোর মার হুকুমে ওকে কেউ খেতে দিলে না। চুপচাপ শুয়ে রইল। সকালে মহিম কল ঘরে গেলে শোয়ার ঘরে গিয়ে ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে শ' তিনেক টাকা বাগিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

: ওসব তো শুনেছি। আসল কথা বল।

: ওটাই তো আসল কথা। তিনশ' টাকা সম্বল করে এক কাপড়ে বাড়ী ছেড়েছিল, নিজের চেষ্টায় তোর বাপের চেয়ে বেশী কামাচ্ছে। গায়ের জ্বালায় তোদের কারো মুখ গ্যাখে না। তোর বাবা নয় নিরুপায় হয়ে দায় চাপিয়ে গেছে, ওর কাছে আমি একটা কর্মচারী। আমি বুঝিয়ে বলতে গেলে কি করবে জানিস বাবা? ওই যে তোর বাবা ওকে বলেছিল জুতো পায়ে মুখে লাথি মারবে, অ্যাদ্দিন পরে জবাব দিতে আমার মুখে জুতো মেরে বিদায় দেবে।

সমরেশ বিরস মুখে বলে, তবে আর মামীকে বলে কি হবে? ছোট-মামা টাকা দেবে না।

বনমালী ক্ষোভে দুঃখে কাতর হয়ে কপাল চাপড়ে বলে, এই তো দোষ তোদের, কিছু জানবি না বুঝবি না, বড় বড় কথা বলবি। জগৎ সংসারের কায়দা কানুন একটু জেনে বুঝে নিতে হয় তো? শ' তিনেক টাকা সম্বল করে ঘর ছেড়ে তোর মামা যে এত টাকা কামাচ্ছে, একি ম্যাজিকে হয়েছে? তোর মামা ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবার কায়দা শিখেছিল, বখাটে হোক আর যাই হোক, তোদের মত হাবাগোবা ছিল না।

: ছুঁচ হয়ে ঢুকবার কায়দাটা বাৎলে দাও না।

: একদিনে কি বুঝিয়ে বলা যায়, শিখিয়ে দেয়া যায়? ওসব হক্ক

ধাতের ব্যাপার—ধাত গড়ে তুলতে হয়। যেটুকু বললাম তুই সেটুকু কর দিকি বাবা। মামীর কাছে যা—হেসে কেঁদে রসিয়ে কথা বলে আব্দার ধরে তোষামোদ করে ম'মীর মনটা ভিজিয়ে দি'গে যা। তারপর মামীই সব ঠিক করে দেবে।

বনমালী ফোকলা মুখে হাসে।

বলে, তোর ছোটমামার দশ বছরের গায়ের জ্বালা দশ মিনিটে ঠাণ্ডা করার কায়দা তোর ছোটমামী জানে। বোকা হাবা ছেলেমানুষ তুই ওসব বুঝবি নে। যা বললাম সেটুকু শুধু কর—ফল হয় ভাল না হলে কি আর করা যাবে!

পরদিন সকালে সমরেশ তার ছোট মামার বাড়ী যায়। প্রকাণ্ড বাড়ীতে প্রাণী মোটে পাঁচজন। মামা মামী ছেলে আর চাকর দাসী রাঁধুনি। লোকাভাবে যেন খাঁ খাঁ করে বাড়ীটা—সাজানো গোছানো লোক-শূন্য ঘরগুলি যেন সুসজ্জিতা বিধবার মত, শুচিশুভ্র শুদ্ধতায় শ্মশানের প্রতীক-শূন্য তার মত হাঁসফাঁশ করছে!

লোক চাই! জন চাই!

লোক ছাড়া জন ছাড়া বাড়ী ঘরের মানে নাই!

সরমা শুধু বলে আয়। বোস।

বলে' ঝি চাকর রাঁধুনীর হাতে সংসার এবং তাকে আদর করা যত্ন করা খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার ছেড়ে দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে খাটে কাত হয়ে চোখ বোজে।

শূন্য ঘরে।

তিন বছরের বাচ্চাটা তার অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

নিরাপদেই।

ও বাচ্চার কান্না মামীর কাণে গেলেই বরখাস্ত হয়ে যেত ঝি রাঁধুনী দুজনেই।

খাটুনি সামান্য। মোটা মাইনে দিয়ে তবু দু'জনকে রাখা। মা'র জন্য হোক আর যার জন্যই হোক—ছেলে তার কাঁদবে কেন!

ফুড-ভরা বোতলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি নাকি?

যৌবন যেন বিস্ফারিত হয়েছে মামীর প্রাক্-মধ্য বয়সে। যুবতীত্ব ফুলে ফেঁপে উঠেছে জোয়ারের নদীর মত সর্ব্বাঙ্গে।

অথচ কেমন যেন পুরানো বাসি হয়ে ঝিমিয়ে গেছে, নির্জীব হয়ে গেছে, সহরের পাশের পুরাণো বুড়ী নদীটার মত।

ঝি রাঁধুনি চা দেয়, চায়ের সঙ্গে দেয় বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার পচন নিবারক সুন্দর সুদৃশ্য আধুনিক আসবাবে রক্ষিত চারদিনের বাসি বাতিল স্বাদহীন সন্দেশ রসগোল্লা।

চুলের গোছা আল্‌গা করে দিতে দিতে সুন্দরী বলে, খাও না ভাই, খেয়ে যাও না? যেমন দিতে বলেছে, তেমনি দিয়েছি। গিয়ে তুমি বলবে জানি পচা খাবার দিয়েছি—বললে আর করব কি বল ভাই! খেতে দিয়েছি, খেয়েছো, ঐটুকু যেন বলো সত্যি রাখতে।

গরম চা-টাই শুধু সে খায়। মনে ভেসে আসে এলোমেলো শোনা কথা। ছেলেবেলায় শোনা রূপকথার মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছাড়া ছাড়া কাহিনী।

দাদামশাই ছিল জমিদার।

একটি সুন্দরী যুবতী মেয়েকে নিয়ে তার যুদ্ধ বেধেছিল পাশাপাশি আরেক জমিদারের সঙ্গে।

পচা মজা ময়না দীঘি কার এলাকায় তাই নিয়েও তুজনের মামলা চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

ওই দীঘির জলে একদিন আকাশে সূর্য্য উঠে পড়ার আগেকার আলোয় ভাসতে দেখা গিয়েছিল ওই যুবতী মেয়েটির মৃতদেহ।

অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা গিয়েছিল, তু'চারজন মোটে দেখেছিল। তারপরেই নাকি লাস গিয়েছিল উধাও হয়ে, প্রমাণ হয়েছিল কেউ দীঘির ঘাটে লাস ভাসতে ত্যাখেনি! দীঘির ঘাটে একটি কচি বয়সের বৌয়ের লাস ভাসছে দেখার জন্যই নাকি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল হারাণ চক্রবর্ত্তী আর বঙ্কিমেশ্বর চাটুয্যের ঘর বাড়ী।

পুড়ে নাকি মরেছিল হারাণ চক্রবর্ত্তী সপরিবারে। বঙ্কিমেশ্বর নাকি বেঁচে গিয়েছিল বিদেশে থাকার দরুণ।

কে জানে কি সব ব্যাপার হয়েছিল। খুব বেশী প্রাচীন ইতিহাস নয়, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, তার নিজের বাপের জীবনারম্ভের ইতিহাস।

বড় মামা ছোট জমিদারীর মায়া কাটিয়ে ব্যবসায়ের নামে। সাধারণ নারকেল তেলে তু'চার ফোঁটা বিদেশী সুগন্ধের এসেন্স মিশিয়ে বোতলে ভরে লেবেল এঁটে আর বিজ্ঞাপন দিয়ে সে নাকি প্রজা ঠেঙ্গিয়ে জমিদারী থেকে যত আয় হয় তার তিনগুণ আয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

মাদ্রাজীরা নারকেল তেল খায়। বাঙালীর মেয়েরা নারকেল তেল দিয়ে চুল বাঁধে। মুদী দোকানের মর্চ্চে ধরা টিন থেকে ময়লা মেশান খানিক তেল এনে এনে মহাসমারোহে চুল বাঁধে।

সামান্য একটু রঙ আর গন্ধের ব্যবস্থা করে সুন্দর শিশিতে ভরে লাগসই একটা নাম দিয়ে দশগুণ দামে বিক্রী করা করা।

বড় বড় টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা নাকি শত্রু হয়ে কম্পিটিসনে নেমে বড় মামাকে সাবাড় করেছিল।

বড় মামা কোথায় গেছে কোথায় আছে কি করছে কেউ নাকি আর জানতে পারে নি তারপর থেকে।

মেজমামা ভাঙ্গা সংসার চালাত। মদ নয়—টিন টিন সিগারেট খেত। এক বিশেষ ধরণের সিগারেট।

চশমার পাওয়ার বাড়িয়ে বাড়িয়ে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

শুকিয়ে নাকি কাঠিও হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার নাকি বলেছিল, ওই বিশেষ মার্কার সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন মরে গিয়ে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়েছিল।

আর ছোটমামা ভবানী আজ দশ বছর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। সে বাড়ীতে এলে ছোটমামী ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে থাকে।

দোষ হয়তো সরমার নেই, বেচারার শরীর খারাপ, মাথা ঘোরা লেগেই আছে। তবু এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কীভাবে যেন মাথাটা বিগড়ে যায় সমরেশের। মূল্যবোধ পাল্টে যায়, হিসাব নিকাশ উল্টে যায়।

মন স্থির করে নিয়ে সোজা সরমার শোয়ার ঘরে যায়, পা ধরে নেড়া দিয়ে ডাকে, মামী, বালিশ থেকে মাথা তোল।

সরমা ঘুমোয় নি। শরীর খারাপ হলে দিনে রাত্রে ঘণ্টাখানেকও তার খাঁটি ঘুম হয় কিনা সন্দেহ। আধা ঘুম আধা জাগা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে শুধু ঝিমিয়ে যায়।

উঠে বসে চোখ টান টান করে চেয়ে সরমা বলে, আঃ, তোরাই

'আমাকে মারবি। হারামজাদি মাগীরা খেতে দেয় নি তোকে? বড় বাড় বেড়েছে, সব কটাকে আজ তাড়াব।

মরিয়া সমরেশ হেসে বলে, খেতে দিয়েছে। তোমায় প্রণাম করব কি না, তাই বলছিলাম বালিশ থেকে মাথাটা তোল। শোয়া মানুষকে তো প্রণাম করতে নেই।

: ও বাবা, তুই এ সব জানিস? আবার মানিস্‌ও?

বালিশের তলা থেকে ছোট একটা শিশি বার করে একটা বড়ি নিয়ে খাটের শিয়রের পাশে বসানো টিপয়ে রাখা কাঁচের কুজো থেকে শ্বেত পাথরের গেলাসে জল ঢেলে বড়িটা খেয়ে সরমা বলে, আজ হঠাৎ প্রণাম কেন রে?

মরিয়া সমরেশ তার পা চেপে ধরে হাসি পাল্টে কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলে, আমায় বাঁচাও মামীমা। এত বড় সংসার, এত বড় কারবার ঘাড়ে চাপিয়ে বাবা মরে গেছে—আমি সামলাতে পারছি না। বুনো দাদু সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছে।

মনে মনে ঠিক করে ভেবেছিল অভিনয় করে কায়দা করে বলবে—বনমালীর শেখানো কৌশলটা খাটাবে। রাগ দুঃখ অভিমান হতাশায় এতই জর্জরিত হয়েছিল প্রাণটা যে ছেলেমানুষি চালাকি বুদ্ধি তলিয়ে গিয়ে কীভাবে সব যেন জড়িয়ে গেল।

সত্যি সত্যি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল সমরেশ। চোখের জলে বুক তার ভেসে গেল।

বড়ি গিললেই তো সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রিয়া এগিয়ে যায় না। ক্রিয়া সুরু হয়েছে, ঝিমানোভাব কেটে আসছে, তবু সরমার বুঝতে খানিকক্ষণ সময় লাগে যে স্বপ্ন দেখছে না সিনেমা দেখছে না সত্যি সত্যি সমরেশকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে দেখছে।

সমরেশের কান্না শেষ হবার পর সে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে নড়ে চড়ে বসে বলে, কাঁদিস নে। আমি কারো কান্না সইতে পারিনে। কি যেন বলছিলি তুই ?

কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠে সমরেশ বলে, শোন নি? আর আসব না তোমার কাছে। কিছুই শোননি? কাল পরশু এসে তোমার এই খাটে বসে ব্লেড দিয়ে আর্টারি কেটে স্যুইসাইড করব।

বড়ির ক্রিয়া সুরু হলে চটপট চড়ে যায়।

সরমা তার হাত ধরে কাছে টেনে হেসে বলে, বেশ তো, স্যুইসাইড করিস। আমায় ডাকিস, আমরা এক সঙ্গে স্যুইসাইড করব। এখন এক কাজ কর দিকি, চোখ মুখ ধুয়ে আয় তো গিয়ে। ঠাণ্ডা ট্যাপের জল দিয়ে ধুস কিন্তু!

কান্নার চিহ্ন জলে ধুয়ে ফেলার সঙ্গে লজ্জাও খানিকটা কমিয়ে নেবার চেষ্টা করায় চান-ঘরে সমরেশের একটু দেরী হয়।

ইতিমধ্যে বেল টিপে সরমা সুন্দরীকে ডাকিয়েছে।

সুন্দরী ঘরে ঢুকেই বলে, আমার দোষ নেই মা, বিমলা সাক্ষী আছে। খেতে দিয়ে সেধেছি, ঘরে এসে তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে বারণ করেছি—

সরমা যেন ঘা খাওয়া এস্রাজের তারগুলির মত ঝন ঝন্ করে ওঠে, তুই থাম, দিকি সুঁদ্রি। বাড়াবাড়ি করিস বলেই তো তোদের জিভ কেটে তাড়িয়ে দিতে সাধ যায়। সারাদিন তোদের খালি মিছে কথা— খালি মিছে কথা!

: মিছে যদি বলে থাকি মা—

: চুপ কর। খেতে দিয়ে সাধবি তবু মানুষ খাবে না-- তার মানে তুই সাধতেই জানিস নে! যা, খাবার সাজিয়ে আনগে চটপট।

ঝিমিয়ে নেতিয়ে বিছানায় কাত হয়ে পড়েছিল ছোটমামী—দুটো

কথা বলতেও খানিক আগে তার ছিল কত আলস্য। তার মুখ দিয়ে এখন যেন কথার খই ফুটছে।

সমরেশকে খাওয়াতে খাওয়াতে সে অনর্গল কথা বলে যায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সেধে যায়—এটা খা, ওটা খা।

: আর কত খাব ছোটমামী? পকেটে করে বরং নিয়ে যাই, আবার খিদে পেলে খাব। টাকার কথাটা বল?

: তুই সত্যি বোকা হাবা, নইলে বাপ মরতেই অমন কারবারটা ডুবতে বসে? টাকার কথা কি বলব তোকে? টাকার মালিকের সঙ্গে আগে কথা বলি, তোর মামা কি বলে শুনি, তবে তো তোকে বলব।

: তোমার বুঝি হাত নেই?

সরমা হেসে বলে, কি যে করব তোকে নিয়ে! টাকার ব্যাপারে মেয়েমানুষের হাত থাকে?

এবার খানিকটা অভিনয়ের সুরে আব্দার জানিয়ে সমরেশ বলে, চেষ্টা করবে তো?

সরমা বলে, চেষ্টা করব না? যতক্ষণ রাজী না হয় তোর মামাকে রেহাই দেব ভেবেছিস? সারারাত ঘুমোতে দেব না। কবে তোর বাপের সঙ্গে কি হয়েছিল, মানুষটা মরে গেছে, আজও তার জের টানা কেন রে বাবা! এবার মিটিয়ে দিলেই হয়। বিয়ের পর থেকে শুনে আসছি আমার এক ননদ আছে, মস্ত বড়লোকের গিন্নি। আজ পর্যন্ত ননদকে চোখে দেখলাম না। এবার মিটমাট করিয়ে দেব—একদিন গিয়ে হাজির হব তোদের বাড়ীতে।

সরমা নিজে তোয়ালে দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেয়। খাটে পাশে বসিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে গালে গাল রেখে স্নেহসিক্ত গলায় বলে, কাল এই টাইমে আসিস। টাকার ব্যাপার, হবে কি না জানি না। তবু

আসিস। নগদ না পারি, চেক হয়তো আদায় করে রাখতে পারব তোর জন্য।

পরদিন অসময়ে সমরেশের মামাবাড়ী গিয়ে জানবার দরকার হয় না খবরটা যে তার স্নেহময়ী মামী টাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছে কিনা।

সকালে ভবানীর গাড়ী এসে দাঁড়ায় তাদের বাড়ীর সামনে।

দশ বছর পরে ভবানী আজ মহিমের বাড়ীর সদর দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢোকে।

বাড়ীর ভেতরে যায় না। বাইরের ঘরে বসে সব রকম আদর অভ্যর্থনার চেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করে শুধু কল্যাণী আর বনমালীকে ডাকিয়ে এনে কথা বলে।

কিছু শোনে না। শুধু কথা বলে।

সব কথা বলে কল্যাণীকে। বনমালীকে ডাকিয়ে আনালেও তার দিকে একরকম ফিরেও তাকায় না।

কল্যাণী ভয়ে ভয়ে শুধু বলতে গিয়েছিল, ভেতরে গিয়ে বসে, একটু চা-টা খেয়ে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই ভবানী ভূমিকা সুরু করেছিল: ওসব টুকিটাকি কথা তুলোনা দিদি, আমার সময় নেই। আমি যে এলাম, তার মানেই হল অ্যাদ্দিনের ঝগড়া বাদ দিয়েছি। মানুষটা মারা গেছে, তোমাদের সঙ্গে আর কিসের বিবাদ? কিন্তু হঠাৎ গলাগলি ভাব করতে পারব না।

কেউ কথা বলে না। কল্যাণী কেবল নড়ে চড়ে বসে।

ভবানী মৃদুস্বরে প্রতিটি কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলে, তোমরা চলেছিলে একদিকে, আমি চলে গিয়েছি আরেক দিকে। আর কি

আমাদের খাপ খায় ? ছেলেকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে আমার সঙ্গে খাতির রাখার চেষ্টা করা তোমার উচিত হয়নি দিদি।

দিদি ! কল্যাণীকে ভবানী আজ দিদি বলেছে !

: যাক্ গে। কাজের কথা বলি। আমি সব জানি। টাকা ঢেলে তোমাদের কারবার সামলানো যাবে না।

বনমালী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার একটু জোর দিয়েই বলতে যায়, আমি যে প্ল্যান করেছি—

: তোমার প্ল্যানে কাজ হবে না। তোমার মগজের প্ল্যান তোমার মগজের মাকড়সাদের পেটে যাবে।

: আরেকটা যুদ্ধ বাধা পর্যন্ত আমি কোনরকমে—

: আরেকটা যুদ্ধ বাধবে কিনা কিছুই ঠিক নেই। যদি বা যুদ্ধ বাধে, সে পর্যন্ত টানতে পারবে না।

বনমালী চুপ করে থাকে।

কল্যাণী বলে, উনি নেই। তুই যদি সামলাতে পারিস ভেবেই সমুকে পাঠিয়েছিলাম।

কল্যাণী ভেবে চিন্তে সমরেশকে তার কাছে পাঠিয়েছিল !

বনমামী নীরবে এক টিপ নস্য নেয়।

ভবানী বলে, এ কারবার বাঁচাতে চেষ্টা করাই বোকামি। বনমালী কাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে তোমরা জান না। বিজ্‌নেসে কি এরকম পাগলাটে একগুঁয়েমি চলে ? জেনেশুনে কারবারের পিছনে আমি এক পয়সা ঢালব না।

: তবে উপায় কি হবে ?

ভবানী সোজা হয়ে বসে সিগার ধরিয়ে বলে, উপায় আমি করে দিতে পারি—কিন্তু তোমরা কি তা মানবে ? এ কারবার বাদ দাও। হাজারটা

ফুটো হয়েছে, ইঁদুরে খেয়ে শেষ করেছে, এ নৌকা আর কি চালানো যায়? এ কারবার বাতিল করে দাও। মাদ্রাজে আমি একটা ব্র্যাঞ্চ খুলছি—সমুকে ভার দেব, বনমালীকে ও অ্যাসিস্ট করবে।

ভবানী মুখ বাঁকিয়ে হাসে, ব্র্যাঞ্চটা ডুববে জানি—যাই হোক, সমুর হাতে নাতে একটু শিক্ষা হবে।

কল্যাণীও মুখ বাঁকিয়ে বলে, যা ভাল বুঝিস তাই কর। আর তে কোন উপায় নেই!

তিন

সকালে উঠে বনমালী কাতরভাবে বলে, আমায় একটু আদা-চা করে দেবে? সারারাত কেসেছি, কি করে বেরোব ভাবছি। না বেরোলেও উপায় নেই আজ!

কল্যাণী বলে, আদা নেই। আনাতে হবে।

বনমালী বলে, তবে একটু বেশ কড়ারকম চা-ই দাও। বড় গেলাসটা ভরে দিও।

কল্যাণী যেন শুনেও শুনতে পায় না। ডাল সম্ভার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সম্ভারের ঝাঁঝে কাসতে কাসতে বেদম হয়ে কি বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায় কল্যাণী বুঝতে পারে না।

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে রাত্রে আরও বেশী বেদম হয়ে বনমালী ফিরে আসে। সকালে তার ছিল সকাতর ভাব, এখন তার মেজাজটা কিন্তু বেশ উগ্র মনে হয়।

আদা-চা আদায় করে ছাড়ে।

চা খেতে খেতে কল্যাণীকে সে বলে, তোমার ভায়ের মতলব টের পেয়েছি বৌমা। এতকাল তলে তলে শত্রুতা করেছে, এবার একেবারে ফাঁসাতে চায়।

কল্যাণী বলে, একটা ব্যবস্থা করবে বললে, সমুর একটা গতি করে দেবে —

: গতি করে দিচ্ছে! ওর মাথা খারাপ হয়েছে কিনা তাই মাদ্রাজে ব্রাঞ্চ খুলে ছেলেমানুষ সমূকে ভার দেবে!

: আপনিও থাকবেন।

: আমি? ওটাই তো ওর আসল মতলব। কারবার বাতিল করার মানে জানো বৌমা? সব দায় আমার, সব দায়িত্ব আমার—কারবার বাতিল করলেই আমার গতি হবে জেলখানায়। তোমাদের হয়ে যাবে ভরাডুবি। সেটাই ও চায়। আমি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সামলে সুমলে চালিয়ে যাচ্ছি—এটা ওর সহ্য হচ্ছে না।

কল্যাণী বলে, কি জানি, আমি কি অতসব বুঝি? কিন্তু আপনিই বা এভাবে কতদিন চালাবেন?

বনমালী জোর দিয়ে বলে, যতদিন পারি চালাব, ও পাষণ্ডকে মতলব হাঁসিল করতে দেব না। হয় তো কিছু একটা লেগেও যেতে পারে, সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।

একটু থেমে কয়েকবার কেসে সে আবার বলে, যুদ্ধের কথা অনেকে বলছে। টুকটাক যুদ্ধ তো চলছেই এখানে ওখানে, আমেরিকা ওৎ পেতে আছে—কে বলতে পারে কি হয়?

ভবানী সত্যই হাল ধরতে চেয়েছিল। নিজের পদ্ধতিতে চেয়েছিল, গায়ের ঝাল ঝাড়বার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না।

ওদিকে রামনাথ মরে ভূত হয়ে গেছে। এদিকে সরমা মরিয়া হয়ে আব্দার ধরেছে যে ননদের সংসারটা সামলে দিতে হবে, সে একটু ভাবসাব করবে ওদের সঙ্গে—শ্বশুরবাড়ীর মানুষকে না দেখেই এতকাল তার জীবন গেল।

শুধু তাই নয়। এখন কল্যাণী শুধু সমুকে পাঠিয়ে সরমার মারফতে তার কাছে আব্দার জানিয়েছে—কারবারটা ফেঁসে গেলে ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় পড়ে দলবল নিয়ে নিজে এসে ঘাড়ে চাপবার জন্য কিভাবে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে কে জানে।

তার চেয়ে নানা কৌশলে খানিকটা সামলে সুমলে ওদের একটা মোটমাট ব্যবস্থা করে দেওয়াই ভাল।

সেকেলে হোক, ব্যবসার ব্যাপারে বড় খাস্তা মাথা বনমালীর। ওকে একটু কণ্ট্রোল করে লাগালে মাদ্রাজের ব্রাঞ্চটার পরিকল্পনা হয় তো আশাতীত রেজাল্ট দেবে।

শুধু তাই নয়। মহিম একদিন তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছিল, জগৎসংসার জানবে যে সেই মহিমের সংসারের দায়টা সে উদারভাবে মেনে নিয়েছে।

সে ভাবতেও পারে নি বুড়ো বনমালী এরকম মরিয়া একগুঁয়ে হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

মহিমের তিন জামাই কারবারের অবস্থা বুঝতে গেলে বনমালী তাদের খাতির করে চা সন্দেশ খাইয়ে সব কিছু দেখা শোনা জানা বোঝার সুযোগ দিয়েছিল।

ভবানী ব্যাপার বুঝতে যেতেই সে গম্ভীর সুরে বলে, কারবারের ব্যাপারে তোমার কিছু করতে হবে না ভবানী। যে টাকাটা চেয়েছি দিতে চাইলে দাও, খত লিখে নেব। তার বেশী তোমার কিছু করার নেই, করতে হবে না।

ভবানী বলে, তুমি তো পাগল বনমালী। সবাইকে ডুবিয়ে চিতায় উঠতে চাও। ওসব ভাবের কথায় কাজ নেই, আমি যদি জোর করে নামি, তুমি আমায় ঠেকাতে পারবে?

ঃ পারব। এ কারবার আমার।

বনমালী ড্রয়ার খুলে দলিলটা বার করে সামনে ফেলে দেয়।

মনোযোগ দিয়ে আগাগোড়া দলিলটা পড়ে ভবানী একটু হেসে বলে, এ দলিলও কিন্তু আমি বাতিল করে দিতে পারি। সেই সঙ্গে তোমায় জেলে দিতে পারি।

ঃ পারবে না।

ঃ পারি। কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, ওরা তোমায় আঁকড়ে আছে। তোমায় একটু জব্দ করার জন্য অত হাঙ্গামা করা আমার পোষাবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দিদি নিজে যদি ভাগ্নেভাগ্নীগুলিকে নিয়ে আসে, তোমায় বদলে আমায় আঁকড়ে ধরতে চায়, তোমায় আমি জেল খাটাব, রাস্তায় ভিক্ষা করতে করতে কুকুর বেড়ালের মত রাস্তাতেই যাতে মরে পচে যাও তার ব্যবস্থা করব।

চিন্তার জাবর কাটতে ভাল লাগে না সমরেশের। ঠেকে গেলে থেমে গেলে সে তাই পুরাণো অভ্যস্ত চিন্তার আশ্রয় খোঁজে না।

বেরিয়ে পড়ে।

কোথায় যাবে কি করবে কিছু ঠিক না করেই।

কোথাও যাবে তো নিশ্চয়! মানুষের নিজের গড়া পৃথিবীর পিঠে এই বিচিত্র জীবন জগতের কোথাও।

কাক সোজা উড়ে যায়—কোথায় খাদ্য আছে। সেও যেন ট্রামে বাসে পয়সা খরচ করে সোজা গিয়ে হাজির হয় নন্দিতাদের বাড়ীতে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে তার মনে পড়ে যায়, নন্দিতা তাকে বড় ভালবাসত।

স্নেহের বাঁধনে বেঁধে তাকে সংযত সাধারণ কিশোর করার জন্য কি ব্যাকুলতা ছিল নন্দিতার, কী অধ্যবসায় ছিল।

মুখে কোন দিন কিছু বলে নি। কাজে চেষ্টা করে দেখিয়েছে।

সত্য কথা বলতে কি, প্রথম পরিচয়ের দিন বড়ই আধুনিকা মনে হয়েছিল নন্দিতাকে।

সেই প্রাক্-কিশোর বয়সেই সাধারণ কাপড় জামা, সাধারণ প্রসাধন, পায়ে সাধারণ লপেটা জাতীয় মেয়েলি স্যাণ্ডাল, হাতে একগাছি করে সরু লিকলিকে সাধারণ সোণার চুড়ি—তবু সমরেশের মনে হয়েছিল সে যেন আধুনিকতম রূপসজ্জার মূর্তিমতী প্রতীক।

সোজা হয়ে সহজভাবে দাঁড়িয়ে সমরেশের সঙ্গে সোজাসুজি অন্তরঙ্গ তামাসা জুড়ে প্রথম পরিচয়ের আলাপ সুরু করেছিল—অঙ্গেরও কোন ভঙ্গি করেনি, কথারও কোন মারপ্যাচ চালায়নি।

তবু সমরেশের মনে হয়েছিল, সর্বাঙ্গে সে যেন অবিরাম একটা হিল্লোল খেলিয়ে চলেছে, কথা যেন বলছে অভিনয় চরমে তোলা পর্দ্দার সেরা তারকার ছায়ামূর্তির মত।

মনে হয়েছিল নিছক একটা ধাঁধা।

অনেক বছর কেটে গেছে তারপর। নিজের রহস্যবোধের ফাঁকির হিসাবে নন্দিতা রহস্যময়ী কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার সাধ আর ইচ্ছা দুই-ই শেষ হয়ে গেছে, বহুবার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে নন্দিতার সঙ্গে।

ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পেরেছে যে নন্দিতা মোটেই ধাঁধা নয়। তার নিজেরই গেঁয়ো মনের ধাঁধায় ওকে তার ধাঁধার মত মনে হয়েছিল।

অল্প বয়স থেকে পড়া কোন উপন্যাসের কোন নায়িকার সঙ্গে নন্দিতাকে মেলাতে পারেনি বলে তার ধাঁধা লেগেছিল।

এতকাল ধরতে পারেনি। সেদিন প্রথম জেনেছিল নায়ক নায়িকার চরিত্রের সাধারণ দিকগুলি উদ্ভট ও অস্বাভাবিক করে তোলার জন্য কি অকারণ ঝন্‌ঝাট আর দুশ্চিন্তা সাধারণ বইগুলিতে।

প্রথম দর্শনে প্রেমের ধারা আজও তবে বজায় আছে উপন্যাসে? কী অদ্ভুত খাপছাড়া ব্যাপার।

তাই বটে। ঠিক। অনেকের সঙ্গেই নন্দিতার পরিচয় গড়ে তুলতে হয়। উপন্যাসে পরিচ্ছদের পর পরিচ্ছদে গড়ে তোলার মত দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মানুষের সঙ্গে পরিচয় গড়ে তোলা তার পোষাবে কেন?

মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সোজা সরল ব্যাপার। কি দরকার তার মধ্যে হাজার রকম প্যাঁচ রেখে?

তবে, তাকে নিয়ে নন্দিতার স্নেহভরা পরিহাসের মাধ্যমে প্রথম পরিচয়ের ঝন্‌ঝাট হাল্কা করে মিটিয়ে দেবার চেষ্টায় যে কৃত্রিমতা ছিল যান্ত্রিকতা ছিল—সেটাও খেয়াল করেছিল সমরেশ। নন্দিতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়া পর্য্যন্ত কম অস্বস্তি ভোগ করেনি।

দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল নন্দিতাদের বাড়ীতেই, এক বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে।

আশ্রিতা গৌরী এবং নিজের আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তুষার তাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। নগদ টাকা মোটের উপর কম আনে নি। ছোটখাট একটা বাড়ী কিনে কিম্বা দু'চার কাঠা জমি কিনে নিজের একটা বাড়ী তুলে নন্দিতাদের রেহাই দিয়ে চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা।

তারপর যা হয় দেখা যাবে।

গৌরীর সঙ্গে বিষম ভাব জমাতে জমাতে কিভাবে তুষারের মনটাও

নন্দিতার বাবা আনন্দ নতুনভাবে গলিয়ে দিয়েছিল কেউ টের পায় নি। ভিটে-মাটির চিন্তা ছেড়ে সে আনন্দের সঙ্গে নেমে পড়েছিল নগদ টাকাটা খাটিয়ে আরও কিছু টাকা কামাবার চেষ্টায়।

গৌরীর সঙ্গে বিষম ভাবের পরিণাম এবং আনন্দের সঙ্গে সর্ব্বস্ব নিয়ে এই বাজারে ব্যবসায়ে নামার বিপদের দিকটা খেয়াল থাকে নি।

সর্ব্বস্ব পণ করা ব্যবসার ফলাফল কি হবে না হবে কে জানে। এদিকে গৌরী হঠাৎ পড়ে গেছে মুস্কিলে।

সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কিছু নয়। কতই তো ঘটছে। কত উপন্যাসে একই ঘটনা কত রকম ভাবে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে যে রূপায়িত করা হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

আগে জানা ছিল না, সমরেশ পরে জেনেছিল যে নন্দিতার জন্যই বিয়েটা সম্ভব হয়েছিল।

তুষার করতে চেয়েছিল অন্য ব্যবস্থা এবং আনন্দের সাহায্যে ব্যবস্থাটা প্রায় পাকাপাকি করেও এনেছিল।

গৌরীর দফা রফা হয়ে যেত।

নন্দিতা তা হতে দেয় নি।

তুষারকে এবং নিজের বাপকে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

প্রথম বয়সে সমরেশ ভাবত, এটা বোধ হয় নন্দিতার একেলেপণার একটা নিদর্শন। নাটকীয় কিছু করার ঝোঁকের ব্যাপার।

পরে সে জেনেছে যে ওই বয়সেও নন্দিতা ওরকম শক্ত মেয়েই ছিল —পুরুষের অন্যায় মানতে হলে সে ক্ষেপে যেত।

তারপর কোথায় গিয়েছে সেই তুষারেরা, কোন শূন্যে মিশে গিয়েছে আনন্দের সঙ্গে ব্যবসা করে তার বড়লোক হবার স্বপ্ন।

বন্যার জলের সঙ্গে পুকুরের জল ভেসে যাওয়ার মত তার মোটা পুঁজির সঙ্গে মারা গিয়েছিল আনন্দের সামান্য সম্পদ।

কয়েক বছর গুমরে গুমরে কষ্টকর জীবনটা টেনে আনন্দ মারা গিয়েছিল।

নন্দিতা কেঁদেছিল।

কিন্তু মৃত বাপের সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিল আজও সমরেশের মনে আছে—জানতাম মরবে, এতটুকু মনের জোর ছিল না, তুলতুলে নরম মানুষ, মেয়েমানুষেরও অধম।

সহজ সরল স্পষ্ট সুস্থ আত্মপ্রত্যয়ী চালাক-চতুর আর শক্ত মেয়ে বলে তার বিভ্রম ঘটে গিয়েছিল।

সে ধরতে পারে নি যে নন্দিতার মধ্যে নাটকীয় কিছুই নেই—না তার বেশভূষায়, না তার চাল-চলনে।

সে শুধু নিজেকে সাধারণ স্বাভাবিক করে নিয়েছে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাকে পুরুষ মালিকের মন জুগিয়ে চলতে হবে, এ বিশ্বাস উপড়ে ফেলে দিয়েছে। সে জেনে গিয়েছে যে জগতের কোন পুরুষের চেয়ে সে নীচ নয়, দুর্বল নয়, হেয় নয়।

পুরুষ জাতটাকে সে ঘৃণা করে, রাজা সম্রাট গুণ্ডা জাতীয় জীব বলে মনে করে।

সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে যে ফুরিয়ে গেছে রাজা সম্রাট গুণ্ডাদের মেয়ে নিয়ে রানীগিরি বৌ-গিরি বেশ্যা-গিরি চালানোর দিন!

মানুষের জাতের হিসাবে কে মেয়েমানুষ, এইটুকু মেনে নেওয়ার বেশী কোন মেয়েলিপনার বালাই তার নেই। সকলের সঙ্গেই তার এমন

সহজ সরল স্পষ্ট ব্যবহার যে প্রথম প্রথম সমরেশের বার বার খটকা লাগত যে এটা নন্দিতার কোন বিকারের লক্ষণ না বাহাদুরী।

ব্যাপারটা বুঝতে সময় লেগেছে অনেক দিন। তারপর সমরেশ টের পেয়েছে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে বিচার বিবেচনা করে নন্দিতা মানুষের সঙ্গে মেলামেশার এই কায়দাটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল, সজ্ঞানে নীতিটা পালন করে চলতে চলতে এখন সেটা প্রায় ধাত দাঁড়িয়ে গেছে, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

নইলে মেলে না, মানে হয় না। এমন ধারালো বুদ্ধি যার, বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে যার শক্ত হওয়ার রকম দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়, হাবাগোবা মেয়ের সরলতা নিশ্চয় তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়!

বিকার বা বাহাদুরীও নয়। কারণ, তার সহজ স্বচ্ছ সরলতায় কখনো ছেদ পড়ে না, ব্যতিক্রম ঘটে না।

বহুদিন ধরে নন্দিতার চরিত্রের এসব বিচার বিশ্লেষণ চলছিল মনে মনে, একদিন ঘটনাচক্রে রাত প্রায় দশটার সময় নন্দিতাকে শূন্য ঘরে একা পেয়ে তার সরলতা নকল করেই সে যেন নিজের চিন্তাগুলি তার কাছে পেশ করে দিয়েছিল।

নন্দিতা বলেছিল, ও বাবা. আমায় নিয়ে তোমার দিবারাত্রি এত চিন্তা ভাবনা! এ তো ভাল কথা নয়! সাবধান, পিছলে গিয়ে ভাবের রসে ডুবে যেওনা, মুস্কিলে পড়বে। আমি বয়সে বড়, কাণ মলে দেব।

সমরেশও হেসে বলেছিল, তোমায় নিয়ে ভাবের রস? তোমার রসকষ আছে নাকি?

: আছে। তবে খুব ঘন রস—প্রায় দানা বাঁধা। তোমার কাঁচা প্রাণে সইবে না।

: তোমায় কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে।

: ভাল লাগতে দোষ কি ? ভাল লাগাটা ভালবাসা হয়ে উঠতে দিও না, তাহলেই মুস্কিলে পড়বে। দুদিক দিয়ে মুস্কিল—তোমার ভালবাসা আমি যদি মেনে নিই তাহলেও মুস্কিল—মেনে না নিলেও মুস্কিল।

: কি রকম ?

: রকম বড় সাংঘাতিক। ধরো আমার লোভ জাগল, সাধ হল যে কচি ছেলেটার সরল খাঁটি ভালবাসা একটু চেখে দেখি—ভালবাসা মেনে নিলাম। এই পাকা বুড়ীর সঙ্গে ভালবাসার কারবার চালাতে গিয়ে দু'দিনে তুমি ছিবড়ে বনে যাবে! আমায় ছেড়ে রেহাই নিলেও সারাটা জীবন নীরস শুকনো হয়ে থাকবে। আর আমি যদি কাণ মশে দিই, তোমার একটা বিকার জন্মে যাবে, মেয়ে জাতটার ওপরেই চিরকাল বিতৃষ্ণা বোধ করবে।

সমরেশ একটু হেসে বলেছিল, তোমার হিসেব আগাগোড়া ভুল। আমরা ব্যাটাছেলেরা ভালবাসার খাতিরে মরতেও রাজী হই। সত্যি যদি তোমায় ভালবাসি—মুস্কিলের ভয়ে তোমায় রেহাই দেব ভেবেছ? দু'দিনে আমায় ছিবড়ে করে দেবে জেনেও তোমায় পাওয়ার জন্য প্রাণপণে লড়াই সুরু করব।

নন্দিতাও হেসে বলেছিল, এসব কলেজে শুনে শেখা কথা।

বাপের চেয়েও বনমালীর অভাবটা সমরেশ ঢের বেশী হাড়ে হাড়ে টের পায়।

দায় ঘাড়ে নিয়ে দু'বছরেই প্রাণ থেকে রসকষ সব যেন শুকিয়ে গেছে। ন্যাকামি, ছেলেমানুষী তো কবেই ঝরে গিয়েছিল, এবার শুকিয়ে যাচ্ছে দেহমন। এখন মেরুদণ্ডটা না বেঁকে যায়।

মট করে না ভেঙ্গে যায়।

সাত ভাই চম্পার একটি বোন ছিল পারুল। বো'ন ডাক দিলেই সাত ভাই ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে সাড়া দিত। মা আরেকটি বোন বিয়োতে পারলেই সে হয়ে যেতে পারত সাত বোনের এক ভাই সমরেশ।

সাত বোন ডাকাডাকি করলে এক ভাই তাকেই কি ঘুম ভেঙ্গে জেগে জেগে সাড়া দিতে হত?

তাই তো মনে হয় ব্যাপার দেখে।

চার বোনের বিয়ে মহিম চুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, অভাবের কষ্ট কোনদিন সইতে হবে না এরকম পরিবার এবং পাত্র দেখেই অনেক টাকা খরচপত্র করে বিয়ে দিয়েছিল!

সুখে হোক দুঃখে হোক দু'বোন স্বামীপুত্রের সংসারে খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে আছে। মাঝে মাঝে কারণে অকারণে দিদিদের কিম্বা ভগ্নীপতিদের চিঠিপত্রে সেটা জানা যায়।

বিবাহিতা তিন নম্বর বোনটিকে তার স্বামী বিরাম ত্যাগ করেছে। কিম্বা হয়তো তার বোন সত্যিই ত্যাগ করে এসেছে বিরামকে।

ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না সমরেশ।

মহিম বেঁচে থাকার সময় বুঝবার কোন চেষ্টাই করেনি, দরকার ছিল না। গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে প্রীতিকে এক কাপড়ে বাপের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে শুনে রেগে টং হয়ে গিয়েছিল।

পণ ধরেছিল, বিরামকে সে চাবকে আধমারা করে দিয়ে আসবে— একেবারে মারবে না।

প্রীতিকে একেবারে বিধবা করবে না।

মহিম বুঝিয়ে ধমক দিয়ে রাগারাগি করে অস্থির হয়ে তাকে ঠেকাতে পারত কিনা সন্দেহ।

মা তার গালে কষিয়ে দিয়েছিল একটা চড। খুব জোরেই চড়টা মেরেছিল। মা'র মশলা-বাটা, বাসন-মাজা কড়া পড়া হাতের চড়ে গালটা যেন জ্বলে পুড়ে ফেটে গিয়েছিল সমরেশের।

ছেলেবেলা মায়ের চড় খেয়েছিল কিনা মনে নেই। এত বয়সে সজ্ঞানে মার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে নিজের বোনের বিশ্রী অপমানের প্রতিশোধ চাবুক মেরে উসুল করার ঝোঁকটা বিগড়ে গিয়েছিল।

তিনদিন বাড়ী থাকে নি।

আত্মীয় স্বজন কারো বাড়ী যায় নি।

বেলা আটটা নাগাদ মায়ের হাতের চড খেয়ে রাত্রি দশটা নাগাদ এদিক ওদিক পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বসে বিশ্রাম করে, পকেটের গণ্ডাচারেক পয়সায় দুটো চায়ের দোকানে দু'বার চা বিস্কুট খেয়ে—হাজির হয়েছিল কুমারের বাড়ী।

মতলব ছিল, দু'একটা টাকা ধার চেয়ে নিয়ে কোন হোটেলে এক পেট খেয়ে দূরগামী কোন রেল বা জাহাজে লুকিয়ে উঠে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে দূর দূরান্তরে চলে যাবে।

তারপর যা হয় হবে।

কুমারের হাসি কথা মুখের ভাব আজও মনে আছে।

হেসে বলেছিল, দু'টো টাকা ধার চাইতে এয়েছিস? দেব। দু'টাকা কেন, পাঁচ টাকা দেব। মুস্কিলে পড়েছিস্ বুঝিনি ভাবিস বুঝি? গ্যাট হয়ে বোস্ দিকিনি—পেট জ্বলছে, দুধসাবুটা গিলে নিই।

ছোট বোন সুমিত্রাকে ডেকে দুধসাগু আনতে বলেছিল। প্রতিমার বদলে এনামেলের চল্‌টা-ওঠা বাটিতে দুধ-সাবু নিয়ে এসেছিল কুমারের বিধবা মা।

ময়লা ছেঁড়া কাপড়।

ম্লান শীর্ণ মুখ।

তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, এত রাতে তুমি? কি হয়েছে বাবা?

কুমার বলেছিল, রুটি আছে মা?

একবার ঢোঁক গিলেই কুমারের মা হেসে বলেছিল, শুকনো রুটি কি দিতে আছে অতিথি বন্ধুকে? ভাবিস নে, দু'খানা পরোটা তোর বন্ধুকে দিতে পারব। খাঁটি ঘিয়ের নয় অবশ্য—ভেষজ তেলের।

মসুরের ডাল আর কুমড়োর ছেঁচকি দিয়ে পেট ভরে পরোটা খেয়ে গাঢ় ঘুম আসার প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল সমরেশের দেহ-মন।

কিন্তু যেতে হবে। দূরদূরান্তরে চলে যেতে হবে।

উচিত কাজ করতে চাওয়ার জন্য যে দেশের মা ছেলের গালে এমন-ভাবে চড় কষায়, সে দেশের ধারে কাছে সে থাকবে না।

খেয়ে উঠে চোখ টান টান করে বলেছিল, এবার আমি যাই।

কুমার বলেছিল, এত ব্যস্তবাগীশ কেন রে তুই? বোস্ না একটু।

কুমারের মা বলেছিল, তোকে খানিকক্ষণ বসতে হবে সমু। একটা দরকারী কথা আছে। হাতের কাজ সেরে এসে বলছি।

কুমারের বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সমরেশ।

ভোরবেলা মা গিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনতে।

কুমারের বাড়ী থেকেই নিশ্চয় খবর পৌঁচেছিল।

রান্না ঘরেই ভাঙা চোরা ধরোয়াভাবে পেরেক ঠুকে মেরামত করা জল-চৌকিটাতে বসে কড়ায়ে অল্প তেলে শাকটা নাড়তে নাড়তে ঢলে পড়ে গিয়ে মা বিছনা নিল তার দায় ঘাড়ে নেবার ক'মাস পরে।

সমরেশ চালু করেছিল দৈনিক দু চার পয়সার শাক সকলে ভাগা ভাগি করে খাওয়ার ব্যবস্থা।

শাকের ভাগটা খেতে হবে সকলের।

পালং সস্তা হয়েছিল। মনে আছে একেবারে আধসের কিনে এনেছিল।

পালং শাক নাকি ভিটামিনে বোঝাই।

সেই আধ সের শাক কড়ায়ে নাড়তে নাড়তে কাত হয়ে আছড়ে পড়ল, ডাক্তার ডেকে আনতে আনতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ডাক্তার বলল, রাতদিন শুয়ে থাকতে হবে।

হৃদয়ের গণ্ডগোলের ব্যাপার।

এই হৃদয়ের ডাক্তারি নাম কি হার্ট?

বাড়ীতে চারটি বোন।

আগে খেয়াল হয়নি, আজকাল সমরেশও জেনেছে ছেলেমেয়ের নামকরণ নিয়ে তার বাপের কি বাতিক ছিল।

ছ'টি বোনের নামকরণ হয়েছিল সতী, আরতি, প্রীতি ব্রততি, প্রণতি, স্থনীতি!

নামের বাহার!

বাহারের নামের চার বোন আর জগদম্বা ও হরিমতী নাম্নী দুই পিসীর দায় একা সামলাতে সামলাতে সমরেশ বুঝে নিয়েছে বাপের এই ছেলেমেয়ের নাম রাখা নিয়ে খাপছাড়া ঝোঁকের মানে।

দুটো মেয়ে জন্মাবার পর সে জন্মেছিল পুত্রসন্তান।

বাঁচবে তো?

মেয়ে সন্তান জন্মেছে দু'টো।

মরুক বাঁচুক।

পুত্রসন্তান সে বাঁচবে তো?

চার

মহিম আর বনমালী যে দায় সামলাত, মহিমের মরণের পর একা বনমালী আরও কিছুকাল সে দায় সামলে এসেছে—সে দায় সামলাচ্ছে ছেলেমানুষ সমরেশ !

লোকে অবশ্য জানে না কিভাবে সামলাচ্ছে।

সমস্ত সংসারটা যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে সবাই তা জানত।

ওদিকে কারবারের অবস্থা কাহিল, এদিকে মহিমও নেই বনমালীও নেই।

কদিন চালাতে পারবে সমরেশ ?

আগের মত সমারোহের সঙ্গে না হলেও সমরেশ মাসের পর মাস চালিয়ে যায়।

সংসার এবং কারবার !

পিসী হরিমতী গোটা তিনেক দোক্তা পান মুখে পুরে দিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে চিবিয়ে নিয়ে ভাঙ্গা বালতিটায় একগাদা পিক ফেলে বলে, সমু বেঁচে থাক, রাজা হ'।

বুড়ো মানুষেরা বলে, সমু, তুমি যে তাক লাগিয়ে দিলে বাবা ! বাপের দায়টা এই বয়সে এমন করে কাঁধে তুলে নিলে ? কেউ টের পেল না মহিমের অভাব ? সাধ আহ্লাদ বয়েসের ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে সোজাসুজি বাপের যোয়ালটা ঘাড়ে নিলে ! একটু এদিক ওদিক হতে দিলে না !

সমবয়সী যোয়ান মানুষেরা বলে, এ কি রকম বুড়োটে ভারিক্কি হয়ে

গেলি সমর? তুই এমন ম্যাদা মেরে যাবি, কেউ আমরা ভাবতে পেরেছি! ব্যাপার কি বল দিকি নি? বোমা বানাচ্ছিস না চোরাবাজারে ঢুকেছিস? না, মন্ত্রী হবার সাধনা জুড়েছিস?

কিশোররা বলে, সমরদা', কেন এমন হয়ে গেলেন? কেন এমন মুষরিয়ে গেলেন? কি হয়েছে সব কিছু খুলে বলুন না আমাদের, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি!

নন্দিতা এবং অন্য কয়েক জন মেয়ে বন্ধু নানাভাবে নানা ভাষায় একই উপদেশ দেয়, দু'চার মাস বাইয়ে ঘুরে আসুন না? আপনি গেলে বাড়ীতে কেউ ব্যাটা ছেলে থাকবে না ভাবছেন? আমরা পালা করে আপনার বাড়ীতে থাকব—ব্যাটা ছেলের যা কিছু আপনি করেন, সব আমরা করে দেব।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের একঘেয়ে গা বাঁচানো কথা শান্ত নিরুদ্বেগ মুখের ভাব বজায় রেখে শুনে যায়—যেন সবিনয়ে শুনছে।

একটা নিশ্বাস ফেলে।

মাথা নত করে খানিকক্ষণ যেন গভীর ভাবে চিন্তা করে।

ধীরে ধীরে যেন অপরাধীর কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত স্বরে বলে, কি করব বলুন? বাবা ছিলেন, আড়ালে ছিলাম। বাবা একলাই সব সামলাতেন। বাড়ীতে এখন আমিই একমাত্র পুরুষ। ছ'টা বোন, তিনটের অবশ্য বিয়ে হয়েছে, দুটো স্বামীর ঘর করে। সেজটাকে স্বামী শ্বশুর নেয় না। তার মানে দাঁড়াল চারটে বোনকে সামলানো। একটা বিয়াতো, তিনটে অবিয়াতো। বাচ্চা ভাই আছে দুটো। সেজো মাসী একটা মেয়ে নিয়ে সাত বছর আছে, মেজ পিসী দুটো বয়স্থা ধুমশো মেয়ে আর দুটো বাচ্চা ছেলে নিয়ে আছে। কী করি বলুন তো, উপায় কি?

তার দায়ের ফিরিস্তি শুনে বাক্যহারা হয়ে থাকে প্রৌঢ় আর বুড়োরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা কথাবার্তায় সমারোহ সুরু করে দিয়ে তারা জ্যাঁকিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে আত্মনুসন্ধিতার প্রৌঢ়টে বুড়োটে খেলায়।

সমবয়সী যোয়ানদের সমরেশ হাসিমুখে বলে, একদিন এসে দেখে গেলেই পারিস ভাই অবস্থাটা? আজ পর্য্যন্ত কটা মেয়ের দায় সামলেছিস বল দেখি ভাই? একা আমি বাপের ঘরেই এগারটা মেয়েছেলের ঝনঝাট পেয়েছি ঘাড়ে!

কিশোরদের বলে, বদলে গেছি কেন? তোমাদের সঙ্গে খেলি না কেন? বড় হও, সংসার ঘাড়ে চাপুক তখন বুঝবে।

সমরেশ খুব ভোরে ওঠে। প্রায় শেষ রাত্রে। যেদিন নিজে থেকে ঘুম ভাঙ্গে না, প্রীতি তাকে তুলে দেয়।

প্রীতি ঘুমায় সবার শেষে। জাগে সকলের আগে।

আজকাল মাঝে মাঝে সমরেশের মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়, উঠে জলটল খেয়ে বেশ খানিকক্ষণ বইটই পড়ে কসরৎ করে ঘুমোতে হয়।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে স্বচক্ষে প্রীতিকে ঘুমোতে না দেখলে তার মনে খটকা থেকে যেত যে রাত্রে প্রীতি সত্যি ঘুমায় কিনা!

ভোর রাত্রে ডাকাডাকি করে প্রীতি তার ঘুম ভাঙ্গায় না। কল ঘর থেকে ঘুরে এসে ভিজে হাতটি সমরেশের দু'চোখে বুলিয়ে কপালে রাখে।

মৃদুস্বরে ডাকে, সমু?

আচমকা না জাগিয়ে আস্তে আস্তে তাকে জাগায়। হঠাৎ কাউকে জাগিয়ে দিলে তার নাকি অসুখ হয়।

বিয়ের পর বছরখানেকের মধ্যে বোধ হয় এসব নিয়মনীতি সে তার অপদার্থ স্বামীর কাছ থেকে শিখে এসেছে। আগে তার এসব বাতিক ছিল না।

বড় বোন কিন্তু পিঠাপিঠি। ঠিক চোদ্দ মাসের তফাৎ তাদের বয়সের। ছেলেবেলা থেকে নাম ধরে ডেকে এসে দিদি বলাটা আর রপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

: কনকনে শীতের ভোরে বরফের মত হাতটা ছোঁয়ালি? ছ্যাঁক করে উঠেছে একেবারে।

: মিছে কথা বলিস না সমু। আমার বুঝি খেয়াল নেই? সইয়ে সইয়ে হাত ছুঁয়িয়েছি।

: ঠেলা দিয়ে ডেকে তুললেই হয়?

: ছি! ঘুমন্ত মানুষকে ওভাবে ডেকে তুলতে নেই।

আশে পাশে পাঁচ সাতটা সাইরেন তবে এবার আকাশ চিরে আর্তনাদ সুরু করল কেন হাজার হাজার মানুষকে জাগিয়ে দিতে? কুমার বলে, এমন জীবন্ত উদাত্ত আওয়াজ নাকি জগতে আর নেই—এই আওয়াজে অনেক যুগের ঘুম ভেঙ্গে জগতের মানুষ জেগে উঠছে!

উপরে নীচে ছোট বড শোবার ঘরগুলির দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত ভাইবোন মাসীপিসীদের বিছানায় টাঙ্গানো মশারিগুলির দিকে চেয়ে সমরেশ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, তার কানে কেন এমন কর্কশ লাগে কারখানায় এই তীক্ষ্ণ ভোঁ বাজা?

প্রীতি আগেই উনানে আঁচ দিয়েছিল, বদ্ধ ঘরে ধোঁয়ার কুয়াশা জমে আছে।

নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হয়।

কী করে এরা এভাবে জানালা দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়?

কতবার কতভাবে চেষ্টা করেছে ওদের এই স্বভাব শোধরাবার জন্য। সকলের প্রতিদিন শাক খাওয়ার নিয়ম চালু করার সময়ও সকলকে ধমকে দিয়েছে যে এভাবে বদ্ধ ঘরে যদি তারা ঘুমোয়, কারও অসুখ হলে ওষুধ-পত্র আসবে না, চিকিৎসা হবে না।

কে কার কথা শোনে!

বেশী করে শাক খাওয়ার নিয়ম মেনে নিয়েছে বিশেষ গোলমাল না করেই, রাত্রে জানালা খুলে শোবার ব্যবস্থা তারা মানতে পারে নি।

বাড়ীর কর্তা বলে নেহাৎ তার খাতিরেই বোধ হয় কোণের জানালার একটা পাট একটু ফাঁক রাখে।

শীত কেটে গিয়ে সামনের গরমের দিনে এবার যখন ফ্যান চলবে না, তখন ওরা কি করবে?

: তোমাদের দম আটকে আসে না?

: শীতে কেঁপে মরে ঘুম না আসার চেয়ে একটু দম আট্‌কানো ঢের ভালো।

শীত! পুরাণো হলেও স্তূপাকার লেপ তোষক, তবু ওদের শীত ঘোচে না!

জগা পিসী উঠেছে।

কলে মুখ ধুতে গিয়ে জগা পিসীকে ভিজে কাপড়ে পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ঘুরে ঘুরে নানা কায়দায় প্রণাম করতে দেখে হঠাৎ সমরেশের প্রাণে আশা জাগে—আজ কি কোন বিশেষ দিন, আজ কি তার ছুটি আছে?

পরক্ষণে খেয়াল হয়, ছুটি থাকলে ক্যালেণ্ডারে আজকের তারিখ

লাল রঙে ছাপা থাকত, আপিসে গতকাল ছুটির নোটিশ জারি না করে কর্মচারী কজনের কাছে সেও কি রেহাই পেত ?

: আজ কি গো পিসী ?

ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে প্রণামের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে যেতে জগা পিসী বলে, পোষ সংক্রান্তি থেকে তো করছি বাবা। মধুর বাপের বাড়ীর নিয়ম—তোদের নেই। তিনদিন একশো আটবার করে দিক-পূজা করতে হবে।

রান্নাঘরে গিয়ে পিঁড়িতে বসতেই প্রীতি ধোঁয়াটে পানীয়ের কাপ এগিয়ে দেয়।

উনানে চাপানো বালির স্সপেনটা নেড়ে চেড়ে নামায়।

ঠিক যেন মায়ের মত মুখখানা।

মায়ের মত মুখ কিন্তু মায়ের সঙ্গে কী অমিল নিয়েই গড়ে উঠেছে ওর প্রকৃতি !

সংসারে একমাত্র প্রীতির সঙ্গেই মার ছিল সব চেয়ে বেশী রকম ঝগড়াঝাঁটি আর খিটিমিটি।

প্রীতির ছিল এক ব্রহ্মাস্ত্র। মা খুব রেগে গিয়ে কপাল চাপড়ে তাকে যা-তা বলতে সুরু করলে সেও কপাল চাপড়ে চীৎকার করে বলত, জানি গো, জানি। শ্বশুরবাড়ীতে নেয় না, তোমার ঘাড়ে খাচ্ছি—আমি তো হবই তোমার দু'চোখের বিষ, উঠতে বসতে সাধ মিটিয়ে আমায় তো তুমি গালাগাল করবেই।

মা সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে যেত।

মহিম মরার পর, কারবারের সঙ্কট সংসারে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে সব কিছু ওলোট পালোট করে দিতে আরম্ভ করার পর, মা খিটিমিটি বন্ধ করে দিয়েছিল প্রীতির সঙ্গে।

প্রীতিকেই যেন তার ভাল লাগত সবচেয়ে বেশী।

কড়ায়ে শাক নাড়তে নাড়তে ঢলে পড়ে গিয়ে মা বিছানা নিয়েছে। শাক নাড়া থেকে সংসারের সব ঝন্‌ঝাটে প্রীতি হয়েছিল তার সহকারিণী।

মা বিছানায় পড়ে আছে অনেকদিন।

তাকে দেখে কল্পনা করা যায় না জীবিত আর মৃত মিলিয়ে এতগুলি সন্তানকে সে প্রসব করেছে।

এতগুলি নতুন মানুষকে যে জন্ম দেয়, মোটে তিনজনকে রোগের কবল থেকে সামলাতে না পারলেও বাকী এগারজনকে বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রাখে—তার নাকি এই দশা?

ওই-মা 'ক'মাস আগেও একা হাল ধরে চালাত ভাত ডাল তরকারী বার্লি পাচন তৈরীর সমস্ত হাঙ্গামা।

আরেক কাপ গরম পানীয় আর দুটো বাসি সেঁকা রুটি এগিয়ে দিয়ে প্রীতি বলে, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিস সমু।

: কেন?

প্রীতি ঘুরে বসে। ডাগর ডাগর চোখের স্নেহ-ভরা দৃষ্টি বুলিয়ে যায় সমরেশের সর্বাঙ্গে।

ভোর হয়ে আসছে। ছেঁড়া, জোড়াতালি দেওয়া মশারি ঢাকা বিছানায় ঘুমন্তদের মধ্যে নড়াচড়া এপাশ ওপাশ করা আরম্ভ হয়েছে কিছুক্ষণ থেকে।

রোজই বার্লি জ্বাল হয়। ছোট বড় কেউ না কেউ অসুখে পড়ে রোজই বার্লি খায়।

ভাগ্যে এ বাড়ীতে কচি শিশু নেই!

ভাগ্যে একমাত্র প্রীতি ছাড়া এ বাড়ীতে বিবাহিতা নারী নেই—শুধু কুমারী আর বিধবা!

ভাগ্যে—

গরম পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে আরেকটু হলে সমরেশের বিষম লগত।

নাঃ, প্রীতির বিয়ে হয়েছে দশ বছরের বেশী, স্বামীর ঘর করতে পারল না বলে তার কোলে কচি শিশু নেই, এটাকে কোনমতে ভাগ্য বলা যায় না।

এত ভোরেই কপালে সিঁদুরের নতুন ফোঁটা পড়েছে, সীঁথিতে সিঁদুরের নতুন ছোঁয়াচ লেগেছে। কী শান্ত নির্ব্বিকার প্রীতির মুখের ভাব, কী ধীর স্থির তার চালচলন।

মা বিছানা নেবার পর আরও যেন ধীর আর শান্ত হয়েছে সংসারের ঝন্‌ঝাট ঘাড়ে নিয়ে।

ধরতে গেলে সে তো একরকম বিধবাই! শুধু একটা নিয়ম রাখতে সিঁদুর পরেছে। সত্যি সত্যি বিধবা হলে সিঁদুরের চিহ্ন মুছে ফেলবে, আর পরবে না।

কিছু যেন এসেও যাবে না তাতে।

আগের দিন অনেক সময় দিয়ে বেছে রাখা ছিল চাল ডাল আর কুটে রাখা হয়েছিল তরকারী। কাজ করার লোকের কোন অভাব নেই কিন্তু খুব সকাল সকাল রান্না না চাপালে চলে না।

এলুমিনিয়ামের একটা ছোট হাঁড়িতে মুঠোর হিসাবে কিছু বাছা চাল, চামচ হিসাবে কিছু ডাল আর গুন্‌তি হিসাবে কয়েকটা আলু ছেড়ে দিয়ে প্রীতি ঘুরে বসে।

মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করে, পাঁচদিন মাছ আনিস নি! শুধু মুখের স্বাদের কিম্বা সখের ব্যাপার নয় তো। এত খাটছিস—তোরও তো একটু মাছ মাংস খাওয়া দরকার? পাঁচদিন মাছ আনিস নি।

: মাছের যা দাম!

উনানের তলাটা খুঁচিয়ে দিয়ে প্রীতি বলে, বাজারে গিয়ে কাজ নেই। পচা হোক যেমন হোক আতপ চাল আছে, এবেলা সিদ্ধ-পোড়া দিয়ে চালিয়ে দেব। আধসেরের মত আলু আছে—

: কোত্থেকে এল? কাল যা আলু এনেছিলাম, রাতে দম রেঁধে ফুরিয়ে দিস্ নি?

: দিয়েছি তো। এত ওরা ভালবাসে আলুর দম! পুন্টা তো দমের নামে পাগল। ক'দিন ধরে দম দম করছে সবাই, করব না? এক হাতা ডাল আর দু'টো দমের আলু—এই দিয়েই তো শুকনো রুটি গেলা। শাক পাতার বদলে ওইটুকু দম পেয়েই সবাই কত খুশী! কিন্তু কি জানিস সমু—

: আমি সব জানি, শুধু আলু কোথায় পেলি সেটা ছাড়া।

: কোথায় আবার পাব? জমিয়েছি।

হাসিমুখে তেজের সঙ্গে কত হাল্কা সুরে কথা সুরু করেছিল, কী ভাবে হাসিটা উপে গিয়ে শুধু তেজের ভাবটা বজায় থাকে!

অবিকল প্রায় মার মত মুখ পেয়েছে, কিন্তু মায়ের ধাতটা একটুও প্রীতি পায় নি।

এই কথা কটা বলতে গিয়ে মা কি ভাবে আকুল হয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিত কল্পনা করে সমরেশ চুপ করে থাকে।

গলায় ভাবাবেগের বাধা জমলে পুরুষেরা যেমনভাবে গলা খাঁকারি দিয়ে ধাতস্থ হয়, তেমনিভাবে গলা খাঁকারি দিয়ে প্রীতি বলে, আলু কিন্তু সত্যি ধারে আনি নি। আমি কি শুধু আনি পয়সাই এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখি ভাবিস, তোর ট্যাঁক একদম ফাঁকা হলে ঠেকা দেওয়া চলবে বলে? আলুও আমি একটা দু'টো করে জমাই। আধ সেরের বেশী

জমে গেছে। আলু সিদ্ধ ভাত হবে আর কালকের ফুলকপিটার যে ডাঁটা আছে তাই দিয়ে একটা চচ্চড়ি হবে, বাস্। চার পয়সার পালং আমি আনিয়ে নেব—তোকে বাজারে যেতে হবে না।

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপার কি বল্ দিকি? সুরু করলি পাঁচদিন মাছ আনি না দিয়ে—তারপর বার বার বলছিস বাজারে যেতে হবে না?

প্রীতি শান্ত কণ্ঠে বলে, ব্যাপার আর কিছুই নয়—একটা সোজা হিসাবের কথা। বাজার খরচ আরও কমিয়ে দেব, বাড়ীর সকলের জন্য মাছ ডিম আনতে হবে না—বাইরে দোকানে তোকে একটু মাংস ডিমটিম খেতে হবে।

: আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। বাজারে যাচ্ছি, আজ মাছ কিম্বা মাংস হবে।

: তুই বড় ছেলেমানুষ সমু।

সমরেশ এবার একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বলে, প্যাচাল না পেরে আসল কথাটা বল্ দিকি এবার? দিদিগিরি ফলাস না।

: আসল কথাটা? বলছি তো—ব্যস্ত হোস কেন? মনটা ঠিক করছি বুঝিস না!

বলে সে উঠে গিয়ে তারে ঝুলানো গামছাটা টেনে কল ঘরের দিকে চলে যায়।

সমরেশ ভাবে, সে বুঝি জানিয়ে গেল ফিরতে তার খানিকক্ষণ দেরী হবে। কারণ যাবার সময় সে বলে যায় যে খানিকটা চিঁড়ে আর ভেলিগুড় দিয়ে সকলের রুটি খাওয়ার জন্য যে পিণ্ডটা উনানে চাপানো আছে সেদিকে সে যেন একটু নজর রাখে।

কিন্তু প্রীতি ফিরে আসে অল্পক্ষণের মধ্যেই।

প্রণতি উঠে বিছানায় বসেই শীত আর আলস্য জয় করে উঠবার আয়োজন করছে দেখে বলে, বলেই ফেলি। ওরা উঠলে আজ আর বলা হবে না। খুব গুরুতর কথা কিন্তু, মন দিয়ে শোন। সবাইকে নিয়ে একলা তুই হিমশিম খাচ্ছিস! আমি ঠিক করেছি আর তোর ঘাড় ভেঙ্গে খাব পরব না, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেব।

সমরেশ ভাবে, সর্ব্বনাশ! কে জানে কি মতলব গজিয়েছে প্রীতির মগজে?

স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে ঠিক করেছে নাকি?

প্রীতি রাত্রে সেঁকা রুটিগুলি তাওয়ায় একটু উল্টে পাল্টে গরম করে নেয়। তারপর বলে, তোকেও অবশ্য একটু হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। তবে আমাকে খাওয়ানো পরাণোর হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবি। মাসে মাসে পাঁচ দশ টাকা তোকে সাহায্যও করতে পারব।

সমরেশ এবার সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে বলে, আবার ফেনাতে সুরু করলি? সোজাসুজি বল না কথাটা?

প্রীতি দমে না গিয়ে বলে, বড় ব্যস্তবাগীশ তুই। বলছি কথাটা গুরুতর—একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে পারিস না?

কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকে। তারপর আচমকাই বলে, খোরপোষের মামলা করব।

: ও!

সেরকম চমকে বা ভড়কে যায় না সমরেশ—প্রীতি যে রকম কল্পনা করেছিল। প্রীতি বোধ হয় আজ আরও ভাল করে বুঝতে পারে সংসারের দায় ঘাড়ে নিয়ে ভাইটি তার কম পোড় খায়নি।

বয়স খুব বেশী বেড়ে না গিয়ে থাক, সেদিনের ছেলেমানুষ সমরেশ অল্পদিনে অনেকখানি পেকে গেছে।

আর পাওনা ছিল না, তবু আরেক কাপ চা সমরেশ নিজেই ঢেলে নেয়। কারো কম পড়লে প্রীতি নিশ্চয় পূরণ করে সামলে নেবে।

: খুব কষ্ট পাচ্ছিস, না? তাই এসব উদ্ভট ভাবনা মাথায় আসছে? যেন মামলা করলেই বিরাম তোকে খোরপোষ দিতে রাজী হবে। আইন এত সোজা ভাবিস? প্রমাণ করতে হবে বিরাম মাতাল গুণ্ডা দাগী কয়েদী। তোকে মার ধোর করে, খেতে পরতে দেয় না—আরও অনেক কিছু প্রমাণ দিতে হবে। এতকাল ঘর করিস নি কেন, এতকাল খোরপোষ দাবী করিস নি কেন—

: চুপ্ কর তো সমু। একদিকে এত সব গুরুতর ব্যাপার দিব্য বুঝিস—অন্যদিকে তুই এমন হাল্কা আর ছ্যাবলা! আমি কি হিসেব নিকেশ না করেই ঠিক করেছি এটা? উকিলকাকার সঙ্গে পরামর্শ করছি না দু'তিন মাস ধরে?

উকিলকাকা মানে পাড়ার যাদব উকিল। আগে খুব দুরবস্থা ছিল, ওকালতি সুরু করায় প্রথম আট দশ বছর। মানুষটা নাকি ছিল নীতি-বাগীশ, লিখিত আইন যা আছে তাই নিয়ে সোজাসুজি মামলা জিততে চেষ্টা করত, কোন রকম মারপ্যাচের ধার ধারত না, আইনেও যে আবার অনেক রকম ফাঁকি চলে এটা মানত না।

মক্কেল জুটত না। খেতে পেত না মানুষটা।

তারপর কবে নীতি বদল করে সে আইনের মারপ্যাচে আর অন্য অনেক রকম কলা-কৌশল ও তদারকে মক্কেলের স্বার্থ আইন মতেই হোক অথবা আইনে ফাঁকি দিয়ে হোক রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করেছিল অনেকেই তা জানে।

যোয়ান বড় ছেলেটা যক্ষ্মায় মরে যাওয়ার পর—প্রায় বিনা চিকিৎসায় মরে যাবার পর।

তিন চার বছর সময় লেগেছিল নীতির রূপান্তরকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে। বছর পনের পরে, পঞ্চাশ ডিঙানো বয়সে আজ বিষম রকম পশার যাদবের।

আইনের প্যাঁচ আর ফাঁকির কৌশল খাটিয়েও সহজে হাঁসিল না হলে সাধারণ আইন বিশেষ আইনের আওতার উর্দ্ধে যারা আছে, তাদের কোন একজনকে ধরে হুকুম আর ধমকের জোরে অনেক মক্কেলের কাজ হাসিল করে দেয়।

সমরেশ বলে, তবেই দফা সেরেছিস।

প্রীতি একটু হাসে।

: তুই দেখি ভড়কে গেলি একেবারে। আমি কি সোজাসুজি উকিল-কাকার সঙ্গে পরামর্শ করেছি? উকিল-কাকার দু'নম্বর বৌটা আমার সই হয় জানিস না? দু-মাস ধরে মীরাকে দিয়ে কথা চালাচ্ছি। ইস্ উকিল-কাকাটা কি বজ্জাত রে সমু, কি বলব তোকে! সইকে দিয়ে আমার দু'একটা গয়না বাগাবার কত চেষ্টা করেছে। সইটা শক্ত মেয়ে নইলে—

সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বুঝলাম, সারাদিন বাড়ী থাকি না, পাড়ায় ঘোঁট পাকিয়ে বেড়াস। ওসব কথা বাদ দে দিকি। বিরাম কেন তোকে খোরপোষ দিতে বাধ্য হবে সেই কথাটা বল?

কড়ায়ে ডাল ভাজতে সুরু করেছিল প্রীতি। চারিদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। একে একে ঘুম ভেঙ্গে উঠে হাই তুলছে তার পঁচিশ থেকে তের বছরের আইবুড়ো বোনেরা। মিনতি কেবল বালিশটা আঁকড়ে শুয়ে থাকার চেষ্টা করছে ডাকাডাকি গ্রাহ্য না করে।

ডাল পুড়ে গন্ধ ছাড়ছে।

নাকে কি লাগে না প্রীতির ?

প্রণতি ছুটে আসে। জগা পিসী গলা চড়িয়ে ডাক দেয়।

হঠাৎ আধপোড়া ডালগুলি নাড়তে সুরু করে প্রীতি বলে, আদালতে সব কথা খুলে বলতেই হবে, তোকেও বলি। জানাজানি তো হয়ে যাবেই। তবে সে পর্য্যন্ত গড়াবে মনে হয় না। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করার কথা তুললেই তোদের ওই বিরামবাবু কেঁদে কেটে খোরপোষ দিতে রাজী হয়ে আপোষ করবে।

সোজা ভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে প্রীতি আবার বলে, তোরা জানিস আমায় ওরা ত্যাগ করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে। আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। আমি নিজে চলে এসেছি। সইতে পারলাম না —কি করব? গয়না গাঁটিও কেড়ে নেয় নি—সাহস পাবে কোথায়? সব বাক্সে তোলা আছে। একটা শুধু বোকামি করেছি, ওরা যা দিয়েছিল সেগুলো ফেরত দিয়ে এসেছি। মনটা কাঁচা ছিল তো, নিজের অধিকার বুঝতে শিখি নি।

সমরেশ কথা কয় না। ঝুলানো জামার পকেট থেকে একটা বিড়ি এনে ঝাঁটার কাঠি ভেঙে উনানে জ্বালিয়ে বিড়িটা ধরায়।

উনান ধরাবার জন্য তার জামার পকেট থেকে দেশলাইটা নিয়ে এসে প্রীতি কোথায় রেখেছে কে জানে ?

একটা দেশলায়ের দাম তিন পয়সা।

অর্দ্ধেকের বেশী খরচ হয়েছে। দেড় পয়সার মত একটা দেশলায়ের বাক্সের জন্য সে বোনের সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি করা যায় যে বোন সম্রাট পুরুষদের পক্ষপুষ্ট তার স্বামীটিকে শুধু ডাক্তারি পরীক্ষার ভয় দেখিয়ে আইন খাটিয়ে খোরপোষ আদায় করতে চায় ?

না খেয়ে মরা কত মানুষের মরণকে আইন-সম্মত ডাক্তারি পরীক্ষায় স্বাভাবিক রোগে ভুগে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে খবর কি প্রীতি রাখে না?

একটুকরো রোদের ফালির ছোঁয়াচ লেগেছে যাদব বাবুদের তিনতলা বাড়ীর ছাতের আলসের রাখা টবের ফুলের চারাগুলিতে।

যত্নের সীমা নেই। তবু দু'টো একটার বেশী কুঁড়ি ফলে না কোন চারাতে।

ছেলেবেলা মামাবাড়ী গিয়ে এমনি কুয়াশাবিহীন কন্ কন্ করা শীতের রাত্রির শেষে এলোমেলো ভাবে দূর দূরান্তরে ছড়ানো তাল নারকেল গাছের ডগার এমনি মৃদু সোণালী রোদের ছোঁয়াচ লেগে ভোর হতে দেখেছিল কতবার।

মা যেতে পারুক বা না পারুক, ভাগ্নীরা মরুক বাঁচুক, একমাত্র ভাগ্নে তাকে মামারা প্রতি বছর রাজপুত্রের মত সমাদরের সঙ্গে নিয়ে যেত, পায়েস মিষ্টি মিষ্টান্ন পিঠা পাটালি খাইয়ে খাইয়ে একেবারে লেজে গোবরে হওয়ার মত পেট খারাপের অবস্থায় পৌঁছলে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে কয়েকটা কড়া কবিরাজী বড়ি আর পাঁচন খাইয়ে মোটামুটি সামলে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠাত।

সে সব কিছুই ভোলেনি সমরেশ। পেটে অতিরিক্ত বোঝাই নেবার কষ্টে শেষ রাত্রে ছটফট করতে করতে দু'তিন বার প্রাণের ভয় ত্যাগ করে ঘাটের পাশের জঙ্গলের ধারে আর ঘাটে যাওয়া আসা করে আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাটা তার মনে ছাপ রেখে গেছে জেলখানার কয়েদী হবার মত।

যদিও জেলে যাবার কোন অভিজ্ঞতা তার নেই।

একমাত্র প্রীতি ছাড়া বোনেরা কে আগে উঠবে কে পরে উঠবে কোন নিয়ম নেই।

কোনদিন আগে ওঠে ওদের মধ্যে বড় সুমতি, কোনদিন সে ওঠে সকলের শেষে।

কোনদিন ওদের সবার আগে ওঠে সবার ছোট সুনীতি।

ঘড়ির হিসাব ধরলে মাঝখানের দু'জন, প্রণতি আর প্রভাতি ওঠে প্রায় ঘড়ি ধরে একই সময়ে।

গরম কাপড়ের কোন অভাব নেই—আরও কয়েক বছর চলে যাবে। সকলেই শীতকালে বেশ দামী দামী নতুন পুরাণো আলোয়ান গায় দিতে পায়।

সমরেশের শালটা ছিল মার প্রথম বয়সের সখের জিনিষ—শীতের দিনে কোথাও যেতে হলেই শুধু গায়ে চড়ত।

এত পুরাণো হলেও, কয়েক যায়গায় পোকায় কেটে ফুটো করে দিয়ে থাকলেও দিব্যি গায়ে দিয়ে শীত ঠেকানো যায়।

প্রীতির মত সুমতিও পিঠাপিঠি বোন—ছোটর দিকে। কুড়ি পেরিয়ে সুমতি-একটু মোটা হয়ে গেছে।

আজে বাজে তরকারী দিয়ে পচা চাল আটা খেয়েই কিনা কে জানে! কিন্তু মুখখানা যেন লক্ষ্মী প্রতিমার ছাঁচে গড়া।

ধীর স্থির মেয়ে।

তার খেয়াল থাকে না, রোজই প্রায় গায়ের লেপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে ছেঁড়া শাড়ীর জন্য লজ্জা পেয়ে তারপর সামলে নেয়। আরও দুতিন বোনেরও এই লেপটা দিয়েই শীত কাটছে।

খসা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে আলগা খোঁপাটা আঁটতে আঁটতে সুমতি একটা হাই তোলে।

জিজ্ঞাসা করে, ছাই রঙের উলটা কাল এনেছিস সমু ?

পিঠাপিঠি বড় বোন প্রীতিকে সমরেশ যেমন নাম ধরে ডেকে তুই বলে কথা কয়, পিঠাপিঠি বড় ভাই তাকেও সুমতি তেমনি নাম ধরে ডেকে তুই বলে কথা কয়।

ছেলেবেলা থেকেই এটা চালু হয়ে গেছে।

সমরেশ বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিতে যাবে, প্রীতি কড়ায়ে ডাল সম্ভার দিতে দিতে চেঁচিয়ে বলে, ও উলটা দু'দিন পরে আসবে মতি—সমুর হাতে এখন পয়সা নেই। বাদামী উলের কাজটা সার না আগে, সেন-গিন্নী তাগিদ দিচ্ছে ?

: চুপ কর মুখপুড়ি। সমু আগে ওই উল এনে দেবে তবে আমি সেন-গিন্নীর কাজে হাত দেব।

সুমতি আরেকবার হাই তোলে। টগবগ আওয়াজ তুলে কড়ায়ে ফুটছে পাতলা ডাল। উনানের তলা থেকে ঘুঁটের ছাই নিয়ে দাঁত মাঝতে মাঝতে সে সমরেশের কাছেই উবু হয়ে বসে।

রাত্রের এঁটো বাসনের স্তুপ থেকে একটা বাটি টেনে নিয়ে থুথু ফেলে বলে, একছিলুম তামাক দেব ? বিড়ি না টেনে বাবার মত তামাক খেলেই পারিস্ !

আজ আচমকা সমরেশের একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে—সুমতির কি একটু রূপের দেমাক আছে ? তার হাই তোলার মধ্যে পর্য্যন্ত একটা যেন বিশেষ ভঙ্গি আছে !

বোনটি তার সুন্দরী কিনা আগে কোনদিন সেটা খেয়ালও করে নি। ওর বিয়ের চেষ্টা সুরু করে তার প্রথম নজরে আসে সুমতি সত্যই খুব সুন্দরী—ওকে দেখে কেউ অপছন্দ করবে না।

সুমতিকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে সমরেশ টের পায়, রূপের দেমাক থাক বা না থাক, নিজের রূপ সম্পর্কে সুমতি বেশ সচেতন।

সুমতির পর তিন বছর ফাঁক দিয়ে জন্মেছিল প্রণতি।

লম্বা ছিপছিপে গড়ন, মুখটাও একটু লম্বাটে, সুমতির মতই গায়ের রঙ। মুখের গড়ন ওরকম লম্বাটে না হলে তাকেও বেশ সুন্দরীই বলা যেত।

মনে হয় একটু হাল্কা প্রকৃতির ফাজিল ধরণের মেয়ে—সময় সময় সবার ছোট সুনীতির চেয়েও তার ছেলেমানুষী ভাবটা যেন বেশীরকম উথলে ওঠে।

সুমতি বলে ছ্যাবলামি—কিন্তু প্রীতি কিম্বা সমরেশ কিছুই বলে না। প্রণতির স্বভাবের আরেকটা দিক আছে, আর কোন বোনের মধ্যে যা দেখা যায় নি।

যেমন চালাক চতুর তেমনি সব বিষয়ে চটপটে। কোনদিকে কিছু করার সুযোগ সুবিধা নেই তবু ছেলেবেলা থেকেই অনেক কিছু করার জন্য তার অদম্য উৎসাহ।

আজও সে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি।

অন্য মেয়েরা ঘরে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে, একমাত্র প্রণতিকেই মহিম কয়েক বছর স্কুলে পড়িয়েছিল।

স্কুল খতম হয়েছে কিন্তু তার পড়ার চাড় শুকিয়ে যায়নি।

তার ক্লাশের আগের চেনা মেয়েরা প্রেমোশন পেয়ে উপরের ক্লাশে উঠেছে, সে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছে তাদের অকেজো বই। পাড়ার স্কুলে পড়া মেয়ের কাছে প্রায় প্রতিদিন পড়া জেনে নিয়ে নিয়মমত পড়ে গেছে—পড়া বুঝতে চেয়ে চেয়ে জ্বালিয়ে মেরেছে সমরেশকে।

সমরেশ বলেছে, কেন মিছে জ্বালাচ্ছিস? লেখাপড়া তোর হবে না, আমার সময়ও নেই, সাধ্যও নেই খরচপত্তর করে তোকে পড়াই।

প্রণতি এতটুকু দমে না গিয়ে বলে, খরচপত্তর করে পড়াতে বলেছি তোমাকে? একটা বই কিনে দিতে বলেছি? শুধু তো পড়াটা একটু বুঝিতে দিতে বলছি!

সমরেশ কিছুদিন জ্বালাতন হয়ে বোনের উৎসাহ আর চেষ্টার বহর দেখে আর জ্বালাতন বোধ করেনি। বরং এই ভেবে লজ্জাই বোধ করে যে আজও লোকের কাছে বড়লোক বলে গণ্য হয়েও পয়সার জন্ম প্রণতির পড়া বাতিল করতে হয়েছে।

উঁচু ক্লাশের বই প্রণতি মেয়ে-বন্ধুদের কাছ থেকে যোগাড় করতে পারেনি। উপরের দু'তিনটা ক্লাশের বই স্কুলের চরম পরীক্ষা পর্য্যন্ত দরকার হয়।

ফাজিল চপল মেয়েটার একদিন সে কি বুকফাটা কান্না! পড়া বন্ধ করে বিগড়ে যাবার হুমকি দিয়ে, বাড়ীর সকলের কষ্ট করা আরও খানিকটা চরমে তুলে স্কুলের চরম পরীক্ষার জন্ম দরকারী বইগুলি কিনে দিতে সমরেশকে বাধ্য করেছিল।

প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে সে পাশ করেছে।

আরও পরীক্ষা পাশের অসাধ্য সাধনের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে নিজে থেকেই। কিন্তু বই পড়ার নেশা তার কাটেনি। ভোল পালটে গল্প উপন্যাস রম্য রচনা পড়ার নেশায় দাঁড়িয়েছে।

আর কিছু না পেলে গুরুতর বিষয়ে বোকা-হাবাদের জন্ম সহজ কিন্তু নীরস করে লেখা প্রবন্ধের বইও সই!

তার এই বই পড়ার নেশার জন্ম সমরেশকে মাসে মাসে একটা

লাইব্রেরীর চাঁদা গুণতে হয়। তাছাড়া পাড়ার কয়েক বাড়ীর মেয়ে বৌয়ের সঙ্গে একটা স্থায়ী বন্দোবস্তও করে ফেলেছে প্রণতি—যে সব বাড়ীতে লাইব্রেরীর বই আনা হয়ে থাকে।

বন্দোবস্তটা এই যে বই এনে ফেরত দেবার আগে অন্ততঃ একবেলার জন্ম বইটা প্রণতিকে দিতে হবে।

একবেলার জন্ম ধার করে আনা এমনি কোন বই কি প্রণতি কাল রাত জেগে পড়েছিল ?

দেরী করে সবার শেষে ঘুম থেকে উঠে প্রায় সুমতির মতই কয়েকবার হাইতুলে সে বিছানা ত্যাগ করে।

অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

হাই তুলতে তুলতে বিছানা ছেড়ে উঠলেও মুখে চোখে জল দিতে দিতেই যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে প্রণতি।

তাকে রাখা টাইমপিসটার দিকে একবার তাকিয়ে যেন লাফ দিয়ে উঠে তার মাথার বালিশের তলা থেকে ঘরোয়া ভাবে মোটা করে বাঁধানো—যে রকম কালো মোটা নোংরা বাঁধাই দেখেই টের পাওয়া যায় বইটা কোন পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পত্তি—বইটা নিয়ে তরতর করে বাইরে রওনা দেয়।

সমরেশ ডেকে বলে, নতি শোন !—নতি ?

: দাঁড়াও, আসছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে আসে। ঘরে তৈরী দাঁতের মাজন হাতে নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজতে সুরু করে বলে, কানাইদা' আপিস যাওয়ার আগে বইটা না দিয়ে এলে বেলা চটে লাল হয়ে যেত। দুপুরে খেয়ে দেয়ে বই না হলে বাবুর ঘুম আসে না। ভারি তো পড়ে, একটা বই পড়তে চার পাঁচ দিন লেগে যায়।

প্রীতি বলে, দাঁত মেজে এসে চা রুটি খেতে খেতে বকবক কর না নতি? তোর জন্যে হাঁড়ি নামিয়ে আবার চা গরম করব?

: খোঁচা দিয়ে কথা বল কেন? সোজাসুজি বললেই হয়!

দু'মিনিটে কি করে সে কলঘরে গিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে আসে সে-ই জানে।

ফিরে এসেই ভঙ্গি করে বলে, শুকনো পোড়া রুটি আর ট্যাকটেকে চা-টুকু দয়া করে দাও গো সেজডিডি। ইস্, আমি তোমায় কীভাবে সারাদিন খাটিয়ে মারি!

: মারিস না?

সমরেশ টের পায়, যতই ছ্যাবলামি করুক, প্রণতি জানে যে এবার কোনরকম একটা জবাব দিলেই প্রীতি রাগে ফেটে পড়ে ধমক দেওয়া সুরু করবে।

প্রীতির প্রশ্নটা কানে না তুলেই সে সমরেশকে বলে, বুঝলে না বই-এর ব্যাপারটা? বই হল বেলার দুপুরবেলার ঘুমের ওষুধ। চার পাঁচ দিন ঢোঁক ঢোঁক গিলে বই শেষ করে আমায় দেয়। পরদিন কানাইদা আপিস যাওয়ার আগে বইটা ফিরিয়ে দিতেই হবে—আমার সঙ্গে এই হল কড়ার।

সমরেশ বলে, কানাই তো ফিরবে রাত আট ন'টায়। আজ দুপুরে বেলার তবে চলবে কি করে?

: তুমি কিছু জান না বোঝ না, ভাব যে সবাই বুঝি তোমার মত কাজ-পাগলা মানুষ।

খিল খিল করে হেসে উঠেই হঠাৎ হাসি বন্ধ করে প্রণতি মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তার লজ্জা পাবার কারণটা খেয়াল করে সমরেশ মনে মনে একটু

হাসে। সে ভুলেই গিয়েছিল যে সকাল সকাল হাজিরা দিয়ে রাত আটটা ন'টায় ছুটি পেলেও আপিসের কাজে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করাটাই কানাই-এর আসল ডিউটি। বিয়ের আগে আপিস থেকে কাজে বেরিয়ে দু'এক ঘণ্টা এদিক ওদিক আড্ডা মেরে কাটাত, বিয়ের পর আজকাল বাড়ী এসে খানিকক্ষণ বেলার সঙ্গে কাটিয়ে যায়।

ট্রাম-বাসের পয়সা খরচ করে এতদূর আসে! বৌও কোন কোন মানুষের নেশা দাঁড়িয়ে যায় বৈকি!

হাঁটু পর্যন্ত নামে প্রণতির মোটা চুলের গোছা। সমরেশ লক্ষ্য করে যে লম্বা আর গোছ থাকলেও প্রণতির খোঁপাটা হয়েছে অস্বাভাবিক রকম প্রকাণ্ড। তাতে তারার রূপালি গুটি-ওয়ালা কাঁটা আটকানো। এই ফ্যাশনের খাঁটি রূপার গুটিওলা মাথার কাঁটা সে স্যাকরার দোকান থেকে কিনে বা অর্ডার দিয়ে তৈরী করে দেয় নি—কাঁটাগুলি পাঁচ ছ'পয়সা দামের নকল জিনিষ।

সাজগোজের বেলাতেও এরকম সব ছেলেমানুষী হাল্কা ফ্যাশন রপ্ত করেছে প্রণতি।

সুনীতির ডাকনাম সুনু।

চা আর শুকনো পোড়া রুটি খেয়ে সে কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে না।

যাদবের তিনতলা বাড়ীর ছাদের অলিন্দে বসানো টবের চারা থেকে নেমে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে আড়ালহীন আনাচে কানাচে।

আরাম করার সময় নেই। মাথায় একটু তেল দিয়ে তেলো হাতটা শীতে ফাটা গায়ে বুলোতে বুলোতে কলঘরে যেতে যেতে সমরেশ প্রণতির জন্য রীতিমত উদ্বেগ অনুভব করে।

অন্য বোনেরা যেমন হোক বোকামি হাবামির পর্য্যায়টা পার হয়ে সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধির স্তরে পৌঁছেচে।

ওরা কেউ সহজে বোকা বনবে না।

কিন্তু বিষম চালাক এবং উদ্যোগী কারও সভ্য সুন্দর মার্জিত মেয়ে-ধরা ফাঁদে প্রণতি স্বেচ্ছায় সানন্দে আটকে গিয়ে ঠকতে পারে—ওর বেলা ভরসা করতে সে মনে জোর পায় না।

পাঁচ

কত মানুষ আড্ডা মেরে সিনেমা দেখে গায়ে ফুঁ দিয়ে দিন কাটায়, আপিসের দায় পালনের ফাঁকে কানাই কিছুক্ষণের জন্য বেলার সঙ্গ লাভের সময় করে নেয়।

তার নিজের কত দায়।

কবে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে সেটাই দাঁড়িয়েছে চিন্তা।

এভাবে কতদিন ঠেকাতে পারবে তাও জানা নেই। সে তো জানে দায় কিভাবে সামলে চলেছে। ডুবে তলিয়ে যেতে কতদিন বাকী ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে।

কুমারের দায়টাও তার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা হয়।

এমন সকরুণ আর হাস্যকর মনে হয় ব্যাপারটা।

সেদিন সুমিত্রা এসে বলে, সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে নাকি সমরদা'? একবার যে উঁকি মারতেও যাও না?

: আমার ব্যাপারটা বুঝি তোমার জানা নেই কিছু? একেবারে সময় পাই না, করব কি।

: রেখে যাওয়া বাপের টাকার কাঁড়িটা আরও বাড়াতে খুব ব্যস্ত, না?

টাকার কাঁড়ি! কুমার সব জানে কিন্তু তার বোন বিশ্বাস করে না তাদের বড়লোকত্ব তার বাপের আমলেই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

সমরেশ একটু হেসে বলে, টাকা বাড়াবার সুযোগ পেলে কে ছাড়ে বল? তোমাদের খবর কি?

সুমিত্রা বলে, বেশ ভদ্রতা করতে শিখেছ তো? যাই হোক, মা

তোমায় একবার যেতে বলেছে। সময় নেই বললে চলবে না—জরুরী ব্যাপার।

ঃ কি ব্যাপার ?

ঃ গিয়েই শুনো।

সুমিত্রার মুখ ম্লান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ নিজের মনে নখ দিয়ে টেবিলের কাঠটা খোঁড়ে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, একটা টেব্‌ল ক্লথও জোটে না ? কী সুন্দর ছিল তোমার সেই টেব্‌ল ক্লথটা।

সমরেশ নীরবে একটু হাসে।

পাঁচ ছ' বছর আগে প্রীতি সখ করে বানিয়ে দিয়েছিল টেবিলের সেই ঢাকনিটা।

দু'একদিনের মধ্যে বোনেরা মিলে ওর চেয়েও সুন্দর ঢাকনি তার টেবিলের জন্য বানিয়ে দিতে পারে—দয়া করে সে যদি শুধু দামী কাপড় আর রঙীন সুতো এনে দেয়।

সুমিত্রা হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি। মা বলেছে, দাদা যখন বাড়ী থাকবে না তখন যেও। দাদার বিয়ের কথা কিনা। দুপুরে খেয়েই যেও আজকালের মধ্যে একদিন ?

সমরেশ হেসে বলে, কুমারকে নিয়ে এমন জরুরী ব্যাপার ? মাসীমা নিশ্চয় ওর বিয়ে দেবার জন্য পাগল হয়েছে, ও নিশ্চয় বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, মাসীমা নিশ্চয় ওকে বুঝিয়ে রাজী করানোর কথা বলতে আমায় ডেকেছে।

সুমিত্রা নীরবে ম্লান মুখে মাথা নাড়ে।

ঃ তবে কি ? একটু আভাষ দিয়ে গেলে হত না ? ভাবনা চিন্তা করে যাবার সময় পেতাম।

: আমি কিছু বলতে পারব না। গিয়ে সব শুনো! কাল যাবে, না পরশু দুপুরে খেতে যাবে বলো। ভাতটা রেঁধে রাখতে হবে তো!

: কাল পরশু কেন, আজকেই যাব। যেতে যেতে দেড়টা দুটো বেজে যাবে কিন্তু।

: তা বাজুক।

কুমারের মা তাকে ভাত দেয় না, ভেজিটেবল ঘিয়ের লুচি আর দোকান থেকে কিনে আনা রান্না করা মাংস খাওয়ায়—ঘরে রান্না ডাল তরকারী ভাজাও দেয়।

সমরেশের মনে পড়ে যায়, মার হাতে চড় খেয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসার দিন রাত্রে কুমারের মা তাকে নিরামিষ ঘিয়েরই পরোটা খাইয়েছিল।

খেতে বসে সমরেশ বলে, খেতে খেতেই বলুন মাসীমা, আমার এক-দম সময় নেই।

কুমারের মা আগের মতই আদরের সুরে বলে, ব্যাটাছেলের সময় না থাকাই সুখের কথা বাবা। রাশি রাশি কাজ করবে, রাশি রাশি পয়সা কামাবে, দিনরাত ব্যস্ত হয়ে থাকবে। তবে শরীর দিয়ে তো কাজ, শরীর ঠিক থাকলে কাজও ঠিকমত করা যায়। শরীর বিগড়ে গেলে এক ঘণ্টার কাজ দশ ঘণ্টা খেটেও করা যায় না।

সমরেশ ভাবে, সেরেছে! এমন লম্বা উপদেশমূলক ভূমিকা দিয়ে সুরু? ব্যাপার তো তবে সত্যই খুব গুরুতর।

নিরামিষ ঘিয়ে টাটকা ভাজা আরও কয়েকখানা ফুলকো লুচি তার পাতে দিয়ে কুমারের মা কিন্তু আসল প্রসঙ্গে আসে, কুমারের তুমি ছেলেবেলার বন্ধু, ভায়ের বাড়া। কুমারের কি অসুখ হয়েছে লুকোচুরি

না করে আমায় বলতেই হবে বাবা। ওর জ্ঞান বুদ্ধি কম, ঝোঁকের মাথায় চলে—ওর ওপরে ছেড়ে দিলে চলবে না। আমায় কিছু বলে না, হেসে উড়িয়ে দেয়। জানলে বুঝলে ব্যবস্থা হয়তো একটা করতে পারব। গোপন করতে পারবে না, তোমায় বলতেই হবে কুমারের অসুখটা কি?

সমরেশ একটু হতভম্ব হয়ে যায়। কুমারের অসুখ? তাকে বলতেই হবে কুমারের অসুখের খবরটা?

সমরেশ খাওয়া বন্ধ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করে। হঠাৎ কোন জবাব দিতে ভরসা পায় না।

সুমিত্রা বলে, আমিও টের পেয়েছি সমরদা'। দুঃখে কষ্টেও দাদার চিরদিন হাসিখুসী ভাব তো? আগে বেপরোয়া চালিয়ে যেত—আজকাল বেশ কষ্ট হচ্ছে জের টানতে। শোন তোমায় বলি। পরশু ছুটি ছিল তো? ছুটির দিন দাদা ঘরে থাকে না, ধাতে নেই। পরশু অনেক বেলায় বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে উঠে সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা সবাই তো ভয়ে মরি। চারটের পর দাদা যখন বিছানা ছেড়ে উঠল, মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। চা করে দিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, শরীর খারাপ হয়েছে দাদা? হাসতে পারল না। বলল কি জানো? বাঃ, বেশ তো হয়েছে চা-টা। তা' বৃটিশ মালিকদের এত ঘুষ দিয়ে চা খাই —বেশ হবে না!

সুমিত্রা কেঁদে ফেলে।

: দাদাকে তুমি বাঁচাও সমরদা'। আমাদের বাঁচাবার জন্য দাদা স্যুইসাইড করছে।

স্যুইসাইড করছে!

কথাটা কানে বাজে। ঝন্ ঝন্ করে বাজে। স্যুইসাইড করার

মানে ছিল ঝোঁকের মাথায় চটপট কোন উপায়ে মরে যাওয়ার চেষ্টা। পরণের কাপড় কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে, বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, দোতলা তিনতলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে, বিদেশী ব্লেড দিয়ে শিরা কেটে, কোন লাটকে মারার চেষ্টা করে ফাঁসি গিয়ে, কতভাবেই না স্যুইসাইড চালু হয়েছিল গত শতাব্দীর জগতে।

একটু রকমারি রোমাঞ্চ।

: কী ভাবছ সমরদা' ?

ভাবছে ?

সমরেশ চমকে ওঠে। ওদের কথা শুনতে শুনতে সে নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল নাকি !

ধাতস্থ হয়ে বিষণ্ণ এবং গম্ভীর হয়ে সমরেশ বলে, এসব কিছুই তো আমার জানা ছিল না মাসীমা। কুমারের অসুখের কথা বলছেন ? কুমার আমার কাছেও বোধ হয় সব গোপন করেছে। হয়তো কিছুই হয়নি কুমারের—সামান্য ব্যাপার।

: সামান্য ব্যাপার নয় বাবা। সামান্য ব্যাপার হলে কি এভাবে তোমায় ডেকে এনে জ্বালাতন করি ? আমি টের পেয়েছি বাবা, কঠিন কি অসুখ যেন হয়েছে কুমারের।

তবে তো মুস্কিলের কথা !

কুমারের মা বলে, ওকে না সামলালে, চিকিৎসা না করলে, ক'মাস যে আর বাঁচবে—

কুমারের মা নীরবে কাঁদে। ধপধপে ধোপদুরস্ত ধুতিটার আঁচল দিয়ে কয়েকবার চোখ মোছে।

চোখে লেগে থাকা জল আর চোখটাই ঘন ঘন চোখের জলে প্রায় ভিজে যাওয়া আঁচল দিয়ে মোছে।

আসল চোখের জল ঝরেই গিয়েছে বৃষ্টির মত।

সমরেশ বিব্রতভাবে বলে, কাঁদবেন না মাসীমা। অসুখ যদি হয়েই থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, সেরে যাবে।

: অসুখ যদি হয়েই থাকে মানে? না সমু, লুকোতে পারবে না। আমাকে বলতেই হবে ওর কি অসুখ হয়েছে। জানলে আর কিছু না পারি, সেবা শুশ্রূষাটাও তো খানিকটা ঠিকমত করতে পারব?

: আমি তো কিছুই জানি না মাসীমা?

মুখ হাঁড়ি করে মা ও মেয়ে চুপ করে থাকে।

ছেলেবেলার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু নিশ্চয়—সমরেশের চেয়ে কে এতবার এত ঘন ঘন বাড়ীতে এসে এসে বন্ধুত্ব করেছে।

সে বলে কিনা কিছুই সে জানে না বন্ধুর এমন নিদারুণ অসুখের ব্যাপার সম্পর্কে।

এ কেমন বন্ধু?

বেগতিক দেখে সমরেশ মিনিটখানেক গভীর ভাবনায় ডুবে যাবার ভান করে, পকেট থেকে আনমনে একটা বিড়ি বার করে আনমনে ধরাবার ভানও করে।

ভেবেচিন্তে জোর দিয়ে বলে, মাসীমা, ভাবছেন কেন? কুমারকে হাসপাতালে নিয়ে যাব, কাকাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনে নেব কি হয়েছে। তেমন কঠিন রোগ হলে কি কেউ গোপন করতে পারে? মিছে ভাবছেন আপনারা।

কুমারের মা যেন আকাশ থেকে নেমে বলে, ওর যে কঠিন অসুখ তুমি তা জান না বলতে চাও?

: ওর কঠিন অসুখ হয়েছে জানবার পরেও আমি কি চুপ করে থাকতাম মাসীমা?

দুজনে চুপ করে থাকে।

ফেলে ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সমরেশ।

মরিয়া হয়ে কুমারের মা বলে, ওর অসুখটা তুমি সহজে জেনে আমাদের জানাতে পার সমর।

: আমায় কিছু জানাতে হবে না। দরকার হলে কুমার নিজেই আপনাদের জানাবে।

বলে সে উঠে দাঁড়ায়।

অর্থাৎ কাল্পনিক রোগ সম্পর্কে মা ও মেয়ের আব্দার উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় বা সাধ্য তার আর নেই।

সুমিত্রা গলা চড়িয়ে প্রায় রেডিওর চড়া গানের আর্তনাদের সুরে বলে, দাদাকে বুঝিয়ে দিও সমরদা, রোগ গোপন করতে নেই—চিকিৎসা করে দাদাকে বাঁচাতে আমি মরে যেতে রাজী আছি।

কুমার যে রোগা হোয়ে গেছে দেখলেই টের পাওয়া যায়।

কিন্তু কঠিন অসুখ?

সমরেশও রোগা হয়ে গেছে।

প্রায় শুকিয়ে গেছে তার মুখের যৌবনের শ্রীটুকু।

বাপের যার বড়লোক বলে খ্যাতি থাকে, অন্যভাবে বেপরোয়া অসংযমের বাহাদুরি আর বিকৃত চড়া স্ফূর্তি ভোগ করার মজায় অপচয় না করলে স্কুল ডিঙ্গিয়ে কলেজ ডিঙ্গোবার সাধনায় খানিকটা শুষে নিলেও স্বাস্থ্য আর নব যৌবনের শ্রী তার মূলধন থাকারই কথা।

কলেজ ডিঙ্গানো স্থগিত রেখে এত বড় দায় ঘাড়ে নিয়ে সমরেশ যে

রোগা হয়ে শুকিয়ে গিয়েও স্বাস্থ্য আর যৌবনশ্রীর আমেজটুকু আজও বজায় রাখতে পেরেছে, সেটাই তার বাহাদুরি বলতে হবে।

আটটা সাড়ে আটটায় সমরেশ বাড়ী ছাড়ে—চা আর একটি রুটি খেয়ে। জরুরী দরকার হলে আরও সকালে বার হয়, কিছু হবে না জেনেও আশার তাড়নায় কোন বৃহৎ ব্যক্তির বাড়ীতে যাবে।

প্রতিদিন নিজের সঙ্গে কি লড়াইটাই তাকে যে করতে হয় জোড়াতালি দিয়ে সংক্ষেপে কাজ সারার ঝোঁকটা সামলাতে।

আসল কাজটা ঠিকমত না করার ঝোঁকটা বোধ হয় বংশগত, নিজের মারাত্মক রোগটাও জেনে শুনে হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে খানিকটা পরিস্রুত জল আর রঙীন সিরাপ খেয়ে আরাম হওয়ার অন্ধ বিশ্বাসের মত।

রাত দশটায় বাড়ী ফিরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বরফের মত ঠাণ্ডা জল দিয়ে কোন রকমে মুখ হাত ধোয়। কল বন্ধ হয় বিকালেই—দু'তিন বালতির বেশী জল জোটে না—সারাদিন পথ আর বাসের ধূলোবালি নোংরামিতে খানিকক্ষণ এবং নানা রোগের ডাষ্টবিন কারবারের পুরাণো গুদামখানার আপিসে ন' দশ ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়া ফিরে হাত পা ধোবার জল পায় এক ঘটি।

ভর্তি নয়। তিন পোয়াটেক।

মুখ হাত ধুয়ে টেবিলেব সামনে চেয়ারে একটা সিগারেট ধরায় একটু আরাম করার জন্য।

তার পড়ার জন্য কেনা হয়েছিল এই টেবিল—বই খাতা বেতন ইত্যাদির বাৎসরিক খরচের মানের সঙ্গে খাপ খাপিয়ে।

দামী টেবিলটা ঠিক আছে—চেয়ারটা একটু নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। সারাই করে লাভ নেই, বাতিল করে নতুন চেয়ার কেনাই উচিত—তবে, টেবিলে ঝুঁকে বসা যাবে আরও দু'এক বছর।

সারাদিন খেটেখুটে মাঘের শীতের রাতে বাড়ী ফিরে এক ঘটি জলে দেহমনের গ্লানি আর নোংরামি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে বাপের পুরাণো বালাপোষটা গায়ে জড়িয়ে চেয়ারে বসে সারাদিনের বরাদ্দ তিনটে সিগারেটের শেষটা ধরিয়ে কয়েক মিনিটের আরামটা ঠিকমত ভোগ করা যায় না এই চেয়ারে বসে।

হেলান দেবার উপায় নেই। স্কুল-কলেজের বৈতরণী পার করার জন্য মোটা কাঠে তৈরী হলে হয় তো ঠিক থাকত, ভেঙ্গে চুড়ে খসে ঝরে গেছে নক্সা-কাটা দামী সুদৃশ্য চেয়ারের পিছনের দিকটা।

মনের ভুলে একবার আরাম করে হেলান দিয়ে বসতে গেলেই কপালে জুটবে চিৎপটাং।

আজ ওরকম কোন আরামই হিসাবে ছিল না সমরেশের।

মাসকাবারি ব্যাপারে ভোর রাত্রি থেকে কাটা ছাগলের চেয়েও বেশী রকম ছটফট করছিল ছোট বোন সুনীতি—গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরতে না পারা উপরের স্তরের জন্তু আর নীচের স্তরের মানুষের মত।

চিকিৎসা আছে।

কয়েকটা ইনজেকসনেই সারানো যায়।

কিন্তু বেশ কিছু টাকা লাগবে।

এতগুলি মানুষের এই বিরাট সংসারের খাওয়া পরা আর মুখ খুবড়ানো কারবারটা চালিয়ে যেতে প্রাণপাত করেও কিছুতেই সে ব্যবস্থা করতে পারছে না প্রতি মাসে দু'তিন বেলা তার ছোট বোনটার কাটা ছাগলের মত ছটফট করার আধুনিকতম চিকিৎসার।

জগা পিসী অবশ্য প্রতিবারই বলে, বিয়ে দিয়ে দেনা, সেরে যাবে। আমার সারে নি ?

বিড়ি ধরিয়ে খবরের পাতায় চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে সমরেশ বলে, তোর তো আট বছরে বিয়ে হয়েছিল পিসী। মাসের কষ্টে দু'বার বিয়ে হয়েছিল নাকি তোর?

প্রীতি যাই ভাবুক আর যাই বলুক, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সমরেশ রোগা হয় নি।

তাকে কাবু করেছে চিন্তা-জ্বর।

বাড়ীতে যতই কড়াকড়ি ব্যবস্থা করে থাক, লোকসান ও ঋণের ভারে টলমল কারবার থেকে খোবল দিয়ে দিয়ে টাকা নিতে যতই তার বিশ্রী লাগুক, এটুকু জ্ঞান তার আছে যে এমনিতে যদিও বা সামলে যাবার কোন আশা থাকে, তার দেহ ভেঙ্গে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

কুমারের অজানা রোগের খবর জানবার ভূমিকা-স্বরূপ তার মা তাকে দেহ-রক্ষা সম্পর্কে যে ছাঁকা নীতিকথা শুনিয়েছিল, সেটা তার কাছে শুধু শুনবার ও বলবার ছাঁকা নীতিকথা ছিল না, অত্যন্ত বাস্তব প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল।

নিজের প্রাণটির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে তার দ্বিধা ছিল না। প্রীতি তাকে বাইরে ডিম মাংস খেতে উপদেশ দিয়েছে—প্রীতি জানে না যে গোড়ার দিকে তাই সে খেত—বাড়ীর সকলকে বাদ দিয়ে একা একা ভাল জিনিষ খেতে বিশ্রী লাগলেও খেত।

তার এত দায়, এত খাটুনি। বাড়ীর সবাই তো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। ভাল ভাল খাদ্য ওদেরও দরকার কিন্তু তার দরকারের মত জরুরী নয়।

আজকাল ওসব কিছু সে খেতেই পারে না। দোকানের মাংস দূরে

থাক, চিন্তাজ্বর তার একসঙ্গে দুটো হাফ বয়েল ডিম খাওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হরণ করেছে।

একটা ডিম খেয়ে সে আজকাল উদ্গার তোলে!

প্রীতিও এটা জানে না।

কারণ, বাড়ীতে খাওয়ার পাট একরকম সে তুলে দিয়েছে।

সকলের দুর্ভাবনা দূর করার জন্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছে, অসময়ে আমি আবোল তাবোল খেতে পারি না। দুপুর-বেলা বাইরে খেতেই হবে, রাতে খিদে পেলে বাড়ীতে এসে খাব বলে খিদে চেপে কাজ করতে পারব না। বাইরে সকাল সকাল হোটেলে খেয়ে নেব, রাত্রে আমার জন্য শুধু আধ পো দুধ আর দু'খানা টোষ্ট রাখবে—শুতে শুতে খিদে পেয়ে যায়।

প্রীতি বিশ্বাস করে নি, সংশয়ভরে বলেছে, বাইরে ছাই পাশ কি যে তুই খাস সে তোর ভগবান জানে—চেহারা যা হচ্ছে দিন দিন দেখে তো কান্না পায়।

সমরেশ তাকে বুঝিয়েছে, সেটা খাটুনির জন্য।

খাটতে হয়।

বাস্তব সমস্যা নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করা আর চেয়ারে বসে চিন্তা করা দুটোই তো খাটুনি।

কিন্তু খাটুনির চেয়ে তাকে বেশী কাবু করেছে দুশ্চিন্তা—কি করে সামলাবে, কি উপায় হবে।

দুশ্চিন্তা? সর্বক্ষণের আতঙ্কই বলা যায়!

একটি সিগারেট টানার আরাম দিনান্ত পেরিয়ে রাত দশটায় কয়েক মিনিট ভোগ করে, গরু ছাগলের খাওয়ার যোগ্য পচা গমের দামী আটার

একটি রুটি আলুর দমের একটি আলু আর পালং পেঁয়াজ বাঁধা কফির মেশাল ছেঁচকি দিয়ে খেয়ে উঠে সমরেশ নিজের হাতে তৈরী করা কড়া খানিকটা তামাক নিয়ে গাঁজা খাবার মত ছোট কল্কিটাতে সযত্নে সাজায়, একটি টিকা ধরিয়ে ভেঙ্গে টুকরো করে কল্কিতে সাজিয়ে বাপের ফেলে যাওয়া গড়গড়ার জল বদলিয়ে, নলটা একটু সামলে সুমলে নিয়ে টান দিতে সুরু করে। ধোঁয়া টেনে অন্ততঃ আধঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকার উপায় সে আবিষ্কার করেছে।

বাজারে বিক্রী মদে কে কোন মশলা দেয়, যারা দিয়ে থাকে তারা ছাড়া কেউ জানে না।

বাজারের তামাকে কি মশলা মেশানো হয় তামাক বেচার কারবারের কর্তারা ছাড়াও অন্য কেউ কেউ সেটা জানে।

একথা অবশ্য ঠিক যে জানার বোঝার কোন অর্থই হয় না যারা জানতে চায় বুঝতে চায়।

অনেকেই বিপাকে পড়ে মদ আর তামাকের নেশা থেকে রেহাই পেতে চায়। রেহাই যদি পেতে চাইবে তবে আঁকড়ে ধরেছিল কেন ইচ্ছাশক্তি ভোঁতা করে দেওয়া নেশাকে অত বেশী আগ্রহ আর আনন্দের সঙ্গে? বহুকাল মজা লুটবার পর স্বাস্থ্য বা পয়সার অসুবিধা দেখা দিলে রেহাই চাইলে চলবে কেন!

এতদিন যারা মজা জুটিয়ে এলো, তাদের বুঝি আর দরকার নেই মুনাফার?

এইসব কথাই ভাবছিল সমরেশ।

ভাবছিল মানে শক্ত কাঠের আস্ত টেবিলটার গায়ে ঠেকানো অনেক দামী হাল্কা ভাঙ্গা চেহারটায় বসে সারাদিনের বরাদ্দ তিনটে সিগারেটের শেষটা ধরিয়ে টানছিল—রাত্রের সামান্য আহারের পাট সেরে নিয়ে

নিজের তৈরী তামাক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে যথারীতি আবার পরদিন ভোর থেকে সারাদিন খাটার জন্য তৈরী হতে।

স্বনীতি তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সিগারেট ছিটকে যায়।

জলন্ত সিগারেটটা সিমেন্টের মেঝেতে পড়েছে চেয়ে দেখেই সমরেশ জীবন থেকে সিগারেট বাতিল করার সিদ্ধান্ত করে নিশ্চিন্ত হয়—তার মুখের সিগারেটটা কত চুরি চামারি করে যোগার করা সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী ওই অদাহ্য মেঝেতে পুড়ছে—সে হিসাবটা বরং কষে দেখবার চেষ্টা করবে শুধু বিড়ি টেনে খুসী থেকে।

দু'চার মিনিটের মধ্যে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে সিগারেটার স্পেশালভাবে তৈরী মেশাল দেওয়া মশলায় জলন্ত টুকরাটুকু। তা যাক। সব দায় সামলে নিশ্চিন্তমনে দামী টিনের সিগারেট যত খুসী খেয়ে যাবার অবস্থা যতদিন না হবে ততদিন শুধু যে নিজের পয়সায় বরাদ্দ তিনটে সিগারেটও খাবে না তাই নয়, কেউ অফার করলেও সিগারেট ছোঁবে না।

: এবারও সেরকম হল সু ? ওষুধ খেয়ে কোন ফল হল না ?

: ডাক্তারি চিকিৎসাটা করালে না। ভারি ওষুধ খাওয়াচ্ছ। সস্তা ওষুধে এরকম ভীষণ ব্যথা সারে ?

: খেয়েছিস সু ?

: কি খাব ? কাল থেকে বুকের যন্ত্রণায় শ্বাস ফেলতে পারছি না। কতক্ষণে তুমি ফিরবে, ততক্ষণ বাঁচব কিনা জানতাম না দাদা। চুপচাপ সব সহ্য করেছি। আর পারছি না।

সুনীতি তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত স্তব্ধ হয়ে যায়।

সমরেশ ধীরে ধীরে তার মাথা চুলকে দেয়, তাকে আদর করে বাপের প্রতিনিধির মতই স্নেহ দিয়ে ভরসা দিয়ে দায় নিয়ে।

ডাক্তারের কাছে কি ছোটা যাবে এখন বোনের এই দুঃসহ যাতনার প্রতিকারের জন্য ? বাকীতেই হয়তো আনা যাবে ওষুধটা।

কিন্তু দেহমন সাড়া দেয় না।

: একটা ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে।

নিজেই ডাক্তারি করে। অসহ্য রকম মাথা ধরলে বা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের জন্য ছটফট করলে সমরেশ একটা বড়ি খায়।

পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবশ মনে হবে দেহমন, জেনেও খায়। এখনকার যাতনা তো ঘুচে যাক।

আগামী কালের ভোঁতা নিস্তেজ কষ্টকর অবসাদের ব্যাপার বোঝা যাবে আগামী কাল।

কয়েকটা বড়ি বাড়ীতে মজুত থাকে। সুনীতিকে সে অবশ্য আস্ত বড়ি দেয় না, দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে দু'খণ্ড করে আধখানা বড়ি তাকে খাইয়ে দেয়।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে যায়। সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। ঘুমানোর জন্য ওই বড়ি খাওয়ার বদলে সে নিয়ম ভঙ্গ করে টেনে যায় আরও দুটো সিগারেট।

সিগারেট ছিল।

আজই বিকালে প্যাকেটটা কিনেছিলে। এক সঙ্গে দশটা সিগারেট কিনলেও কঠোরভাবে দিনে কেবল তিনটে টেনে নিজের নিয়ম পালন করে আসতে পেরেছে বলেই কিনেছিল।

আজ রাত্রের আয়াসটুকুর জন্য একটা খাবে, বাকী ন'টাতে চালিয়ে দেবে তিনদিন এই ছিল তার হিসাব।

কিন্তু আর তো কোন দরকার নেই ওই নিয়ম পালন করার। কাল থেকে সিগারেট ছোঁবে না—কতকাল ছোঁবে না কে জানে। কি হবে পয়সা দিয়ে কেনা সিগারেটগুলি জমিয়ে রেখে ভোরে উঠে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে?

তার চেয়ে সাধ মিটিয়ে যটা খুসী টেনে যাক—শেষ টান না হলেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা সিগারেট টানা।

সমরেশের মনেও পড়ে না যে সে পরদিন থেকে সিগারেট একেবারে বর্জন করলেও এমন কিছু মানুষ এখনো তার কারবারের আপিসে আসা-যাওয়া করে যাদের তাকে চা সিগারেট অফার করতে হয়।

দু'এক প্যাকেট সিগারেট মজুত রাখতে হয়। নিজের জন্য কেনা বলেই পরদিন থেকে আর সিগারেট খাবে না সিদ্ধান্ত করেছে বলেই, এ প্যাকেটটা ওই কাজে না লাগিয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়া ছেলেমানুষী ছাড়া কিছুই নয়।

সমরেশ ভাবে, সত্যি সে কি অমানুষ? বাপ ঠাকুর্দা কারবার দিয়ে অনেক টাকা কামিয়ে পাড়ায় বড়লোক খ্যাতি অর্জন করেছিল বলে, আজও পাড়ার লোকে তাকে বড়লোক ভেবেছে বলে, সে কি মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি?

এমনি বিগড়ে গেছে তার চেতনা যে কোনদিন ওই বাপ ঠাকুর্দার মত হতে পারবে না জেনেও খানিকটা ওদের মত হবার জন্য জীবন পণ করেছে?

সুনীতির এই প্রাণান্তকর যাতনার চিকিৎসা আছে জেনেও কিছু না করেই হাত পা গুটিয়ে বসে আছে?

তার বিছানায় বসে সুনীতি তার দেওয়া আধখানা বড়ি খেয়েছিল। ইতিমধ্যে চোখ তার ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে।

: ঘুমোবি না সু ? আমাকেও তো ঘুমোতে হবে ?

: যাই দাদা।

সুনীতি চলে যাবার পর দু'মিনিটের মধ্যে সমরেশ একটা আস্ত বড়ি গিলে ফেলে।

চিন্তা-জ্বর আর বেশী ঠেকিয়ে চলার সাধ্য তার নেই।

ছয়

নন্দিতার মার মর মর অবস্থা।

সমরেশ তাই বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, মায়ের এমন অবস্থা, পনের বিশ মিনিট বসতে বলতে সাহস পাচ্ছি না।

: ভীরু কাপুরুষ, সাহস পাবে কোথায়? আমার মা অসুখে ভুগছে, তাই জন্য তোমার কেঁচোর মত বিনয়! মা তো ভুগছে ছ' মাসের ওপর। চিকিৎসা চলছে, কারো কিছু করার নেই। আমি খানিক আগে ফিরি পরে ফিরি তাতে কি আসবে যাবে?

শুনে স্বস্তি পেয়ে গড় গড় করে সমরেশ বলে যায় তার প্রাণের কথা—এতদিন ধরে মিলে মিশে নন্দিতাকে সে ঠিক কি ভাবে সব দিক দিয়ে ভাল করে বুঝে ফেলেছে।

নন্দিতা চুপচাপ শুনে যায়, সমরেশের কথা শেষ হলে বলে, তবেই সেরেছে। সত্যি সত্যি প্রেমে পড়লে নাকি আমার? ওদিকে ঝুঁকো না, সাবধান! দু'জনকেই পচা সেকেলে প্রেমের ডোবায় ডুবে মরতে হবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। নেহাৎ যদি পাগল হয়ে গিয়েই থাক, দরজা বন্ধ কর।

সমরেশ চমকে যায়, ভড়কে যায়। তার মুখ থেকে তীব্র ধিক্কারের একটিমাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে, ছি!

: ছি বৈকি। রাত দশটায় একলা পেয়ে প্রাণের সাধটা জানানোর মধ্যে ছি ছি কিছু নেই। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রেম কিনা তোমার! পচা প্রেমের ডোবায় আমাকে জড়িয়ে সারাজীবন নাকানি চোকানি

খেতে চাও। একটা ব্যারাম দাঁড়িয়ে গেছে তোমাদের সত্যি। জানো যে সামাজিক ভাবে এক হওয়া সম্ভব নয়, দু'জনে মিলেমিশেও কিছুতেই আমরা জের টানতে পারব না—

: চুপ কর!

সমরেশ প্রাণফাটা কাতরতা পুরুষালি বজ্র-গর্জনের আর্তনাদে ফেটে পড়লেও নন্দিতা বিচলিত হয় না।

জোর গলায় বলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছাড়া মন ওঠে না জানি। মা বোন বৌ সবাই বিনা খতে চিরজীবনের জন্য ক্রীতদাসী হবে—নইলে জমবে না।

সমরেশ ধাতস্থ হয়ে বলে, আমি তোমায় জেনেছি বুঝেছি, আমায় ঠকাতে পারবে না। তুমি ভাবছ, আরও অনেকে দু'তিন বছর ভাবসাব চালাবার পর একদিন একলা পেয়ে প্রেম জানালেই তুমি সোজাসুজি দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা দাও,—এটা আমি বিশ্বাস করব! অত বোকা আমায় ভেবো না। চারটে বোকা বোন নিয়ে আমি দিন চালাই। সব ঝন্‌ঝাট আমাকে সামলাতে হয়।

: চারটে বোকা বোনের দায় নিয়ে সামলে চলে মেয়েদের আসল ব্যাপার কি বুঝেছ?

: বুঝেছি যে মেয়েরা মোটেই বোকা হাবা নয়, পচা প্রেমের ডোবার ফাঁকি তারা কেউ মানে না। মেনে নেওয়ার ভান করে নিজে বাঁচে, সন্তানকে বাঁচায়।

: ও বাবা, তুমি দেখছি অনেক কিছু বুঝে গিয়েছ। মেয়েরা প্রেমের ভান করে, পুরুষরা এটা টের পায় না?

: টের পায় বৈকি। প্রথমে না পাক, অল্পদিনেই টের পায়। কিন্তু টের পেলেই বা উপায় কি? মেয়েদের এই ভানটা মেনে নেওয়া ছাড়া

উপায় নেই বলেই পুরুষরা আবার ভানটা ধরতে না পারার ভান করে। ভান মেয়েদের একচেটিয়া নয়।

সমরেশ বুঝতে পারে না নন্দিতাকে। নন্দিতা বুঝতে পারে না সমরেশকে।

রবীন্দ্রনাথের খাঁচার পাখী বনের পাখীর মত বিপরীত বোঝাবুঝির ব্যাপার তাদের নয়—খাঁচার তো শিক ভেঙ্গে গেছে, বনের তো বুক পুড়ে গেছে।

দু'জনে একেবারে দু'ভাষায় কথা কয় না। দু'জনের একেবারে বিপরীত চেতনা নয় যে এর জগত ওর জগত একেবারে দুরকমের দুটো জগৎ হয়ে যাবে।

জগৎ তাদের একাকার হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীর ছেলে সমরেশ আর তার চেয়ে দু'এক বছরের বড় উচ্চশিক্ষিত আধুনিক চাকুরীজীবি পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে নন্দিতার জগৎ।

ঠিকভাবে না জড়িয়ে এলোমেলো ভাবে প্যাঁচ কষে কষে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে হয়েছে বিভ্রাট।

প্রেম কেন প্রয়োজন হয় মানুষের? প্রত্যেক মানুষের?

নারী পুরুষ নির্বিশেষে?

সমরেশ ভাবে! ভাবনার কূল কিনারা পায় না।

প্রাণে অবশেষে জিজ্ঞাসা জাগে, প্রেম কি? কিসের জন্য প্রেম?

কে জানত এমন অকস্মাৎ মরে যাবে ভবানীর বিরাট কিন্তু প্রায় শূন্য বাড়ীর আদরিণী মহারাণী সরমা।

আরেকদিন ঝোঁকের মাথায় সমরেশ দুপুরবেলায় হাজির হয়

ছোটমামার বাড়ীতে। তার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। বনমালীর হিসাব নিকাশ বাদ দিয়ে প্ল্যানটা কার্য্যকরী করা যায়।

মামীকে ধরে যদি হাঁসিল করা যায় প্ল্যানটা।

সরমা শুয়ে ছিল।

আজ আর সে ভদ্রতা জানিয়েই সমরেশকে ঝি রাঁধুনীর হাতে সমর্পণ করে পাশ ফিরে শোয় না।

খাটে বসিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে, কিছু খাবি ?

: খাব না মামীমা।

: কিছু খা। তুই এসে যে কিছু খেয়ে যাস সেটা আমার জেনেও সুখ, দেখেও সুখ।

খাটে লাগান একটা বোতাম টিপতেই সুন্দরী এসে দাঁড়ায়।

: ওকে খেতে দে। কাল যা যা বানাতে বলেছিলাম সব বানিয়েছিস তো ?

: সব বানিয়েছি মা।

: সবরকম কিছু কিছু সাজিয়ে এনে দে। আমার সামনে সমূ খাবে, আমি দেখব। কদ্দিন না বলেছি তোদের সমূ এলে যত রকম খাবার থাকে সব ওকে দিবি, খেতে পারুক আর না পারুক, ফেলনা যাক ?

তিন চার মিনিটের মধ্যে খাটের পাশে হাজির হয় উপরে কাঁচ বসানো ঘরোয়া ছোট টিপয় আর আনুসঙ্গিক ইস্পাতের চেয়ার।

'সাত আট রকমের খাবার আসে দামী পাত্রে সুসজ্জিত হয়ে কিন্তু দেখলেই টের পাওয়া যায় যে দু'একটি ছাড়া বাকী সব হোটেল রেঁস্তোয়া ময়রার দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে।

সরমা যেন ক্ষেপে যায়।

বলে, রামসিংকে ডাক্ তো।

রামসিং এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়ালে কথা টেনে টেনে বলে, কি রাঁধুনি সবকো নিকাল দেও বাড়ীসে।

রামসিং আরেকবার সেলাম ঠুকে বলে, বহুত আচ্ছা, হুজুর।

বালিশে আছড়ে পড়ে সরমা বলে, যা দিয়েছে তাই থেকে বেছে বেছে খা সমু।

হঠাৎ এমন রেগে উঠে নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়া এবং তার কাতর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর সমরেশকে বিহ্বল করে দেয়।

সে বলে, ছোটমামী, আমার তো খিদে নেই।

সরমা সাড়া দেয় না।

কয়েক মিনিট নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থেকে সে আছাড়ি বিছাড়ি সুরু করে। সমরেশ তাকে ডাকে, সাড়া পায় না।

দু'তিন মিনিট দ্বিধা করে বৈকি সমরেশ।

তারপর সে টেলিফোন করার চেষ্টা করে ভবানীকে।

ভবানীর নিজের বাড়ীর টেলিফোন বলেই বোধ হয়, — হঠাৎ ঝোঁকের বশে তাকে টেলিফোনে কিছু বলতে চেয়ে কানেক্‌সন পেতে দেরি হলে সরমা ভয়ানক চটে যেত বলেই বোধ হয়—ভবানী বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল যে তার বাড়ীর টেলিফোনের ডাক অন্য অনেক বাজে লোকের তাগিদ ডিঙিয়ে তার কাছে তাড়াতাড়ি পৌছবে।

ভবানী বোধ হয় জরুরী কাজে ডুবে গিয়েছিল।

তার একটু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর তার বেয়ে ভেসে আসে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, কেন বার বার বিরক্ত করছ সমু?

সমরেশের মাথার ঝিলিক দিয়ে যায় যে তার মত মামীর ডাক নামও সমু—তার মামা বিরক্ত হয়েও ওই নামেই তার মামীকে আদর ভরা শাসনের সুরে ডাকে!

ভড়কে গিয়ে সে সরল সহজ ভাষায় বলে, আমি সমরেশ কথা বলছি, আপনাকে এখ্খুনি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে বাড়ী আসতে হবে। ছোটমামী বোধ হয় মরে যাচ্ছে।

: মরে যাচ্ছে মানে ?

: অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তার পরেই পাগল হয়ে যাবার মত করছে। শীগ্গির আসুন - তাড়াতাড়ি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ চাপ।

: তুমি পালাবে না তো ?

: পালাব মানে ? আমি আছি। শীগগির আসুন, কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

বলতে বলতে হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ে যাওয়ায় অবিলম্বে তার কি করা উচিত সে বিষয়ে ভবানী টেলিফোনে বলে দিলেও সে শুনতে পায় না।

তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ, ভবানীর উপদেশ কানে না গেলেও ডাক্তার ডেকে আনার কথাটা হঠাৎ খেয়াল করেই তার হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ বিপদ ঘটায় মাথা বিগড়ে যাবার জন্য নয়। স্বাভাবিক কারণেই আগে ডাক্তার ডেকে তারপর মামাকে খবর দেওয়ার কথাটা তার খেয়ালে আসেনি।

ছেলেবেলা থেকে তার মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে এ বাড়ীতে তার কিছুই করার নেই। ছোটবড় ব্যাপারে হোক আর বিপদ আপদে হোক—যা কিছু করার এ বাড়ীর মানুষেরাই করবে।

তার কিছু করতে চাওয়া উচিত নয়।

কাছাকাছি গোটা তিনেক ডাক্তারখানা আছে। কিন্তু দুপুরবেলা ডাক্তারখানায় কি ডাক্তার থাকে?

সমরেশ নীচে নেমে সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করে, কাছাকাছি ডাক্তার আছে?

সুন্দরীরা নীচের ঘরে রেডিও শুনছিল। সরমা দরোয়ানকে ডেকে বাড়ীর সব ঝি রাঁধুনীদের সরাসরি বিদায় করার হুকুম দিলেও ওরা সবাই নিশ্চিন্ত মনে বসে জটলা পাকাচ্ছে দেখেও রামসিং শুধু উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। সে আগেই টের পেয়েছিল যে সরমা মাঝে মাঝে ওইভাবে রেগে উঠে দরোয়ানকে ডেকে ওদের তাড়িয়ে দেবার হুকুম দেয়—কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যায় হুকুম দেওয়ার কথা।

সুন্দরী বলে, পাশের বাড়ীতেই যে মস্ত নাম করা ডাক্তার। ডাক্তার কি হবে?

: মামীমা মরে যাচ্ছে।

মস্ত বড় ডাক্তার। বাইরে লটকানো নাম পড়ে সমরেশ স্বস্তি বোধ করে। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে যে কদাচিৎ এলেও অনেক বছর ধরে অনেকবার তো এসেছে ছোটমামার বাড়ী, পাশের বাড়ীতে এমন একজন নামকরা ডাক্তার থাকে এটা কোনদিন খেয়ালও করে নি!

কলিং বেলটা টিপে ধরে থাকে। রোগা লম্বা যোয়ান বয়সী একজন লোক দড়াম করে দরজা খুলে থাবড়া মেরে কলিং বেল থেকে তার হাতটা খসিয়ে দিয়ে ধমকের সুরে বলে, কি ইয়াকি হচ্ছে?

সমরেশ কিছুমাত্র ভড়কে না গিয়ে মাথা উঁচু করে আরও জোরালো ধমকের সুরে বলে, ইয়াকি নয়। ভবানীবাবুর স্ত্রী মরে যাচ্ছেন—ডাক্তার-

বাবুকে এখুনি যেতে হবে! ভবানীবাবুকে ফোন করা হয়েছে, উনি আসছেন।

মোটাসোটা গিন্নিবান্নি গোছের একজন মহিলা কোথা সামনে এসে হাজির হয়ে বলে, সরমার রোগ তো নিত্যি লেগেই আছে। খেটেখুটে এসে সবে মানুষটা একটু শুয়েছে, বিকেলে গেলে হয় না? এমন কি গুরুতর ব্যাপার হল হঠাৎ! তুমি কে হও সরমার?

সমরেশ জোর গলায় বলে, আমি ভবানীবাবুর ভাগ্নে। মামীমা মরে যাচ্ছে—ডাক্তারবাবুকে এখুনি যেতে হবে।

: ও, তাই বল।

পাশের বাড়ীর জরুরী বিপদে পাশের বাড়ীর ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যেতে এত সময় লাগে!

মিনিট দশেক পরে ঘুম ভাঙানোর জন্য ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত ডাক্তার ব্যানার্জি প্যান্টালুনের ওপর একটা হাওয়াই কোট চাপিয়ে ব্যাগ হাতে নেমে এসে বলে, চলো যাই।

সরমার জ্ঞান খানিকটা ফিরেছিল। বিছানায় ছটফট করছিল। সরমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ব্যানার্জি একটা ইনজেক্সন দেয়।

গম্ভীর বিষন্নমুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার ছটফটানি লক্ষ্য করে।

মিনিট পনের পরে সরমার ছটফটানি আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়ায় পরিণত হলে আবার তাকে পরীক্ষা করে আরেকটা ইনজেকসন দেয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সরমা যেন শান্ত হয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর সরমার নাড়ী পরীক্ষা করেই সে ধীরে সুস্থে বেরিয়ে যায়। সমরেশ ভাবে, হঠাৎ কি হল?

ছটফট করছিল, বেশ তো শান্ত হয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাশে চলতে চলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সমরেশ প্রশ্ন করে, মরে গেছে, না? কেন মরল ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার ব্যানার্জি সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়ায়, ধীর শান্ত মিষ্ট ভাষায় বলে, আমার তো তা বলার কথা নয়। আমি এসেছি চিকিৎসা করতে, যদি পারি মরণ ঠেকাতে। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, তবু দেখলাম মরে গেছেন, আমার কিছুই করার নেই! তাই চলে এলাম।

একটু থেমে ঝাঁঝের সঙ্গে আবার বলে, তোমার মামীমা কেন মরেছেন জানো? তোমার মামার বোকামির জন্য। হার্ট খারাপ ছিল, হিষ্টিরিয়ার জন্য ড্রাগ খেতেন। আমি বারণ করেছিলাম, পাশের বাড়ীর ডাক্তার কিনা, কলেজে পড়া বয়স থেকে দেখে আসছেন, আমার পরামর্শ তাই কানেও তুললেন না।

ভবানীর মোটর এসে থামে।

: কি ব্যাপার ব্যানার্জি? আজ আবার কি হল? সেই হিষ্টিরিয়ার নতুন আরেক ব্যাপার তো? তার প্রশ্ন কানে না তুলে, তার দিকে না তাকিয়ে ডাক্তার ব্যানার্জি গট গট করে এগিয়ে পাশের গেট দিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যায়।

ভবানী জিজ্ঞাসা করে, ব্যানার্জি কি বলল রে?

সমরেশ কেঁদে বলে, মামীমা মরে গেছে।

কে জানত ছোটমামীর মরার পর ছ'মাস কাটতে না কাটতে নন্দিতাকে ভবানী বিয়ে করে ঘরে আনবে!

নন্দিতা ভবানীর ঘরের বৌ হতে রাজী হবে এটাও ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

সরমা মারা যাবার মাস চারেক পরে নন্দিতা একদিন সমরেশকে বলে, তোমার ছোটমামার আপিসে একটা ভাল চাকরী খালি আছে, বাগিয়ে দিতে পার ?

: যে চাকরী করছ তাই কর, ছোটমামার আপিসে চাকরী করে কাজ নেই।

: তোমার দেখছি খুব মামাভক্তি !

: এরকম খাসা মামা হলে ভক্তি হবে না ?

নন্দিতা একটু ভেবে বলেছিল, আচ্ছা বেশ, চাকরী তোমায় বাগিয়ে দিতে হবে না, তুমি শুধু একদিন আমাকে সঙ্গে করে তোমার ছোটমামার বাড়ী নিয়ে যাবে।

সমরেশ আশ্চর্য্য হয়ে বলে, মামার বাড়ীও তুমি চেনো, মামার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও আছে—ক'বার ভোজ খেয়ে এসেছো। আমার সঙ্গে যেতে হবে কেন ?

নন্দিতা হেসে বলে, ও চেনার কোন মানে হয় ? কোন উপলক্ষে বাড়ীতে ভোজ খেতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে একমিনিটের চেনাপরিচয়ে ? তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আরেকবার পরিচয় করিয়ে দেবে—তারপর তুমি যা খুসী কোরো, যেখানে খুসী যেও।

: মামা কিন্তু আমায় তেমন পছন্দ করে না।

: তা হোক। তবু আসল সম্পর্কের ভাগ্নে তো !

সমরেশ আপশোষের সুরে বলে, বাড়ীতে মামার পাত্তা পেতে কদিন ঘুরতে হয় ছাখো। আপিসে গেলে হয় না ?

: না, বাড়ীতে গিয়েই পাত্তা পেতে হবে।

প্রথম দিনেই তারা কিন্তু ভবানীর পাত্তা পায়, সকাল সাতটার মধ্যে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়ে।

ভবানী ঘুমোচ্ছিল।

সাড়ে আটটায় তার ঘুম ভাঙ্গে।

ন'টায় সে নীচে নামে।

মোটা একটা সিগার হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে ভবানী বাইরের ঘরে তার চেয়ারে বসামাত্র সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার পরিচয় দিতে সুরু করে, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওনার নাম—

: ওকে আমি চিনি সমূ—পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না।

নন্দিতা মিষ্টি করে হেসে বলে, মনে আছে কি নেই কে জানে, ভাবলাম আপনার ভাগ্নেকে সঙ্গে করেই আসি। ওর সঙ্গে আমার অনেকদিনের চেনা-পরিচয়।

বাড়ীঘর আসবাবপত্র দাসদাসী তেমনি আছে, সরমা তার শোয়ার ঘরেই আড়াল হয়ে থাকত। মনে করলেই হয় যে সরমা যথারীতি তার ঘরে খাটে শুয়ে আছে!

অন্যের পক্ষে হয় তো সেটা সম্ভব ছিল, কিন্তু সমরেশ এ কল্পনার লেশটুকু বরদাস্ত করতে পারে না। বুদ্ধি করে ডাক্তার ডেকে আনলেও তার আশা ব্যর্থ করে তারই চোখের সামনে সরমা মরে গিয়েছিল। তার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় যে ছোটমামী ঘরেই আছে, ঘরে গিয়ে উঁকি মারলেই তাকে দেখা যাবে।

এমন উদ্ভট কথা ভাবতে গিয়েও তার দম আটকে আসে। কাজের ছুতায় তাড়াতাড়ি সে বিদায় নেয়।

নন্দিতার বাবা একেবারে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে আসার আগে সে কল্পনাও করতে পারে নি নন্দিতা আপিসের চাকরীর

সন্ধানে ছোটমামার নাগাল ধরতে গিয়ে একেবারে তার বাড়ীতে বৌগিরির চাকরী বাগিয়ে বসবে!

কুমার বলে, এরকম তো কতই হচ্ছে ভাই। এক একজন মানুষ থাকে বৌ না হলে দিন চলে না। দু'একটা আলগা আছে, বাঁধা আছে—মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে নতুন নতুন যাগায় হৈ চৈ করেও আসে—কিন্তু বাড়ীতে যেমন তেমন একটা বৌ না হলে দিন কাটে না। একটা অভ্যাস হয়ে যায় আর কি—নেশা দাঁড়িয়ে যায়।

সমরেশ বলে, আমি ছোটমামার কথা ভাবছি না। ছোটমামার বাইরে যতই ভড়ং থাক, ধাতটা যে সংসারী জমিদারের—তা আমি জানি। দরকার হলে ছোটমামা দশটা বিয়ে করবে। কিন্তু নন্দিতা রাজী হল কি বলে?

: মানুষ নিরুপায় হলে এরকম অনেক কিছু করে। সুইসাইড করার চেয়ে ভালো তো? নন্দিতারা কখনো সুইসাইড করে না। ভবানীবাবুর কত টাকা সেটাও তো দেখতে হবে।

: তাইতো ভাবছি। কিন্তু ভেবে বুঝে উঠতে পারছি না কি করে নন্দিতাও শেষে টাকার লোভে কাবু হল।

: শুধু টাকার লোভে নয়, বিপাকে পড়ে ওদের অবস্থা কাহিল দাঁড়িয়েছে জানিস না?

নেহাৎ ঘটনাচক্রে নয়, নন্দিতার চেষ্টাতেই সমরেশের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

সমরেশ অবশ্য তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে কিন্তু নন্দিতা অন্য ধাতের মেয়ে।

সাধ করে ধারে কাছে না ভিড়ুক, কোন নিমন্ত্রণ না রাখুক, নন্দিতা এসে পাকড়াও করবে এই ভয়ে অসময়ে বাড়ী ছেড়ে পালাতে সমরেশ রাজী ছিল না।

খুব ভোরে মোটর চেপে একেবারে তাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়ে নন্দিতা একদিন তাকে পাকড়াও করে।

সমরেশও কম চালাক নয়। একা তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সে নন্দিতাকে দেয় না।

সে সোরগোল তুলে দেয় যে ছোট মামার নতুন বৌ এসেছে—জাগো, জাগো, সবাই জাগো!

আদর অভ্যর্থনা জানাও ছোটমামার নতুন বৌ-কে!

বাড়ীর সকলের কাছেই সমাদর জোটে নন্দিতার, এত ভোরে তার আসবার কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়, পাঁচজনের সামনে সাধারণ ভাবে সমরেশের সঙ্গে কথাবার্তাও সে বলতে পারে অনেক কিন্তু একান্তে তার সঙ্গে আসল কথা বলার সুযোগ একেবারেই সে পায় না।

মাঝে মাঝে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই সে সমরেশের মুখের দিকে তাকায়। তার মনের ভাব বুঝতে সমরেশের কষ্ট হয় না। সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে যে বোঝাপড়ার প্রশ্নটা বাদ যাক, কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই নেই ধরে নেওয়া হোক, সাধারণভাবে তার মনের ভাব আর হিসাব-নিকাশটা জানবার জন্যও কি এতটুকু কৌতুহল নেই সমরেশের? হাল্কা সুরেও কি সে কোন মন্তব্য করবে না বন্ধু থেকে এমন আচমকা তার ছোটমামী হয়ে যাওয়া সম্পর্কে?

নন্দিতার বিদায় নেবার সময় সমরেশ নিজে থেকে বলে, চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রীতি হেসে বলে, আহা, ও যেন নিজে নিজে যেতে পারবে না! বাড়ীর গাড়ীতেই তো এসেছে।

: গাড়ীতে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

নন্দিতা হাই তোলে, গাও তোলে। বলে, না, এবার যাই। বাবাকে একবার দেখে যাব, বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

গাড়ী ছাড়তেই নন্দিতা বলে, তোমার ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না? জ্বালা হয়েছে, রাগ করেছ, তামাসা করছ, না—?

: ওসব কিছু নয়। রাগ করব কেন? জ্বালাই বা হবে কেন? তুমি হলে এখন গুরুজন, তোমার সঙ্গে তামাসা করতে পারি!

ড্রাইভার কথা শুনছিল। সমরেশকে ইশারা করে নন্দিতা আলোচনা স্থগিত রাখে।

বাপের বাড়ী পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে দেয়।

মিনিট দশেকের মধ্যে সে সমরেশকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে। তার বাবার শরীর আজ অনেকটা ভালই আছে।

: নন্দিতা প্রশ্ন করে, একবার তো জিজ্ঞাসাও করলে না কি করে অসম্ভবকে সম্ভব করলাম?

: অসম্ভব কিসের? ছোটমামা তো আবার বিয়ে করার জন্য লাফাচ্ছিল—অনেক ভাগ্যে তোমায় পেয়েছে!

নন্দিতা একটু হেসে বলে, সে অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা বলছি না, আমার নিজের দিকের কথা বলছি। একবার ভাবলেও না আমি নিজেকে কি করে রাজী করালাম?

সমরেশও হেসে বলে, ওটা বোঝা সোজা কথা—টাকার লোভ সামলাতে পার নি!

নন্দিতা মাথা নেড়ে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম—একটা কিছু

ধরে নিয়েছ, তাই চুপচাপ। না, শুধু টাকার লোভ নয়। অত সস্তা আমায় ভাবতে পারলে? টাকাটাই অবশ্য আসল কথা—কিন্তু টাকার লোভটা বড় কথা নয়। খুব শাড়ী-গয়না পরব আর মজা করব, ওসব সখ আমার কোনদিন ছিল না, এখনো নেই জানো তো?

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, তোমার তাড়া নেই তো?

সমরেশ বলে, তাড়া আছে, তবে আমাদের কথা শেষ করা যাবে না এমন তাড়া নেই।

: তা হলে হাঁটতে হাঁটতেই এগোই চল। কয়েকটা হিসাব করলাম। বই তিনটে ছাপানোর হিসাব, বাবার হিসাব, ভাইবোনদের হিসাব— ভাবলাম কি জানো? চাকরী যদি বা পাই তাও হবে দাসীগিরির সামিল, অথচ কাজের কাজ কোনটাই হবে না, কোন ইচ্ছা মিটবে না। তার চেয়ে টাকাওলা মানুষটার বৌগিরি করলে দোষ কি? একটা স্বামীর মন যুগিয়ে সামলে চলা ভারি কাজ!

: সইতে পারবে? সব হিসাব তো কষেছ, নিজের সহ্যশক্তির হিসাব কষেছ তো? আগের মামীকে ড্রাগ্‌স সম্বল করতে হয়েছিল, বিছানা নিতে হয়েছিল।

: ভড়কে দিও না! আমি কি ওরকম নরম মেয়ে?

: তা হলে তো ভালই হয়েছে। মামীর কথা ভাবলে মনটা একটু খুঁতখুঁত করে, তা ওসব কেটে যাবে।

এবার নন্দিতা একটু মুখ ভার করে বলে, কিন্তু সম্পর্ক তুলে দিলে তো চলবে না! তোমরা সবাই বাতিল করে দিলে আমি নিজের মনে জোর খুঁজে পাব কোথায়?

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলে, সম্পর্ক তুলব কিরকম? সবে তো সম্পর্ক তৈরী হল। সম্পর্কটা গড়ে উঠতে দাও! ভুলে গিয়ে মামার সামনে

তোমার সঙ্গে আগের মত ইয়ার্কি দিয়ে বসলে কি হবে জানো, মামা কানটি ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেবে। মামা ভীষণ বৌ-কন্‌সাস্—ওই ভয়েই তো যাই না। বৌ-পাগলা মানুষ, টাটকা মর্ডার্ণ বৌ পেয়েছে, মাথাটা একটু বিগড়ে আছে নিশ্চয়।

নন্দিতা সায় দিয়ে বলে, তা ঠিক বলেছ। এমন ভাব করে যেন কোনদিন বিয়ে করেনি, বৌ ছিল না, অনেক ভাগ্যে একটা বৌ পেয়ে গেছে—কে কখন কেড়ে নেয়। আগের জনের সঙ্গেও এক রকম করত ?

: করত বৈকি। মামার আদর আর পাহারার চোটেই তো হিষ্টিরিয়া জন্মে গিয়েছিল।

: এত তাড়াতাড়ি কি করে ভুলে গেলে ভাবি। মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, মাঝে মাঝে ঘেন্না করে।

সমরেশের মুখ গম্ভীর হয়ে যায় কিন্তু গলার আওয়াজ বদলায় না।

: ছাপা হোক বা না হোক, তুমি না তিনচারখানা বই লিখে শেষ করেছ ? তোমার এটুকু বিচারবুদ্ধি নেই ! আগের বৌকে মামা ভোলে নি।

: ভোলে নি ?

: না, এখনো কষ্ট হয়—কিন্তু মামার শোক দুঃখ সব মনে মনে—তুমিও কোনদিন টের পাবে না। মামার সোজা হিসাব। যে গেছে সে তো গেছেই, কেঁদে মরলে বা সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলে সে কি আর ফিরবে ? মামা মনে করে না যে আগের মামীর যায়গায় তুমি এসেছ, আগের মামীকে আদর করার সঙ্গে তোমায় আদর করার কোন সম্পর্ক আছে। তুমি নতুন পৃথক আরেকটি বৌ, তোমায় নিয়ে পাগল হবার মধ্যে আগের বৌকে ভুলে যাবার প্রশ্নই আসে না !

নন্দিতা যেন বেশ খানিকটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই বলে, তোমার সঙ্গে

কথা বলে ভালই হল মনে হচ্ছে। এ কথাগুলি জানা আমার খুব দরকার ছিল।

সমরেশ সহজভবেই বলে, মামাকে তুমি আমার চেয়েও ভালভাবে জানবে বুঝবে নিশ্চয়ই, তোমায় বললে দোষ হবে না। মামা আসলে হল আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষ। হৃদয়হীন বলা যায় না, কারণ মামার হৃদয় আছে—কিন্তু যাদের আপন মনে করতে পারবে শুধু তাদের জন্য হৃদয়টা রিজার্ভ করা। আমি একমাত্র ভাগ্নে কিন্তু আমি আপন হতে পারি নি, আমার জন্য তাই একফোঁটা দরদ নেই, মরি বাঁচি এসে যায় না। কিন্তু তুমি নিজের বৌ, আদরের চোটে তোমায় অস্থির করে দেবে, পাগল করে দেবে, তোমার আরাম বিলাস সুখের জন্য সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকবে।

খানিকক্ষণ নীরবে তারা পথ চলে। রাজপথ ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী ব্যস্ত ও কোলাহল-মুখর হয়ে উঠছে।

সমরেশ আবার বলে, যা আব্দার করবে তাই পাবে, খুসীমত যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া আর সকলের সঙ্গে বেশী মেলামেশার স্বাধীনতাটুকু ছাড়া।

নন্দিতা বলে, এও যে বিষম কথা হল !

: বৌ-গিরি করবে, মানিয়ে চলবে হিসাব করেই তো তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছ ? আরামে থাকবে ভাবছ কেন ? আজে বাজে চাকরী করা কি কম ঝন্‌ঝানের ব্যাপার !

বাড়ীর কাছাকাছি পৌছে গিয়ে নন্দিতা বলে, সময় করে মাঝে মাঝে এসো।

: আসব।

সাত

মহাসমারোহে নন্দিতার তিনখানা মোটা মোটা বই পর পর বেরিয়ে সাময়িক একটা আলগা হৈ চৈ সৃষ্টি করে বই-এর বাজারে।

বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে।

মোটা বই।

কাগজ ভাল।

ছাপা ভাল।

বাঁধাই ভাল।

মলাটে তেরঙ্গা ছবি।

দাম বে-হিসাবী রকম কম!

কয়েকটা কাগজে গা-বাঁচানো চিনি গোলা সরবতের মত প্রশংসা বার হয়। শ'দেড়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে বই উপহার যায়। বিজ্ঞাপন ছাপা হয় প্রায় সর্ব্বত্র।

তবু হু হু করে বই বিক্রী হয় না। বিয়ের তারিখে খানকয়েক বই শুধু কাটে।

নন্দিতার বদলে রেগে যায় ভবানী।

সমরেশকে ডাকিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নন্দিতাকে বলে, গোমুখ্যের দেশ, না আছে রুচি না আছে কৃষ্টি। তোমার বই এর কদর এদেশের লোক কি বুঝবে?

সমরেশ ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায়, এদেশের লোকের ভাষায় লেখা বই, এদেশের লোক যদি না নেয়—

ভবানী ব্যঙ্গ করে বলে, এদেশের ভাষাই কত বোঝে এদেশের লোক !

নন্দিতা বলে, তুমি অস্থির হ'য়ো না। হঠাৎ হু হু করে কার কটা বই কাটে ? আস্তে আস্তে নাম হবে, আস্তে আস্তে বই কাটবে, এটাই নিয়ম।

ভবানী টেবিলে চাপড় মেরে বলে, তাই যদি হবে তবে পাঁচ হাজার করে ছাপালাম কেন ? চার পাঁচশো ছাপলেই হত !

নন্দিতা বলে, আমি বলিনি তোমায় ? বার বার বললাম, পাঁচশো কি হাজার ছাপো—অত দামী কাগজ দিও না। তুমি গ্রাহ্যও করলে না।

ভবানী হঠাৎ উদার হয়ে বলে, যাক গে। তোমার লেখা বই তো, সবগুলো কপি নয় বিলিয়েই দেব।

সকলে চুপ করে থাকে।

ভবানী একটু হাসে, তুমি বই লিখেছ, আমার মান তাতে কত বেড়েছে জানো ?

সমরেশ বুঝতে পারে নন্দিতাকে ভবানী বড় বেশী মাথায় তুলে নাচাচ্ছে। তবে এখনো ভবানীর বিকৃত উগ্রতার ঝাঁঝ তার মধ্যে তেমন জ্বালাবোধ জাগায় নি—যে ঝাঁঝে ঝলসে গিয়েছিল সরমা।

মায়া বোধ করে সমরেশ।

এই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা অত্যুগ্র মোলায়েম আদর তো আরও বেশী অসহনীয় হচ্ছে নন্দিতার ?

ভবানী বেরিয়ে যাবার পর নন্দিতা বলে, চলো একটু হেঁটে আসি, দম নিয়ে আসি।

রাস্তায় নেমে বলে, ভেবেছিলাম অন্তভাবে লাগবে, ঠোক্কর বাধবে। এত বেশী মন জুগিয়ে চলছে যে তাতেই বিশ্রী লাগছে। আমি যেন কচি খুকী, একটু কড়া কথা বললেই কেঁদে ফেলব—ঠিক এমনিভাবে মন যুগিয়ে চলছে। এমন বিশ্রী লাগে!

: আদর পেয়ে বিশ্রী লাগছে ?

: লাগবে না ? প্রতিদানে চাইছে যে আমিও গলে যাব, আহ্লাদীর মত বুকে মাথা রেখে কচি খুকীর মত আদর চাইব।

: আদর সইছে না ?

: এ নাকি আদর।

খারাপ ব্যবহার নয়, আদরের চোটেই নন্দিতাকে মাঝে মাঝে দু'এক দিনের ছুটি নিতে হয়, বাপের বাড়ী বা অন্য কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসতে হয়!

তাদের বাড়ীতে এসেও একটা দিন কাটিয়ে যায়। নিজে থেকেই বলে যে সে খাবে এবং থাকবে।

প্রীতি আশ্চর্য হয়ে বলে, মামা রাজী হল ?

: রাজী হবে না ? আমি কি তোমাদের বড়লোক মামার জেলখানার কয়েদী নাকি! স্পষ্ট বলে এসেছি যখন খুসী নিজে ফিরে যাব—নিতে পর্য্যন্ত আসবে না!

: আসবে না জানা আছে।

সব জড়িয়ে ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল ? নিজের বুদ্ধির জট ছাড়িয়ে বুঝতে বড়ই কষ্ট হয়।

সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই মানুষ চিন্তার জট ছাড়াতে শিখে গেছে। জট বুঝবার বুদ্ধি গজায় নি।

যে জট সাধারণ বুদ্ধির অতীত, যে জট ছাড়াতে গেলে নিজেকে ওই জটের মধ্যে জড়িয়ে পাকিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে, সে জট বাতিল করে দিয়েছে অনায়াসে।

সমরেশ বলে, ছোট মামা কিন্তু কেঁউ কেঁউ করছে তোমার জন্য। গেলেই কত যে ইয়েটিয়ে পাবে—

: চুপ কর দিকি।

প্রীতি রুটি বেলতে বেলতে প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, চুপ করবে কেন? অন্যায় কথা বলেছে কি? তুমি চলবে ভাবের বশে, সে দায় ওকে সামলাতে হবে নাকি? ওর মামাকে ওর ওপরে তুমি বিগড়ে দিচ্ছ। তুমি খালি নিজের দিকটা দেখছ।

: এটা তুমি বানিয়ে বললে। আগেই বরং ওর ওপর মনটা খুব বিরূপ ছিল, আমি প্রশংসা করে করে অনেক শুধরে দিয়েছি।

: কারবারটা যদি চেষ্টা করে শুধরে দেওয়াতে পারতে তবে তো বুঝতাম তোমার মুরোদ!

: দেখাই যাক না কদ্দুর কি হয়।

সমরেশ নিজের মনে একটু হাসে।

সে জেনেছে যে কারবারের আর কিছুই করার নেই, ভবানীরও সাধ্য নেই আর কিছু করে। এখন কেবল নিজেকে কতটুকু বাঁচানো যায় তারই চেষ্টা করে যাওয়া।

কারবার তলিয়ে যাবেই।

তার সঙ্গে এতগুলি মানুষের বসত বাড়ীটাও না যায় এই হচ্ছে এখন সমরেশের সব চেয়ে বড় দুর্ভাবনা।

যে-কোন দিন হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর ভেঙ্গে পড়তে পারে এরকম

পুরাণো দালানের মত কারবারের ঠাটটা শুধু বজায় আছে। সমরেশকে রোজ হাজিরা দিতে হয়।

যথারীতি রাত দশটায় বাড়ী ফিরে শোনে যে নন্দিতা নাকি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবাড়ীতে ছিল।

প্রীতি তাকে খেতে দিয়ে হেসে বলে, বিকাল থেকে উসখুস করতে লাগল। কেমন যেন আনমনা ভাব। টের পেয়ে গেছে তো মামার মন-মেজাজ। সন্ধ্যার সময় আবেকবার চা করে বিস্কুট আনিয়ে দিয়েছি, খেতে খেতে বললে কি জানিস?—ও, ভুলেই গিয়েছি, উনি তো আজ সন্ধ্যাব আগে ফিরবেন বলে গেছেন! কেনরকমে চা-টা গিলে তাড়াতাড়ি একরকম পা লয়ে গেল।

সমরেশ বলে, আমার ওপর মামার মনটা বিরূপ করে দিচ্ছে, একথাটা না শোনালেই পারতে।

প্রীতি নির্ব্বিকার ভাবে বলে, কি হয়েছে তাতে। দরকার হলে খোঁচা দিয়েও কথা বলতে হয়। গরু দোয়ানো দেখেছিস কখনো? বাঁট টানতে টানতে বাছুর কিরকম ঢুঁস্ মাবে দেখেছিস্? ঢুঁস না মারলে দুধ ছাড়ে না। তোর জন্য টান ছিল জানি তো, তাই একটু উসকে দিলাম, হয়তো কিছু কবতে পারে।

আগে খেয়াল করেনি, দু'একদিনের মধ্যে সমরেশ টের পায় যে তার ছোটমামার সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সমস্ত বাড়ীটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তাদের কবল থেকে নন্দিতা তাকে বাগিয়ে নিতেও পারে, এ আতঙ্ক বাতিল হয়ে গেছে।

সেদিন নন্দিতাকে সকলে কেন এত বাড়াবাড়ি রকম সমাদর করেছিল এবার তার মানেটা সমরেশের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রাণটা জ্বালা করে অনেকক্ষণ।

এত সস্তা হিসাব তার আপনজনদের!

ভবানীকে দিয়ে কারবারটা শুধরে দেবার প্রসঙ্গে নন্দিতা সেদিন বলেছিল, দেখাই যাক না কদ্দুর কি হয়।

কথাটায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় নি। সকলেই ভেবেছিল, ওটা কথার কথা, কাজে কিছুই হবে না।

সেদিনের পর থেকেই নন্দিতার মধ্যে কেমন একটা রূপান্তর লক্ষ্য করে সমরেশ। নন্দিতা কেমন যেন হাল্কা অথচ আগের চেয়ে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

কথাবার্তায় আগে যেটুকুও বা নিজেকে ধরা দিত, এখন তাও দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছে।

: ব্যাপার কি?

: ব্যাপার গুরুতর।

: শুনতে পাই না?

: শুনে কি হবে? যথাসময়ে জানতে পারবে। তোমার মামী হয়ে আমার হয়েছে আরেক যন্ত্রণা।

সেদিন সমরেশ আর কিছু বলে না। পরদিন ভবানী নিজে থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়ে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কারবারের সব বিবরণ জেনে নেবার পর সে গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে থাকে।

পরদিন ভবানী দশটা নাগাদ তার অচল কারবারের অচল আপিসে গিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক কাগজপত্র পরীক্ষা করলে সে আরও গম্ভীর আরও চিন্তিত হয়ে ঘণ্টা দুই চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ রওনা দেয় ছোটমামার বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

সরমা মারা যাওয়ার পর সে আর একবারও দুপুরবেলা অসময়ে মামাবাড়ী যায় নি।

নন্দিতাও কি সরমার মত খাটে শুয়ে থাকবে? দাসী রাঁধুনীর হাতে সংসার ও আতিথি সৎকারের দায় ছেড়ে দিয়ে?

বাড়ীতে ঘর অনেক কিন্তু শোয়ার ঘরখানা ছাড়া সরমার অন্য ঘর প্রায় দরকার হত না, লেখার কাজের জন্য নন্দিতাকে একটি স্পেশাল ঘর দেওয়া হয়েছে।

নন্দিতা সেই ঘরে ছিল।

লেখা বা প্রুফ দেখার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে নয়—সরমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত হয়ে!

দেখে চমৎকৃত হয়ে যায় সমরেশ।

: এ দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছ? আগের মামী, মানে ওর নিজের মা. ফিরেও তাকাত না।

: বেচারার শরীরের অবস্থাটা কিরকম ছিল একবার ভাবো। ওই শরীর নিয়ে বড়ি খেয়ে খেয়ে বেঁচে থেকে মানুষ আর কিছু পারে? বেচারা নিজেকে যে ক'টা বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল তাই ঢের। দুপুরবেলা তুমি হঠাৎ?

: আগের মামীর কাছেও বেশীর ভাগ দুপুরবেলাতেই আসতাম। দেখতে এলাম তুমি কি করছ আর শুনতে এলাম কি ভাবছ।

নন্দিতা হাসে না।

: তা হলে দয়া করে বসুন। কিছু খাবেন কি? ঘরে অজস্র খাবার তৈরী হয়, ট্র্যাডিশনটা বজায় রেখেছি।

: খাব—খুব কম কিন্তু।

নন্দিতা গলা বেশী না চড়িয়েই ডাকে, বনার মা?

মাঝবয়সী বিধবা বনার মা এসে দাঁড়ায়। সুন্দরীকে তাড়িয়ে নন্দিতা নতুন লোক রেখেছে।

খাবার আসে অল্প—দোকানের টাটকা সন্দেশ আর সিঙারা। তারপর আসে চা।

বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে নন্দিতা ততক্ষণে তার লেখার টেবিলে গিয়ে বসেছে।

তাকে উপেক্ষা করেই!

টেবিলে স্তূপাকার প্রুফ।

জিজ্ঞাসা না করেই সমরেশ বুঝতে পারে নন্দিতার চার অথবা পাঁচ নম্বরের বই ছাপা হচ্ছে।

বিড়ি কিনে এনেছিল, চা-খাবার খেয়ে তারই একটা ধরিয়ে সমরেশ বলে, চিরদিনের মত সোজাসুজি কথা বোলো, মামী হয়েছ বলে প্যাঁচ ক'ষো না।

নন্দিতা হেসে বলে, প্যাঁচ একটু কষতেই হবে। সোজা কথা বলতে ভুলে গেছি।

: তবেই সেরেছে।

: কি বলব না শুনে আগে থেকে ভড়কে যাও কেন? কোন্ বিষয়ে বলব সেটা তো জানাবে আগে? কিন্তু তার আগে একটা কথা আমাকে দয়া করে বলে নাও—বিড়ি কেন?

: এটাও বলতে হয়? পয়সা বাঁচাতে!

সমরেশ বিড়ি টেনে টেনে ধোঁয়া ছাড়ে।

নন্দিতা রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু আগের চেয়ে রূপ যেন তার খুলেছে রোগা হয়ে।

আগে মুখে ছিল পড়ুয়া মেয়েদের ক্লান্তি আর ক্লিষ্টতার একটা আবরণ। সেটা কেটে গিয়ে মুখ উজ্জল হয়েছে।

সমরেশ ভেবে চিন্তে বলে, সোজাসুজিই বলি। এ ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝা আমার পক্ষে বিশেষভাবে দরকার। মামাকে দিয়ে তুমি আমার কারবার শুধরে দিতে চাইছ। সেজন্য কি মামার সঙ্গে তোমার কোন বন্দোবস্ত হচ্ছে?

তার শেষ প্রশ্ন শুনে নন্দিতা বলে, ও!

তারপর সে একটু হাসে।

: তা হলে ধরতে পেরেছ যে ব্যাপার গুরুতর? আমিও তবে সোজাসুজি বলি। ব্যাপার গুরুতর—কিন্তু তোমার দিক দিয়ে নয়। ব্যাপার গুরুতর আমার দিক দিয়ে।

সমরেশ চুপ করে থাকে।

: আমি একটা ভয়ানক ষ্টেপ নেব স্থির করেছি। তুমি পছন্দ করবে কি করবে না জানি না। ষ্টেপটা আগেই নিয়ে নিতাম—তোমার জন্য দু'চার মাস দেরী হচ্ছে।

ঘুমের ঘোরে সরমার ছেলে একটু কেঁদে উঠলে নন্দিতা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে একটু থাপড়ে আবার ঘুম পারিয়ে চেয়ারে ফিরে এসে বলে, ভাবলাম কি, হার মেনে যখন পালাবই, শেষ হিসাব কষবই, তোমার জন্য আর দু'চারটা মাস নয় সয়েই যাই।

: চলে যাবে? পালাবে?

তার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে জানিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে নন্দিতা বলে, চলে যাব মানে? পালাব মানে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কী

আরামে আছি! কী স্বাধীন সুন্দর জীবন। ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে যেতে পারি—দু'একদিন না ফিরলেই বা কি।

সমরেশ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। নন্দিতা কাছে সরে এসে নীচু গলায় বলে, আস্তে কথা বলো। বাইরে দু'একদিন কাটিয়ে আসতে দেয়, তাই বলে সারাদিন বাড়ীতে কি করি জানার জন্য স্পাই রাখা কি বাদ দিয়েছে? সত্যি হার মেনেছি—আর সইছে না। মানুষটা বাড়ীতে থাকলে তো বটেই, না থাকলেও কেমন একটা দম আটকানো অবস্থায় আছি মনে হয়। বাচ্চাটার ওপর সত্যি মায়া পড়েছে, কিন্তু মায়ার খাতিরেও টানতে পারব না।

সমরেশ চুপ করে থাকে।

দিন সাতেক পরে সকালবেলা সমরেশকে বাড়ীতে ডেকে নন্দিতার সামনে ভবানী তাকে বলে, কারবারের সঙ্গে বাড়ীটাও যেত, অনেক চেষ্টা করে বাড়ীটাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা ঠিক করেছি। কারবার ছেড়ে দাও। আমি সামলে সুমলে মিটিয়ে দেব।

: বাড়ীটা বাঁচবে মামা?

: দেব বাঁচিয়ে বাড়ীটাকে। তোর নতুন মামী জিদ ধরেছে করব কি। কোন ব্যাপারে তুই কিন্তু একটি কথা কইবি না সমু। যে যা বলুক, তুই শুধু শুনে যাবি, নেহাৎ যদি চেপে ধরে তো সাফ জানিয়ে দিবি যে মামার কাছে যাও, মামা সব জানে, আমি কিছু জানি না।

বাড়ীটা বাঁচল।

কারবারের সঙ্গে বাড়ীটাও যেত—ভবানী অনেক কলা কৌশল খাটিয়ে কারবারটা বাতিল করে দিয়ে সব দায় থেকে তাকে রেহাই পাইয়ে দিয়ে বাড়ীটা রক্ষা করল।

সমরেশকে খাতির করে বা তাদের কৃতজ্ঞতার আশায় নয়। নন্দিতাকে বশে রাখার জন্য।

সে বোধ হয় কল্পনাও করতে পারেনি যে সমরেশের ঝন্‌ঝাটটা মেটার পরেই নন্দিতা এমনভাবে বদলে যাবে, ঘরবাড়ী চাকর দাসী আরাম বিলাসের সঙ্গে তাকেও ত্যাগ করে চলে যাবে!

কোনরকম ঝগড়া ঝাঁটি না করে, কোন নালিশ না জানিয়ে, মুখে তাকে কিছু না বলে!

প্রথমটা বুঝতে পারে নি।

মাঝে মাঝে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে বাপের বাড়ী বা অন্য কোথাও দু'একদিন কাটিয়ে আসে, এটাকে সে লেখিকা মানুষের প্রকৃতিগত পাগলামি বলে জেনেছিল এবং মেনেও নিয়েছিল।

নন্দিতার বদলে অন্য কেউ হলে সন্দেহের বিষে জর্জরিত হয়ে যেত ভবানীর প্রাণ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় অনেক আগেই জীবনটা আরও বেশী অসহ্য হয়ে উঠত নন্দিতার। প্রকৃতপক্ষে, তার এই সন্দেহবায়ুর জন্যই সরমা নিজের বাড়ী ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, না জানিয়ে যেখানে সেখানে দু'একদিন কাটিয়ে এলেও নন্দিতার সম্পর্কে ভবানীর এতটুকু সন্দেহ জাগে না।

কিভাবে তার যেন বিশ্বাস জন্মে গেছে যে স্বামীর সঙ্গে ওই ধরনের ছোটলোকামি নন্দিতা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না, ওসব তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

অন্যান্যবার নন্দিতা তবু একটা শ্লিপ রেখে যেত—'একটু বেড়িয়ে আসছি, ভেবো না।' কোথায় যাচ্ছে, একদিন বা দু'দিন পরে ফিরবে, এসবও উল্লেখ করত।

এবার স্লিপও রেখে যায় নি, দাসী রাঁধুনী বা দরোয়ানকে কিছু বলেও যায় নি।

জিজ্ঞাসা করে ভবানী জানতে পারে যে সে এবার বড় দুটো স্যুটকেশ নিয়ে গেছে।

সুন্দরীকে তাড়িয়ে নন্দিতাই বনার মা কে রেখেছিল—সকলের আগে তাকে ডেকেই ভবানী জিজ্ঞাসাবাদ করে।

সরমা সংসারের কোন ঝনঝাটের ধার ধারত না। সংসার চালাবার দায়টা নন্দিতা আদায় করে নিয়েছিল।

বলেছিল, তুমি সংসার খরচ দেবে, ঝি রাঁধুনির মাইনে দেবে—ওরা আমায় মানবে কেন?

ভবানী বলেছিল, বেশ তো, তুমিই ওসব দিও। সে তো ভাল কথাই। একটা হিসেব কিন্তু রাখতে হবে তোমাকে।

তার অনুপস্থিতির সময়ের বাড়ীর খবর, সরমার খবর জানবার জন্য সুন্দরীকে ভবানী সোজাসুজি যত বাড়তি টাকা দিত—বনার মার বেলায় ওরকম খোলাখুলি ব্যবস্থা করে নি।

বনার মা মাসে দু'বার মাইনে পায়।

একবার পায় নন্দিতার কাছে।

আরেকবার পায় ভবানীর কাছে—পাঁচ-টাকা বেশী।

প্রথমবার বুঝতে পারে নি, ছুটির দিন নন্দিতা স্নান করতে গেলে তাকে ডেকে ভবানী বলেছিল, তোমার এ মাসের মাইনে।

বনার মা বলেছিল, মাইনে তো মা আমায় দিয়েছে?

ভবানী কড়া সুরে বলেছিল, আমি কি তা জানি না? বড় বোকা তুমি। মা কি নিজের টাকায় তোমায় মাইনে দিয়েছে, না, আমার টাকায় দিয়েছে? এ মাইনেটা আমি তোমায় দিলাম।

হাত পেতে টাকাগুলি নিয়ে কয়েকদিন বনার মা'র বুক কেঁপেছিল, রাতে ঘুম হয় নি।

কে জানে সে কিসের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল!

তবে কয়েকদিনেই বুঝে গিয়েছিল আসল ব্যাপারটা, ফাঁকে ফোঁকে তার কাছ থেকে ভবানীর সংসার আর নন্দিতার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করার ধরণ থেকে।

সমরেশ দুপুরবেলা এসেছিল, এ খবরটা নিজে থেকে চুপি চুপি জানাতে গিয়ে ধমক খেয়ে বনার মা চালাক হয়েছে তারপর থেকে ভবানী জিজ্ঞাসা করলে তবেই সে জবাবে খবর জানায়।

ভবানী যা জিজ্ঞাসা করে শুধু তার জবাব—বাড়তি কথা একটিও নয়।

এবারও ভবানীর প্রশ্নের জবাবেই সে জানায়, হ্যাঁ বাবা, জিজ্ঞেস করেছিলাম। কোথায় যাচ্ছ মা, কবে ফিরবে?—এমন এক ধমক দিল বাবা আমায়, একেবারে কেঁচো বনে গেলাম।

এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল ভবানীর কাছ থেকে ডবল মাইনে আর পাঁচ টাকা বেশী বখশিস পাওয়ার জন্য—কিন্তু আজ বনার মা কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না, বাড়তি কথা বলে বসে।

বলে, কদিন আগে ভাগ্নেবাবু দুপুরবেলা এসে অনেকক্ষণ গুজগাজ ফিসফাস করেছিল, আপনাকে বলি নি বাবা?

ভবানী গম্ভীর হয়ে বলেছিল, যা তুই।

এবার দিন তিনেক চুপচাপ কাটিয়ে দিয়ে ভবানী একটু চিন্তিত হয়েই নন্দিতার খোঁজ খবর নিতে হবে স্থির করে এবং এটা করতে হবে বলে ভয়ানক রেগেও যায়।

এত স্বাধীনতা দিয়েছে, একটু জানিয়েও কি যেতে পারে না কোথায় যাবে, কদিন বাদে ফিরে আসবে।

কারবার গুটিয়ে সমরেশ কয়েকদিন চুপচাপ ঘরে বসে একটানা শুধু চিন্তা করে যাচ্ছিল যে এবার কিভাবে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করবে, ভবানী আচমকা তাদের বাড়ীতে হাজির হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোর নতুনমামী কোথায় গেছে জানিস ?

সমরেশ আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আপনাকে বলে যায় নি ?

: নাঃ।

: পাটনায় ওর মাসীর কাছে গেছে।

ভবানী গভীর খেদের সঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় বলে, তোকে জানিয়েছে, আমায় কিছু বলেনি।

: চিঠি লিখবে নিশ্চয়।

: আগে জানানো উচিত ছিল।

খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে ভবানী হঠাৎ বলে, তোর আগের মামীই ভাল ছিল, না রে ?

সমরেশ থতমত খেয়ে কি বলবে ভেবে না পেয়ে দার্শনিক মন্তব্য করে বসে, দু'জন মানুষ কি একরকম হয় ?

ভবানী একটু হাসে।

সিগারেট ধরিয়ে বলে, যাকৃগে, যে বোকা হবে নিজের বোকামির ঠেলা সে নিজেই সামলাবে। যে দু'বার বিয়ে করেছে সে কি তিনবার বিয়ে করতে পারে না ? তোর তিন নম্বর নতুন মামী কিন্তু গরীবের ঘরের মুখ্যু মেয়ে হবে সমু।

ভবানী বিদায় হওয়া মাত্র সমরেশ পাটনায় নন্দিতাকে সাবধান করে চিঠি লিখে দেয়।

জবাব আসে সংক্ষিপ্ত।

তিন পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে নন্দিতা লেখে—তুমি কি পাগল

হয়েছ ? তোমার মামা এত বোকা নয় যে গরীব মুখ্যু মেয়ের দায় ঘাড়ে নেবে। আমি ছাড়া ওর আর গতি নেই !

প্রীতি মুখ বাঁকিয়ে বলে, এ সব পাগলামি করার কোন মানে হয় না।

: তুমি কেন করেছিলে ?

: আমার বেলা সত্যিকারের কারণ ছিল। দেখছিস না মামলা করার নামেই তোদের বিরামবাবু মাসে মাসে খোরপোষের টাকা পাঠাচ্ছে ? পাটনায় মাসীর বাড়ী গিয়ে ইয়ার্কি মারবে আর মামা টাকা যোগাবে—অত বোকা ছেলে তোর মামা নয়।

আট

নিজের কি ব্যারাম হয়েছে কুমার মা-বোনকেও জানায় নি। সমরেশ প্রশ্ন করেছে, কুমার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সমরেশ ভয় দেখিয়েছে, আপনজনের কাছে রোগ গোপন করার, রোগ চেপে যাওয়ার বিপদটা ভেবে দেখেছিস? আমাকে তো অন্ততঃ জানাতে পারিস!

: আমার কোন রোগ হয় নি, তোকে কি জানাব? একটা রোগের কথা বানিয়ে বলব?

: এরকম চেহারা হচ্ছে কেন তবে?

: কিরকম খাটতে হয় জানিস না?

তারপর কুমার বলেছে, একটু মুস্কিল চলছে বৈকি। সেটা রোগ ব্যারাম কিছু নয়। হজমের একটু গোলমাল চলছে। ডিসপেপসিয়া নয়, সব কিছু খেয়েই হজম করতে পারি কিন্তু খাওয়াটা কমে গেছে—যতটা উচিত সে পরিমাণে খেতে পারি না। এটাকে যদি রোগ বলিস, আমার কোন আপত্তি নেই।

সমরেশ জোর দিয়ে বলেছে, এটা রোগ বৈকি! হজম হয়না বলে ঠিকমত খেতে না পেরে রোগা হয়ে যাচ্ছিস, সেটা ব্যারাম নয়? ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খা না?

: বকিস নে। ডাক্তারের কাছে গেলেই এককাঁড়ি টাকা খরচ করিয়ে ছাড়বে—ফল হবে কচুপোড়া। যেভাবে চলতে হচ্ছে সেটা না

পাল্টাতে পারলে ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না। আমি বাড়তি কোন অনিয়ম করি না, যতদূর সম্ভব মেনে আর মানিয়ে চলি কিন্তু অবস্থাটায় দাঁড়িয়েছে অনিয়মের—উপায় কি !

: অবস্থাটা পাল্টাবার চেষ্টা কর ?

: চেষ্টা চলেছে। আমার একার তো নয়, সবার জীবনেই কম বেশী অনিয়ম।

সমরেশ কিছু বলে না কিন্তু সে টের পায় যে কথার মারপ্যাচে নিজের অসুখের কথাটা কুমার চাপা দিয়ে গেল। একটা কিছু কঠিন রোগ যে তার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

কে জানে অসুখটা শারীরিক অথবা মানসিক !

কুমারের মা শুনে বলেছে, তোমার কাছেও গোপন করে গেল ? চিরকাল এমনি ওর একগুঁয়ে স্বভাব !

নন্দিতার সম্পর্কে তার মাথা ব্যথার কারণটাও কুমার কাউকে জানতে বুঝতে দেয় না।

সমরেশের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় সব কথা, কয়েকবার তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে হেসে জবাব দেয়, সাইকলজি পড়ছি, সাইকলজি নিয়ে গবেষণা করছি, জানিস না ? তোর ছোটমামা আর নন্দিতার সাইকলজিটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

: কি লাভ হবে ?

: জানব বুঝব কেন ওরা এরকম পাগলামি করে—এটাই মস্ত লাভ হবে। তুই শুধু টাকার অঙ্কের লাভ শিখেছিস তবু তো কারবারটা চালাতে পারলি না। ওদিকে তোর মন নেই, তুই করবি কি ? তোর সাইকলজি অন্য রকম। তোর বাপ কাকা মামা দাদা ব্যবসা করে

বড়লোক হয়েছে—তুই কস্মিনকালে হতে পারবি না। এ শুধু তোর একটা ঝোঁক।

: আমার কিসে টাকা হবে ?

: তোর কিছুতেই টাকা হবে না!

: কেন হবে না ?

: বললাম তো, টাকা করার ধাত তোর নয়। আবার লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে নামলেও তুই ডুবে যাবি। তবে তোর ছোটমামা যদি দায় নেয় আর তুই চোখকাণ বুজে মামা যা বলে তাই শুনে যাস, তাহলে হয় তো হতে পারে।

সমরেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, লাখ টাকা নিয়ে আমিও কারবার ফাঁদছি, মামাও আমার কারবারের দায় নিচ্ছে!

কুমার বলে, তাই তো বলছিলাম, তোর কোনদিন টাকা হবে না—কোনরকমে চালিয়ে যাবি, এইমাত্র।

সমরেশ আরও বেশী ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কোনরকমে চালিয়ে যেতে পারলেও তো বাঁচতাম!

কুমার ভরসা দিয়ে বলে, তা তুই পারাব। কোনরকমে চালিয়ে যাবার মানে বুঝলি তো ? বড়লোকামি থেকে এই অবস্থায় নেমেছিস—বড়লোকমিগুলো ছাঁটাই করতেই যেন প্রাণ বেড়িয়ে যাচ্ছে! এ না হলে চলে না, ও না হলে চলে না,—শুধু এই দুশ্চিন্তা।

কথাটা প্রাণে লাগে সমরেশের।

সত্যই তো, কারবার চুলোয় গেছে, নন্দিতার কল্যাণে মামার চেষ্টায় কোনরকমে বাড়ীটা বেঁচে গেছে, তবু এখনো তাদের ঠাট বজায় রাখার কী অসম্ভব হাস্যকর করুণ চেষ্টা!

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে কুমার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তোর মামা কখন বাড়ী ফেরে জানিস?

সমরেশ বলে, ফিরলে সন্ধ্যা বেলায় ফেরে। বাড়ীতেই একটু ড্রিঙ্ক করে। বৌ পালিয়ে গেছে, এখন কি করে বলতে পারব না।

: কাল একটা কাজ করবি? বিকালে ফোন করে জেনে নিবি ভবানীবাবু কখন বাড়ী ফিরবেন? আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিবি।

: সকালে যাওয়াই সুবিধে—আটটার আগে মামার ঘুম ভাঙ্গে না। সকাল সকাল গিয়ে খানিকক্ষণ ধন্না দিয়ে বসে থাকতে হবে।

কুমার মাথা নাড়ে।—সকালে নয়। সারাদিন কাজকর্ম করে আসার পর মানুষটা কি অবস্থায় থাকে দেখতে চাই। সকালবেলার শান্তশিষ্ট লেজ বিশিষ্ট মানুষটা তো অতিষ্ঠ করে তোলেনি নন্দিতাকে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুমার ভবানীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায়—সঙ্গে নিয়ে যায় সমরেশকে।

বলে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে তুই কিন্তু চলে আসবি। তুই থাকলে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবে না।

: তোকে তো চেনে।

: দু'একদিন দেখেছে, ও কি আর মনে থাকে। চিনলেও হয়তো না চেনার ভাণ করবে!

ভবানী বাড়ীতেই ছিল। বসার ঘরে একলা বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিল রঙীন রসায়নের কাঁচের পাত্রে।

অনুমতি পেয়ে তারা গিয়ে বসতে না বসতে ঘরে নতুন একটি জীবের

আবির্ভাব ঘটে—সতের আঠার বছর বয়সের প্রায় নিরাভরণা অল্পদামী রঙীন ডুরে শাড়ী পরা একটি মেয়ের।

ধীরপদে ঘরে আসে। এক প্লেট আলু সেদ্ধ পাঁপড় ভাজা আর নানা রঙের ফলের কুচি ভবানীর সামনে ধরে দিয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করে, ডিম সেদ্ধ দেব না মামলেট করে দেব?

ভবানী বলে, আমায় ডিম সেদ্দই দাও—এদের দু'জনকে চা আর মামলেট দাও।

তাদের দিকে পলকের জন্য চোখ তুলে তাকিয়ে মেয়েটি ধীরপদে চলে যায়।

ওকে দেখেই সমরেশ নন্দিতার চিঠির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে।

নন্দিতা ঠিকই বুঝেছে।

গরীব মুখ্যু মেয়েকে যখন এভাবে শুধু আশ্রয় দিয়ে রাখা সম্ভব, ভবানী কখনো বোকার মত তাদের কোন একজনকে আইন সঙ্গত ভাবে বিয়ে করে ঘাড়ে নিতে চাইবে না।

কুমারের সঙ্গে সে গিয়েছে, পিছনে পিছনে গিয়েছে, বসতে বলার পর তবু তাকেই ভবানী তখন প্রশ্ন করে: সংসার চালাচ্ছিস সমু? কিভাবে চালাচ্ছিস?

: সংসার চালাচ্ছি না। সংসার এবার অচল হয়েছে।

: সংসার কখনো অচল হয় রে বোকা? তুই চালাতে পারিস কিংবা না পারিস সে হল আলাদা কথা, সংসার চলবেই।

কুমার ধীরকণ্ঠে বলে, আমায় চিনতে পারছেন?

ভবানী সোজাসুজি পরিচয় অস্বীকার করে বলে, নাঃ। তবে অনুমান করছি তুমি সমরেশের বন্ধু।

তখন বিব্রত অন্যমনস্ক সমরেশের খেয়াল হয় যে চা মামলেট খেতে

সে আজ মামাবাড়ী আসে নি, কুমারের সঙ্গে ভবানীর পরিচয় করিয়ে দিয়েই তার বিদায় হওয়ার কথা।

সে তাড়াতাড়ি বলে, এ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। নতুন মামীর সঙ্গেও ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা। বিয়ের সময় একলাটি খেটেখুটে সব সামলে দিয়েছিল—মনে নেই? বাসর ঘরে বাজী হেরে তুমি যে হঠাৎ সোণার একটা হার আনতে ফরমাস করলে, অত রাতে সোণার গয়না আনতে যেতে অন্য কেউ রাজী হল না, নতুন মামী ওকে ডেকে বলতেই তোমার চিঠি নিয়ে গিয়ে হার এনে দিল?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ওর নাম কুমার। বিয়ের পরে নন্দিতা চার-পাঁচবার ওদের বাড়ী দু'তিন দিন থেকে এসেছে।

কুমার বলে, গয়নার দোকানের লোকটা আপনাকে খুব খাতির করে টের পেয়েছিলাম। অতরাত্রে ওপর থেকে নেমে এসে চিঠি পড়ে দোকান খুলে হারটা দিল—একটি কথা কইল না।

ভবানী হেসে বলে, কথা কইবে কেন? এমনি গিয়ে হারটা কিনলে উচিত যে দাম লাগত—তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বেশী চার্জ করেছে।

কুমারও হেসে বলে, তার মানেই হল আগেও আপনি ওভাবে অর্ডার দিয়ে গয়না আনিয়েছেন। লোকটা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল যে দাম তো পাওয়া যাবেই, বাড়তি লাভটাও পাওয়া যাবে।

ভবানী এবার চুপ করে থাকে।

সমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

: ও হো ভুলেই গিয়েছি। আমার ওদিকে কত কাজ—আমি গেলাম মামা।

সমরেশ চলে যাবার পর, কুমার তার কাঁচের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে

একটু হেসে বলে, অতিথির জন্য এ জিনিষটার ব্যবস্থা বুঝি নেই? একলাই চালান?

: তোমার চলে নাকি?

: নিজের পয়সায় চলে না—বাজে জিনিষও চলে না। এরকম ভাল দামী জিনিষ কেউ অফার করলে রিফিউজ্ করব কেন?

খাদ্য সরবরাহ করেছিল পোষা মেয়েটি, কি ভেবে তাকে ভবানী পানীয় সরবরাহ করা থেকে রেহাই দেয়।

নিজেই আলমারি থেকে বোতল বার করে গ্লাসে ঢেলে অপর দিকে এগিয়ে দেয়। গ্লাসে ঢেলে নিজের জন্য আরও পানীয় তৈরী করে খাওয়ার টেবিলের চেয়ারেই আবার বসে।

কুমার তার গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে বলে, রোজ খান? বেশী হয় না এক পেগ আধ পেগ খান?

: এক আধ পেগ খাই। মাঝে মাঝে বাদও যায়। এসব নিজের বশে রেখে না খেলে কি চলে?

নিজের গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে কুমার বলে, আপনি তো প্রায় লাখপতি হয়ে গিয়েছেন। আপনাকে লাখপতি বলে মানতে চায়নি কিংবা পারে নি বলে কি নন্দিতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বনল না? আপনাকে ছেড়ে পাটনা চলে গেল?

: বনিবনার অভাব তো কিছু টের পাই নি। দিব্যি হাসিমুখেই ছিল। তোমাদের কিছু বলেছে?

: আমার সঙ্গে দেখাই হয় নি তিন চার মাস।

: ওর মাথায় ছিট আছে। কোন নালিশ থাকলে মানুষ সেটা জানাবে তো? প্রতিকার চাইবে তো? বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ পালিয়ে যায়—তোমাদের বাড়ীতেও তো তিন চার বার গিয়ে রাত

কাটিয়ে এসেছে। এবার বোধ হয় একটু বেশী রকম চড়েছে ছিটটা। একেবারে পাটনায় পাড়ি দিয়েছে।

: ঝগড়া ঝাঁটি হয় নি? কথা কাটাকাটি?

: কিছু না। ছ'জনে সিনেমায় গেলাম, খেয়ে দেয়ে ঘুমোলাম, নিজে সামনে বসে থেকে সকালে আমায় খাওয়াল, পাঁচ শো টাকার একটা বিয়ারার চেক চেয়ে নিল—

ভবানী এক চুমুকে তার গেলাসটা খালি করে দেয়। কুমারের জানা ছিল যে নেশা সে সত্যই করে না। আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে ছ'বার গেলাস খালি করে তৃতীয় বার তাকে মদ ঢেলে নিতে দেখে সে কিন্তু আশ্চর্য হয় না।

এর নাম বিকার।

এ একটা রোগ।

কুমার হাসিমুখে বলে, এবার তবে আমি বিদায় হই?

ভবানী যেন ক্ষেপে যায়। বলে, যা জানতে এসেছিলে না জেনেই বিদায় হয়ে যাবে মানে?

: যা জানতে চেয়েছিলাম জেনে গিয়েছি।

: কী জেনে গিয়েছ? শুধু জেনে গেলেই তো হয় না, কি জানলে আমাকে একটু জানাতে হবে তো! আমি যদি ভুল করে থাকি, আমার যদি দোষ হয়ে থাকে, জেনে বুঝে শুধরে নিতে রাজী আছি। খাম-খেয়ালী আলগা ভাবের কথা আমি কিন্তু বুঝি না—সোজা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে অপরাধটা কি করেছি। নইলে—

: নইলে?

: আমি কিছুতেই ওর এ ইয়ার্কি বরদাস্ত করব না—কঠিন রকম শাস্তি দেব।

: নাগালেই যদি আর না আসে, শাস্তি দেবেন কি করে? একেবারেই যদি ত্যাগ করে গিয়ে থাকে, কোন সম্পর্কই যদি আর না রাখে?

ভবানী নীরবে উঠে গিয়ে একখানা খামের চিঠি এনে অবহেলার সঙ্গে তার সামনে ফেলে দেয়।

পাটনা থেকে নন্দিতা চিঠি লিখেছে।

তার শ' পাঁচেক টাকা দরকার। ভবানী যেন পত্রপাঠ টাকাটা তার করে পাঠিয়ে দেয়।

: আপনি তাহলে জানতেন যে পাটনা গেছে?

: জানতাম বৈকি। তোমরা জান কিনা জানবার জন্য না-জানার ভাণ করেছিলাম।

কুমার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: সত্যি মানতে পারেন নিজের দোষ? নিজের দোষ গুণের বিচার করতে পারেন?

: পারি। না পারলে অনেক আগেই ডুবে যেতাম। এতগুলো কারবার চালাচ্ছি, এতলোকের সঙ্গে সামলে চলছি—নিজের দোষগুণ না জেনে বুঝে এটা পারা যায়?

কুমার একটু হেসে বলে, এটাই আপনার আসল দোষ। আপনি বড় বেশী হৃদয়হীন—বড় বেশী অহঙ্কারী। নন্দিতার হিসাব নিকাশ পর্য্যন্ত ভাবের বশে হয়—ও ভাবে খুব বুঝি বাস্তববুদ্ধি খাটালাম। আসলে ওর সব হিসাব ভাবের হিসাব। আপনার সোজা স্পষ্ট অঙ্কের হিসাবটা ওর বরদাস্ত হচ্ছিল না।

তিনবারের ঢালা পানীয়টাও ভবানী এক চুমুকে গিলে ফেলে।

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অ্যালকোহল তার পেটে যায়।

: তুমি আমার বড়ই উপকার করলে কুমার।

: কি ভাবে ?

: ওকে কিভাবে শাস্তি দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না—তুমি আমায় বুঝিয়ে দিলে। পাঁচশো টাকা চেয়েছে, কাল আমি ওকে টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে হাজার টাকা পাঠিয়ে দেব।

: ঘুষে কি কাজ হয় ?

: ঘুষ নয়। ওকে টাকা খরচ করতে শেখাব—তারপর টের পাইয়ে দেব, টাকা অত সস্তায় জোটে না।

ভবানী চতুর্থ গ্লাশে চুমুক দিয়ে হেসে বলে, আজ রাত্রেই চিঠি লিখে তুমি ওকে সতর্ক করে দেবে তো ?

: আমায় এরকম ছোটলোক ভাবলেন কেন ? আমি কেন যেচে চিঠি লিখতে যাব, আপনাদের ব্যাপারে মাথা গলাব ?

ভবানী মোটেই যেন খুশী হয় না, একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে, কেন, জানিয়ে দিলে দোষ কি ? অনেকদিনের বন্ধু, আমি ওকে শাস্তি দেবার প্ল্যান করছি, এটা ওকে জানিয়ে দেওয়াই তো তোমার কর্তব্য! তুমি ওকে সতর্ক করে দিলে ওকে শাস্তি দিতে আমার অসুবিধা হবে ভাবছ ? তোমার ওপর চটে যাব ভাবছ ? উচিত কাজটা না করলেই বরং তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ হয়ে যাবে।

কুমার শান্ত ভাবেই বলে, আমায় অত বোকা ভাববেন না, আপনার মতলব আমি বুঝেছি।

: কি বুঝেছ ?

: আপনি আমাকে দিয়ে নন্দিতাকে ভয় পাইয়ে ভড়কে দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে চান। আমি সতর্ক করে দেব, নন্দিতা ভয় পেয়ে ছুটে এসে মিটমাট করে ফেলবে—এই হল আপনার আশা। বন্ধুর কর্তব্য পালন করতে ওকে আপনার সম্পর্কে ভড়কে দিতে পারব না বলায় আপনার তাই রাগ হচ্ছে।

নয়

আনন্দ বেদনার একটা সীমা থাকে। আনন্দ বা বেদনা একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষের তা সয় না।

মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় আনন্দে। মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় বেদনায়। সরমার শোক আর নন্দিতার বিরহ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় অগত্যা উপায় নেই বলেই কি ভবানী বিয়ে করল সরমার বোন অণিমাকে ?

সরমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল নগদ বিশ হাজার, গয়না পনের হাজার। নগদ গয়না আদায়ের ব্যাপারে সে ছিল না—সব কিছু করেছিল তার বাপ।

তারপরেই হঠাৎ অবস্থা পড়ে গিয়েছিল সরমার জমিদার বাবা দেবদাসের। এখন তারা শুধু গরীব হয়েই যায় নি—দেনায় দেনায় একেবারে তলিয়ে গেছে বলা যায়।

এবার তাকেই হিসাব নিকাশ চালাতে হয়।

নগদ হয়ে যায় শূণ্য।

গয়না হয়ে যায় নামমাত্র !

সরমার গয়নাগুলি তো আছে—শ্মশানে গয়না তো পুড়িয়ে ফেলা হয়নি সরমার রক্তমাংসের দেহটার সঙ্গে।

নন্দিতাও ভাগ বসায় নি সে গয়নায়।

বিয়ে হয় বিনা সমারোহে।

ভবানী বৌ-ভাতের একটা ভোজ দেয়। আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও বাছাবাছা কয়েকজনকে শুধু বলে।

সমরেশ আর কুমারকে বোধ হয় বলে নিছক ঝোঁকের বশে। অথবা ওরা নন্দিতার প্রিয়পাত্র বলে গায়ের জ্বালার জন্যও হতে পারে। অথবা এ আশাতেও হতে পারে যে ওদের কাছ থেকে নন্দিতা বৌভাতে সমারোহের অভাব, তার গম্ভীর উদাসীন ভাব এসব বিবরণ শুনবে।

পরিবেশন বা অন্য কিছু নিয়ে মেতে থাকার উপায় নেই, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বসতে দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে, সমরেশ ও কুমার বাড়ীর সামনের বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

সেদিন আলাপ করে ভবানীর সাইকোলজি কুমার কি বুঝেছিল সমরেশ কখনো জানতে চায় নি। আজ সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, সেদিন মামার ব্যাপারটা কি বুঝলি? দু'নম্বর মামী পাটনা পালিয়ে গেল কেন?

কুমার বলে, দেখলাম যে তোর মামা বিশেষ ধাতের মানুষ— সেকেলে সংস্কারও আছে, আবার অনেক কিছু ড্যাম কেয়ার করার একেলে গোয়াতুর্মিও আছে। নন্দিতা বোধ হয় ছেলে মেয়ের মা হওয়া এড়াতে সরে গেছে, ওই রকম ব্যাপার নিয়েই সম্ভবত বড় রকম গোলমাল হয়েছে। পৌরুষ আছে পুরোমাত্রায়, পুরোমাত্রায় কেন, তার চেয়ে বেশী। কিন্তু কি যেন ব্যাপার আছে তোর মামার মধ্যে, তোর মামার জিদের সঙ্গে তোর মামাকে তাই বাতিল করে দিয়েছে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, অসুখ বিসুখ কিছু ছিল নাকি?

কুমার বলে, আমি তো কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নি! একদিন কথায় কথায় বলেছিল, ওর নাকি মা হবার কথা ভাবলেই আতঙ্ক জাগে। ব্যাপারটা শুধু মানসিক অথবা শারীরিক কোন কারণ আছে জানি না। পাটনায় একটা চিঠি লিখে তামাসা করে প্রশ্ন করেছিলাম—ভবানীবাবু কটি ছেলেমেয়ে দাবী করেছিলেন। জবাবে লিখেছিল যে শুধু একটি

ছেলে আর একটি মেয়ে—বিয়ের আগে চুক্তি হয়েছিল ছেলেমেয়ে চাইবে না। তাই তোর মামার কাছে ছুটি নিয়েছে কিছুকাল বাইরে ঘুরে মা হবার সাহস সংগ্রহ করার চেষ্টা করে আসবে।

: আমায় বলেছিল, হার মেনে পালাচ্ছে, সইল না। কোন কারণ না থাকলে মা হতে ভয় পাওয়ার কোন মানে হয়?

: মানে? এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার যুগেও অনেক মানসিক বিকারের কোন মানেই আমরা বুঝি না। বুঝি না বলে বড় বড় বুলি আওড়াই। ফ্রয়েডের উদ্ভট অদ্ভুত থিয়োরী নিয়ে কত বছর আমরা নিষ্ফল মারামারি করেছি মনে আছে তো?

বেলার ভাই সুধীর এসেছে কদিন আগে। বাজারে তার সঙ্গে দেখা হয় সমরেশের।

বাজার করা ঝকমারি উপায় দাঁড়িয়েছে—এতগুলি পোষ্য নিয়ে। একবাড়ীতে সবার রুচি আগে ছিল মোটামুটি একরকম—কোন রান্না খুব পছন্দ, কোন রান্না একরকম চলে যায়।

আজকাল রান্না খাওয়া নিয়ে বাড়ীতে ছোট বড়র মধ্যে নিত্য মন কষাকষি।

সেটা অবশ্য লোহা পেলে লোহা খেয়ে হজম করা যৌবনের একটা পরীক্ষা ও প্রমাণ। খাদ্যের নানা বৈচিত্র্য তারা দাবী করবে—শুধু পুষ্টিকর নয়—মুখরোচক খাদ্য।

সুধীরের বয়স যৌবনের কোঠা পেরোয় নি—কিন্তু মুখখানা জীর্ণ শীর্ণ, অর্দ্ধেক চুল পেকে গেছে।

: কদিন আছেন?

সুধীর বলে, আর বলেন কেন? একমাস ধরে বোন যাবেন হত্যা দিতে, ওকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার দায় চেপেছে আমার ঘাড়ে।

: হত্যা দিতে যান নাকি?

: হঁ্যা, ছেলেপুলে চাই। কেনরে বাবা, বেশ তো আছিস দুজনে। সামান্য মাইনে, জিনিষ পত্র এমন মাগ্‌গি,—তোর কি সাধ্য আছে ছেলেপুলে ভালভাবে মানুষ করার? ছেলেপিলে দিয়ে তুই করবি কি?

সমরেশ হেসে বলে, ছেলেপুলে চাওয়াটা স্বাভাবিক। আধ উপোষী চাষী লাঙল চষছে, ফেন খেয়েও তারা ছেলেপুলে চায়। শ্রমিকেরা কীইবা পায় আমাদের তুলনায়? তারাও ছেলেপিলে চায়।

কারবারের দায় থেকে রেহাই পেয়েছে নন্দিতার অনুগ্রহে।

এ বড় সহজ রেহাই পাওয়া নয়।

কাজটা করেছে ভবানী।

কিন্তু করিয়েছে নন্দিতা। তার খাতিরে প্রায় চার মাস পিছিয়ে দিয়েছে ভবানীকে ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা।

তবু সমরেশ যেন কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ করে না।

মনে হয়, নন্দিতা এ ভাবে কারবারটার দায় থেকে তাকে রেহাই দেবার দায়িত্ব না নিলেই বোধ হয় ভাল করত।

মামাকে দিয়ে হয় তো কারবারটাও বাঁচাতে পারত—অথবা নতুন কোন কারবারে নামতে পারত।

শুধু বাড়ীটা এখন তার সম্বল।

সম্বল না বিপদ কে জানে!

এত বড় বাড়ী বলেই তো এতগুলি মানুষ ভিড় করে এসে জমে আছে। ওদের খাওয়া পরা চালাবার কোন উপায় তার হাতেও নেই, জানাও নেই।

উপায় করে দেবার জন্য মামাকে যে চেপে ধরবে নন্দিতার জন্য সে উপায়ও বজায় নেই।

নন্দিতার খাতিরেই ভবানী তাকে কারবারের সঙ্গে একেবারে তলিয়ে যাবার বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তাকে ত্যাগ করে নন্দিতা দূর দেশে গিয়ে থাকলে সে এখন কোন মুখে ভবানীকে গিয়ে বলবে যে আমার বিরাট সংসার চালাবার উপায় করে দাও?

হঠাৎ একদিন ভবানী এসে হাজির হলে সমরেশের তাই বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না।

আল্‌গা আল্‌গা ভাবে বাড়ীর লোকের আদর অভ্যর্থনা শুধু স্বীকার করে নিয়ে সমরেশকে ডেকে তাদের কথা বলার জন্য তৈরী করা আড়ালে বসে ভবানী বলে, বাড়ীটা নাকি বিক্রী করতে চাইছিস?

: ভাবছি তো। এতগুলো পেটে রোজ চাল ডাল শাক পাতা কত লাগে জান মামা?

: জানি। কিন্তু বাড়ী বিক্রী করে কদিন চালাবি? আয় না থাকলে জমা টাকা খরচ হতে কদিন লাগে? মাথা গুঁজবার যায়গার জন্য ভাড়াও তো গুণতে হবে।

: তাও তো আমি ভাবছি।

: তোর নিজের বাবুগিরি বাদ দিয়ে সংসারে মাসে কত লাগে? একটু কষ্ট করে টেনেটুনে যদি চালাস?

: সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো। আমার মধ্যে তুমি বাবুগিরি করা দেখলে?

: একটুও করিস না বলেই তো। তোর বেশ দেখেই লোকে ভড়কে যাবে, তোকে কোন কন্‌ট্রাক্ট দিতে লোকে ভরসা পাবে না।

কনট্রাক্ট দিতে যারা রেকমেণ্ড করে তারাও তোর বেশ দেখে রেকমেণ্ড করতে সাহস পাবে না।

: কী করব তা'হলে ?

: আমার সঙ্গে আয়।

তাকে সঙ্গে নিয়ে ভবানী বড়বাজার এলাকায় সাহেবী পোষাকের বড় দোকানে যায়—সাহেবী এলাকার দোকানে যায় না।

সমরেশের জন্য তু'সেট ভাল সাহেবী পোষাক অর্ডার দেয়।

তাড়াতাড়ি দিতে হবে বলে বেশী মজুরি কবুল করে।

গাড়ীতে উঠে বলে, তু'টোতেই বছর কেটে যাবে। একটা ধোয়াবি, একটা পরবি। সবাই জানবে তুই খাঁটি পোষাক পরে কাজে বার হোস, তুই কাজের মানুষ- টাকা দিয়ে তুই টাকা বানাতে পারিস।

: পারবো তো ?

: নন্দিতা বুঝি বলেছে পারবি না ? নন্দিতার এই একটা ভারি বিশ্রী স্বভাব—যোয়ানদের দমিয়ে দেয়। তোরা যোয়ানরা যদি না পারিস, তবে কারা পারবে বল দিকি ?

সমরেশ হঠাৎ ছেলেমানুষ বনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নূতন মামীর চিঠি পেয়েছো মামা ?

: পেয়েছি বৈকি। আবার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। এত টাকা দিয়ে কি করে রে তোব নতুন মামী ?

: কে জানে কি করে !

যেচে এসে কেন এমন উদারভাবে আত্মীয়তা দেখানো ভবানীর ?

এতো খাপ খায় না তার প্রকৃতির সঙ্গে। সে গিয়ে কাঁদাকাটা করলেও বরং কথা ছিল, একটা মানে বোঝা যেত।

নিজে থেকে এসে ভবানী তার সংসার চালাবার উপায় করে দেবে, সে যাতে দাঁড়াতে পারে সেজন্য নিজে হাল ধরবে—এ ব্যাপার বড়ই রহস্যময় মনে হয় সমরেশের।

নন্দিতাকে খুশী করার আশায়?

তার জন্য নন্দিতার টান আছে, সে তার ভাল চায়। কারবারের বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য ভবানীর কাছে আব্দার করার মধ্যেই তার প্রমাণ ছিল।

তার জন্য কিছু করলে নন্দিতার মন নরম হবে, এই কথা কি ভেবেছে ভবানী?

কথাটা মনে লাগে না সমরেশের। অন্য অবস্থায় যদিও এটা কল্পনা করা যেত, এখনকার পরিস্থিতিতে ভবানীর এভাবে তার ভাল করে নন্দিতাকে খুশী করতে চাওয়া অদ্ভুত মনে হয়।

প্রীতি বলে, এমনিতেই মনটা নরম হয়েছে, নিজের বোনের সংসারটা ভেসে যাবে?

সমরেশ মাথা নেড়ে বললে, তেমন মন মামার নয়, এমনিতে নরম হবে।

তার সম্পর্কে ভবানীর এই নতুন রকম উদার মনোভাবের কারণটা হঠাৎ একদিন স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভবানী তাকে অনুযোগ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুই আর আমার বাড়ী যাস না কেন রে সমু?

: কি অবস্থায় আছি জান তো—

: অত ভাবছিস কেন? বললাম না আমি একটা হিল্লে করে দেব?

আমার সঙ্গেই বরং চ'—তোরা কেউ যাস না বলে কাল তোর নতুন মামী কাঁদছিল।

নতুন মামী!

নন্দিতা নয়—আরেক নতুন মামী!

সমরেশ বলে, কাঁদছিল? আচ্ছা বেশ, আমি আজকেই যাব কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না মামা।

: কেন রে?

: নতুন মামী ভাববে তুমিই ডেকেডুকে নিয়ে গেছ। আমি নিজে থেকে যেচে গেলে খুশী হবে।

: তুই তো ভারী চালাক হয়ে উঠেছিস সমু!

: এ জগতে বোকা হয়ে থেকে কোন লাভ আছে? বাবা যদি একটু কম বোকা হত তাহলে কি আর আমার এ দশা হয়!

ভবানী সস্নেহে হেসে বলে, এত আপশোষ করিস্ না। বললাম না আমি সব ঠিক করে দেব?

সেদিন দুপুর বেলা সমরেশ মরা মামী সরমার বোন নতুন মামী অনিমার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ভুবনের মা বলে, দুপুরবেলা ছাড়া বুঝি তোমার বাছা মামাবাড়ী আসার সময় হয় না!

হঠাৎ রেগে গিয়ে সমরেশ চেঁচিয়ে বলে, আমি কখন মামাবাড়ী আসব সেটা কি তোমার খুসী মত ঠিক হবে?

তাকে আসতে দেখে অনিমা কি ওৎ পেতে ছিল?

আচমকা ঘরে ঢুকে সে বলে, ভুবনের মা, তুমি আজকেই এ বাড়ী ছেড়ে বিদেয় হবে। তোমায় আমি রাখব না। এত বড় আস্পদ্ধা হয়েছে তোমার, ওনার ভাগ্নের ওপর তুমি চোপা কর!

: চোপা তো করি নি মা।

: করেছ—আমি সব শুনেছি।

ভুবনের মা কাতরভাবে বলে, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে বলছিলাম—

অণিমা ধমকের সুরে বলে, কে তোমায় ওসব ভাবনা ভাবতে বলেছে? মাইনে পাবে, রান্না করবে—আমার ঘরোয়া ব্যাপারে তোমার মাতব্বরি করার দরকার?

ভুবনের মা আর দেরী করে না, সমরেশের পা চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, আমায় ক্ষমা করেন। আমি না বুঝে কথা বলেছি।

তখন নরম হয়ে অনিমা বলে, যাক গে, এবারের মত ধরলাম না, আর যেন কোনদিন এরকম না হয়।

সরমার বিয়ে হয়েছিল তের বছর বয়সে—অণিমার বয়স উনিশ কুড়ির কম হবে না।

ভুবনের মা'র গিন্নি-পণা-মার্কা ফপরদালালিকে শাসন করে যে অপরূপ অভ্যর্থনা সে তাকে জানায় তার মধ্যেই সমরেশ প্রমাণ পায় সরমার মতই সে কিভাবে কয়েক মাসে ভবানী আব তার ঘরবাড়ী দখল করে ফেলেছে।

মোটাসোটা গড়ন। সরমার চেয়েও গোলগাল মুখ। ছোট ছোট চোখে শাণিত দৃষ্টি।

গায়ে গয়নার বড় অভাব।

তার বেশী গয়না নেই এ মিথ্যাটা বাতিল করাব জন্যই যেন শুধু গলায় পরেছে খুব দামী একটা হার আর হাতে পরেছে কয়েক গাছা চুড়ি আর হীরে বসানো এমন একটা গয়না সমরেশ যার নাম জানে না।

শেষের দিকে সরমা দোতলায় যে ঘরে দিনরাত্রির বেশীর ভাগ সময়

বিছানায় শুয়ে কাটাত তার উপরে তিন-তলায় ছোট একটা ঘরে অণিমা তাকে নিয়ে যায়।

বলে, আমি উঁচুতে থাকতে ভালবাসি, তাই এই ঘরটা বেছে নিয়েছি। তুমি এসেছ বলে কী খুশীই যে হয়েছি ভাগ্নে। দিদি খালি তোমার কথা বলত। দিদিকে বাঁচাবার জন্য তুমি কি রকম পাগলের মত ডাক্তার ডেকে এনেছিলে, তোমার মামাকে ফোন করে ডেকে এনেছিলে, সব আমি জানি।

বলতে বলতে তার গলা ধরে আসে, চোখ ছল ছল করে।

অণিমা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সমরেশ বুঝতে পারে, নিজেকে একটু সামলাতে গিয়েছে।

বুঝতে পেরে তার শ্রদ্ধাই জাগে! আট দশ বছরের বড় দিদি ছিল যে সংসারের রাণী, তার মরার ছ'মাসের মধ্যে পছন্দসই একটা মেয়েকে বিয়ে করে, মেয়েটা পাগলামি করে তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আবার তাকে বিয়ে করে এনে সেই সংসারে রাণী করে দিয়েছে একটা মানুষ—এর মানে সে যেন অ আ ক খ'র মত বোঝে।

ফিরে এসে আবার বলে, দিদির কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি।

বলে, আজ কান্না চেপে গেলাম, দিদির মরণের খবর শুনে কম কাঁদি নি কিন্তু আমি।

: কেঁদে কোন লাভ হয় না বুঝলে বুঝি তার পরে ?

: বাপ দাদা অনেক করে বুঝিয়ে দিল। তোমায় কিন্তু সর্বদা আসতে হবে। দিদির কথা ভেবেই আসতে হবে। দিদি পারে নি, জানই তো অসুখে কি রকম কাবু হয়ে পড়েছিল—আমি তোমার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করব।

: ভেবেই তুমি আমার দফা সেরেছ।

অনিমা হাসে।

হাসলে ঠিক সরমার মতই তার সমস্ত মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ে হাসিটা।

: খারাপ কিছু করব ভাবলে নাকি ভাগ্নে? ভুলে যেওনা, আমি দিদির বোন। আত্মীয়স্বজনের দিকে একদম তাকায় না মানুষটা—আমি ওকে টের পাইয়ে দেব, আত্মীয়স্বজন অত তুচ্ছ নয়। আপনজনকে বাদ দিয়ে বড়লোকামি চলে না। তোমায় যদি ও নতুন একটা কারবারে কায়েম না করে—

: নতুন একটা কারবার কায়েম করতে কত হাজার টাকা লাগে হিসাব রাখো?

: সে তোমার মামা বুঝবে।

একটা কথা খেয়াল করে এমনই আশ্চর্য হয়ে যায় সমরেশ যে বেশ খানিকক্ষণ সে আনমনা হয়ে থাকে।

তার ভাব দেখে অনিমাও কথা কয় না।

সরমা অনেক চেষ্টা করেও ভবানীকে টলাতে পারে নি, মৃত মহিমের ছেলে বা তার কারবারের জন্য বিশেষ কিছু করতে সে রাজী হয় নি। বিপাকে পড়ে বোনেরা এসে ঘাড়ে চাপতে পারে অনেকটা এই আশঙ্কায় তার ব্যবসার মাদ্রাজের ব্রাঞ্চে সমরেশের একটা ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হয়েছিল।

নন্দিতা মামী হয়ে চেষ্টা করে তাকে দিয়ে কারবারের সর্বনাশা গ্রাস থেকে অন্তত বাড়ীটা রক্ষা করে কারবার গুটিয়ে রেহাই পাবার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিল।

তারপর অনিমা মামী হয়ে এসে একেবারে পাল্টে দিয়েছে ভবানীর

মনোভাব—তার অচল অবস্থা সচল করে দেবার দায় নিতে ভবানী রাজী হয়েছে। স্বামীকে এমনিভাবেই বশ করে ফেলেছে অণিমা!

তার কোন এজেন্সীতে বেতন আর কমিশনের জোড়াতালি ব্যবস্থা নয়, স্বাধীনভাবে তার নিজের কারবার গড়ে তোলার ব্যবস্থা।

অণিমার ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

: এক মনে কি ভাবছ?

: কি ভাবছি? ভাবছি আমার জন্য তোমার এত দরদ জাগল কেন। কেউ পারে নি—তুমি কেন মামাকে আমার দায় ঘাড়ে নিতে রাজী করালে।

অণিমার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তারপরেই যেন মেঘে ঢেকে গিয়ে দু'চোখে ধারাবর্ষণ সুরু হয়।

সমরেশ বিব্রত ও আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।

নিজের মনে খানিক কেঁদে চোখ মুছে অণিমা বলে, দিদি তোমায় কত ভালবাসত, তুমি দিদিকে কত ভালবাসতে—জানি না ভেবেছ? বললাম তো, দিদির মুখে কত গল্পই যে শুনেছি তোমার। অসুখে কি রকম মনমরা হয়ে গেল, শুধু তোমার কথা বলতে গিয়ে মুখে হাসি ফুটত। কি বলত জানো? একমাত্র তোমার নাকি খাটি দরদ ছিল দিদির জন্য।

অণিমা আবার একটু কেঁদে নিয়ে আবার চোখ মুছে বলে, তোমার মামার কাছে দিদির মরার ঘটনাও শুনেছি। দিদি মরতই—কিন্তু তুমি না এলে, বুদ্ধি করে ওনাকে ফোন করে ডাক্তার না ডাকলে দিদির নাকি এমন যন্ত্রণা হত যে পাগল হয়ে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ত, নয় কাপড়ে স্পিরিট ঢেলে জ্বালিয়ে দিত—

এটা জানা ছিল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমরেশ বলে, মামীমার কি হয়েছিল আজও আমি জানি না।

: আমিও ঠিক বুঝি না। ডাক্তার ব্যানার্জি নাকি বলেছেন যে কিছুদিন হার্টের কি গোলমালের সঙ্গে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। দুটো একসঙ্গে না হলে দিদি নাকি বাঁচত।

সমরেশ কখন তার দু'নম্বর নতুন মামীর সঙ্গে কখন দেখা করতে যাবে ভবানীকে কিছুই জানায় নি। তিনটার সময় তার ভবানীর সঙ্গে দেখা করার কথা। হিসাব করে আধঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে সে মামাবাড়ী এসেছিল, মামীর সঙ্গে দশ পনের মিনিট কথা বলে বিদায় নিয়ে ভবানীর আপিসে চলে যাবে।

চারটের আগে বিদায় নেওয়া হয় না। কথায় মশগুল হয়ে থেকে দেয়াল ঘড়িতে মিষ্টি আওয়াজে তিনটে বাজতে শুনে সচেতন হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য তার বড়ই আতঙ্ক জেগেছিল। সময় সম্পর্কে ভবানী ভীষণ কড়া মানুষ। গোড়াতেই এরকম টাইম খেলাপ করার জন্য না জানি সে কিরকম রেগে যাবে!

তারপরেই সমরেশের খেয়াল হয় যে নাঃ, ভাবনার কারণ নেই। অনিমার সঙ্গে ভাব করার জন্য ভবানীই তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে। দেরী করার জন্য রেগে গেলেও নবতম মামীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার দেরী হয়েছে জানালেই ভবানীর রাগ জল হয়ে যাবে।

সে খুসীই হবে তার কৈফিয়ৎ শুনে।

চারটে বাজলে সে বলে, এবার তো আমায় উঠতে হয়।

অনিমা বলে, এসো গিয়ে। রোজ আসবে কিন্তু।

সমরেশ হেসে বলে, আমার জন্য নিজে যা করলে নিজেই তা পণ্ড

করতে চাও? এতবড় সংসার ঘাড়ে, মামা নতুন কাজে নামাচ্ছে, রোজ আসতে হলে—

অনিমা বাধা দিয়ে বলে, দিদি ঠিক কথাই বলত, বয়সের তুলনায় তুমি সত্যি ভারি ছেলেমানুষ। রোজ আসতে বলেছি বলেই রোজ আসতে হবে? ওটা তো কথার কথা। মানে এই যে তুমি এলে আমি ভারি খুশী হব।

অনিমা একটু হাসে, মাঝে মাঝে সময় করে এসো—তাতেই হবে। আমিও মাঝে মাঝে সময়ে অসময়ে তোমাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হব কিন্তু।

ভবানী সত্যই রেগে গিয়েছিল।

সমরেশ হাজিরার খবর পাঠাবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক তাকে বসিয়ে রেখে ঘরে ডেকে পাঠিয়েই সে বলে, তোকে কখন আসতে বলেছিলাম সমু? টাইমের ব্যাপারে এমন ঢিলেমি করলে—

: ঠিক টাইমেই বেরিয়েছিলাম মামা। মামীর জন্য দেরী হয়ে গেল।

ভবানীর রাগ জল হয়ে যায়। সে হাসিমুখে বলে, গিয়েছিলি নাকি? কি কথা হল?

: হাজার রকম কথা। সে সব মামীর কাছেই শুনো। আমি যা বুঝলাম আজকে, এ মামীর মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই। একটি কথাও লুকোবে না।

ভবানী আরও খুশী হয়ে বলে, তোর তবে ভালই লেগেছে মামীকে?

সমরেশ বলে, ভাল লাগবে না? আগের মামীর নিজের বোন—আগেও তো চেনাশোনা ছিল। তোমায় কিন্তু আমি একটা কথা বলছি

মামা, রাগো আর যাই কর। কোন মানুষ একলাটি থাকতে পারে না, পাগল হয়ে যায়, এটা যেন কখনো ভুলোনা।

মোটা একটা ফাইল টেনে ভবানী পাতা ওল্টায়—যেন শুনতেই পায়নি সমরেশের উপদেশমূলক মন্তব্য।

খানিক পরে মাথা তুলে বলে, ভুলব না। আমিও অনেক শিক্ষা পেয়েছি সমু।

ভবানীর প্রস্তাব শুনে সমরেশ চমৎকৃত হয়ে যায়।

ভবানী বলে, আমি ভেবে চিন্তে কি বুঝলাম জানিস? ছ্যাঁচরামির কারবার তোর দ্বারা হবে না। তোর ধাতটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। তুই বরং একটা ছাপাখানা দে, একটা মাসিক কি সাপ্তাহিক কাগজ বার কর, বই ছাপা।

: কোনদিন করিনি, কিছু জানি না—

: জানবার কি আছে? ছাপার কাজ, বিজ্ঞাপন আমি জুটিয়ে দেব। নতুন লেখক লেখিকাদের লাগসই বই ছাপিয়ে যাবি। বুঝে করতে পারলে কয়েক বছরে লাখপতি হয়ে যেতে বাধা কি?

সমরেশ খানিকক্ষণ ভাবে।

: এর পেছনে তোমার অন্য কোন মতলব নেই তো? যুদ্ধের প্রচার, মাকিন প্রচার ছাপাতে বলবে না তো?

: পাগল হয়েছিস? আমি কি এত বোকা? এদেশে যুদ্ধের প্রচার, মাকিন প্রচার চালিয়ে ব্যবসা দাঁড়ায়? বাড়াবাড়ি করতে গেলেই একটা হৈচৈ হবে, লোকে বয়কট করে দেবে। মনে আছে সেই কবে সুরু হয়েছিল—ছেড়ে দাও বঙ্গনারী, কাঁচের চুড়ি, কভু হাতে আর পরোনা? তুই তখনো জন্মাস নি। দু' দশ বছরের শিক্ষা নয়—দু' তিন পুরুষের

শিক্ষা। ব্যবসা কর আর যাই কর, বজ্জাতি করতে গেলে এ দেশের লোক আব সইবে না। ওদের ধাতটাই বদলে গেছে।

: এত চোরা কারবার চলল কি করে তবে?

: লোকের এই ধাতটাকে ভাঁওতা দিয়ে চলল। মানুষ যাদের বিশ্বাস করেছে তারাই চোরা কারবার চালাতে পেরেছে—নতুন লোকে পারে নি। আপনজন শত্রু হবে এটা বুঝতেও কিছুদিন মানুষের সময় লাগে—আপন জনকে কিছুদিন শত্রুতা করে প্রমাণ দিতে হয় যে সে শত্রু।

শেষ মুহূর্তে ভবানী বলে শ'দেড়েক টাকা মাইনে দিয়ে কুমারকে পাওয়া যাবে? দেড়শ'তে সুরু, প্রেস আর পাব্‌লিকেশন চালু হলেই দু'শো—লাভের বছর থেকে আড়াই শো। নিজের চেষ্টায় যদি লাভ বাড়াতে পারে, কমিশনও পাবে।

: আমি বললেই কুমার রাজী হবে।

: ওকে বলে রাজী কর। এত মাথার চর্চা করেও মাথা চর্চার দাম পেল না—ওকে সুযোগ দিলেই প্রাণপাত করে খাটবে। ওর মাথা খাটানো তোর কারবার দাঁড় করানোর মস্ত একটা হেল্‌প্‌ হবে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সমরেশ বলে, মামা, তুমিই তবে আমাকে দিয়ে নিজের আরেকটা কারবার ষ্টার্ট করাচ্ছ?

ভবানী হেসে বলে, সাধে কি বলি ছেলেমানুষ, গোমুখ্যু? সব লাভ যাবে তোর পকেটে, আমি যে টাকাটা লাগাব সেটা উঠে আসবে কিনা সন্দেহ, আমি নিজের আরেকটা কারবার ষ্টার্ট করছি? আমার লাগানো টাকাটা যাতে উঠে আসে এইটুকু আমি দেখব শুনব—লাভের এক পয়সা ভাগ চাইব না।

সমরেশ বলে, ভাগাভাগির একটা ব্যবস্থা রাখলেই আমি কিন্তু খুসী হতাম মামা। তোমার টাকাটা যাতে উঠে আসে, লাভও যাতে হয়,

সেদিকে তোমার নজর থাকত। তুমি যেন শুধু দায় সারছ, কিছু টাকা জলে ফেলতে হবেই জেনে আমার ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে দিচ্ছ।

ভবানী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তারপর গম্ভীরভাবে কড়া স্বরে বলে, এই মেয়েলি আহ্লাদিপণা ভাবটা তোকে শুধরে নিতে হবে—নইলে কোনদিন কিছু করতে পারবি না। এটুকু বুদ্ধিও তোর নেই যে বুঝতে পারিস, আমি যা করছি আমার নিজের হিসেবেই করছি? আমি দায় সারছি, না তোকে দয়া করছি, না মায়া করছি—ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি? একটা স্থযোগ পেয়েছিস, সেটা কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগে যাবি—আমি কেন কি করি সে ভাবনা তোর কেন!

মেয়েলি আহ্লাদিপনা? সমরেশ মাথা নীচু করে বসে থাকে। ভবানী চা আর কেক আনিয়ে দিলে তার মনে হয়, নিজের খিদে তেষ্টার ব্যাপারটা পর্যন্ত সে ভুলে থাকে, ভবানী চা কেক আনিয়ে দেবার পর খেয়াল হয়।

দশ

ভবানীর হটাৎ অনিমাকে বিয়ে করে বসার খবর সমরেশ নন্দিতাকে জানায় নি, ঝোঁকের মাথায় শুধু একটি প্রশ্ন করে একখানা কার্ড লিখেছিল, খবর জানো ?

নন্দিতাও তার নিজের নাম ছাপানো কাগজে খামের চিঠিতে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, সুখবর কি অজানা থাকে ?

তারপর আর তার কোন সড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

ছাপাখানা চালু হবার পর একদিন তার কথা ভেবে মনটা ব্যাকুল হলে সমরেশ তাকে নিজের সমস্ত বিবরণ জানিয়ে এবং তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়ে সুদীর্ঘ একখানা পত্র লেখে।

নন্দিতা জবাবে জানায় যে তিন নম্বর মামীর চেষ্টায় তার একটা গতি হয়েছে জেনে সে খুব খুসী হয়েছে, নতুন একটা বই লেখা নিয়ে নিজে সে এতদিন মশগুল হয়ে ছিল, বইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই সে কলকাতায় ফিরবে এবং বলাই বাহুল্য যে তার নতুন ছাপাখানাতে তার নতুন বইটা ছাপতে দেবে।

ছাপার পয়সা অবশ্য দেবে ভবানী।

মাসখানেক পরে একদিন সত্য সত্যই সাতখানা মোটা মোটা রুলটানা খাতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে নন্দিতা প্রেসে হাজির হয়।

তার সুন্দর স্বাস্থ্য আর হাসিখুসী ভাব দেখে সমরেশ মনে মনে থ' বনে থাকে।

নন্দিতা বলে, কাল ফিরেছি, কালকের দিনটা বিশ্রাম করলাম, গাড়ীতে মোটে ঘুম হয় নি। আজ সকালে তোমার মামাবাড়ী গিয়েছিলাম।

: মামাবাড়ী গিয়েছিলে ?

: তুমি দেখছি আশ্চর্য্য হয়ে গেলে! এতকাল পরে ফিরলাম, স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাব না ?

: সতীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

নন্দিতা হাসে।

: শুধু দেখা হওয়া ? এক বেলায় গলায় গলায় ভাব হয়েছে। বেশ চালাক চতুর কিন্তু বড্ড বেশী মেয়েলি ভাব। সেটা এক হিসাবে ভালই হয়েছে, তোমার মামার বড ভাল লেগেছে। আমি যেচে গিয়ে ভাব করেছি বলে কী খুসিই যে হয়েছে তোমার মামা!

সমরেশ যেন দিশেহারার মত প্রশ্ন করে, তোমার একটু হিংসা হল না, রাগ হল না, অপমান বোধ হল না—?

চেয়ারে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে বসে নন্দিতা বলে, তুমি বুঝবে না। আমি যেন বেঁচেছি। তোমার মামাও বেঁচেছে। আমি একেবারে জন্মের মত ত্যাগ করি নি জেনে যে কি আনন্দ ভদ্দরলোকের! ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, ওর সেকাল একাল মেশানো মেয়েলি মার্কা বৌটাকে যেচে ডেকে এনে ভাব করলাম—মামা তোমার বর্তে গেছে।

নন্দিতা পুরুষালি ভঙ্গিতে পা দুটো পর্য্যন্ত চেয়ারে তুলে আরও আরাম করে বসে।

: ওখানে নেয়ে খেয়ে ঘণ্টা খানেক ঝিমিয়ে নিয়ে তোমার এখানে চলে এলাম।

সমরেশ বলে, তুমি তবে সত্যি হার মান নি? আপোষে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ?

নন্দিতা একটু হাসে।

প্রেস চালু করা মাত্র কাজের বেশ চাপ পড়েছে। এসব বিষয়ে ভবানী ঢিল দেবার মানুষ নয়।

সমরেশকে দিয়ে ছাপাখানা চালাবে স্থির করার পর সে ছাপার কাজও যোগাড় করেছিল যথেষ্ট।

কুমার গেলি প্রুফের একটা তাড়া নিয়ে এসে সমরেশের টেবিলের সামনে অধনীস্থ কর্মচারীর মতই দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞাসা করে, এ প্রুফ কি আমরা দেখে দেব, না ওরা দেখবেন? সাত দিনের মধ্যে এটা ছাপিয়ে দিতে হবে, ভবানীবাবু ফোন করে জানিয়েছেন। ওদের প্রুফ দেখতে দিলে কিন্তু সাতদিনের মধ্যে কিছুতেই ছাপানো যাবে না।

নন্দিতা তামাসার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে, কেমন আছেন কুমারবাবু? সমরেশের প্রেসটা চালু করতে আপনিও উঠে পড়ে লেগেছেন দেখছি।

কুমার শুধু মাথা নত করে বলে, নমস্কার। ভাল আছেন? আমি এখানে চাকরী করি।

নন্দিতা খিল খিল করে হেসে উঠতে কুমার ও সমরেশ আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন ছেলেমানুষী তামাসা, দু'জন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ মানুষের শুধু চেনা-পরিচয় থাকা ভদ্রতার ভাণ করা—তাতেই আমোদ পেয়ে এমনভাবে হেসে উঠতে পারে নন্দিতা!

ভবানী অনিমাকে বিয়ে করায় সত্যই সে কি তবে খুশী হয়েছে, মুক্তির স্বাদ পেয়েছে?

অথবা হাল্কা হয়ে গেছে তার প্রকৃতি ?

হাসি থামিয়ে চারদিকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলির দিকে চেয়ে লজ্জা পেয়ে নন্দিতা নীচু গলায় বলে, অমন করে তাকিও না দু'জনে।

নন্দিতা আজকাল লজ্জাও পায়!

কুমার সমরেশের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, প্রুফ পাঠাব কি পাঠাব না? এ ব্যাপারে কিন্তু তোমাকেই ডিসিশন নিতে হবে—দায়টা তোমার।

: এতো ভারি মুস্কিলের ব্যাপার হল! যেমন কপি দিয়েছে তেমনি ছাপিয়ে দিলেও তো ওরা আবার রাগ করবে।

নন্দিতা কুমারকে বলে, এরকম ভাবুকতা নিয়ে প্রেস কেন কোন কিছু চালানো যায় না। ওদের প্রুফ পাঠিয়ে দাও, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দাও যে কাল পরশু প্রুফ ফেরত না পেলে এ হপ্তায় বই বেরোবে না, সেটা অসম্ভব।

সমরেশ মাথা নাড়ে।

: উহুঁ ওভাবে কাজ হবে না। ওরা মামার পেয়ারের লোক—কড়া কড়া কথা বললেই চটে যাবে। প্রুফগুলি দাও—আমাকেই যেতে হবে ব্যাটাদের কাছে। উপায় কি।

নন্দিতা বলে, এ বুদ্ধি বরং ভাল। অধ্যাবসায়ের পরিচয় পেয়ে মামাও খুসী হবে, ওরাও রাগ করবে না!

কুমারের হাসি দেখেই বোধ হয় সমরেশ রেগে যায়।

বলে, তুমি একটা মস্ত ভুল করছ একনম্বর নতুন মামী। আমি মামার দয়ার ভিখিরি নই। এ প্রেসের লাভ আমি নেব ভাবছ?—এ তো মামার প্রেস! কুমারের মত আমিও এখানে চাকরী করছি। মামাকে একথা বলতে গেলে ঝগড়া হত, তাই চুপ করে আছি। হিসাব মত

মাইনে আর কমিশন ছাড়া লাভের এক পয়সাও আমি নেব না, সব মামার পকেটে যাবে।

নন্দিতা এবার স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা যায়। কুমার নীরবে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালে সমরেশ তাকে ডেকে বলে, যাচ্ছিস কেন? কথাগুলি কি আমি শুধু এক নম্বর নতুন মামীকেই শোনালাম? তোকেও শুনিয়েছি।

কুমার বলে, আমায় এসব শোনানো তোমার উচিত নয়, আমার কাছে কিছু শুনতে চাওয়া আরও বেশী উচিত নয়। আমি এখানে মাইনে করা চাকর।

: মামার চাকর—আমার সহকর্মী।

নন্দিতা বলে, তোমার কথার আসল ভাবটা ধরতে পারছি না একদম। এটা রাগ না অভিমান? না, আমায় খোঁচা দিচ্ছ? তোমার মামার অনেকদিন আগেই তোমার একটা গতি করে দেওয়া উচিত ছিল। অপারগ তো নয়—তোমায় একটা প্রেস করে দেওয়া ওর কাছে ছেলেখেলা। উচিত কাজটা এতদিনে করেছে। একে দয়া করা বলে না, এর নাম দায় পালন করা, কর্তব্য করা। প্রেসটার মালিক হতে তোমার আপত্তি কিসের?

সমরেশ বলে, এরকম মামার দান নেব না, নেওয়া উচিত নয়—এই আপত্তি। দশ বছর মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, বাবা মরবার পর মা আমাকে পাঠালে নেহাৎ মামীর খাতিরে এলোমেলো একটা ব্যবস্থা করবে বলেছিল—মাকে কত ধমক দিয়েছিল তুমি শোন নি। এক মামীর খাতিরে ওইটুকু করতে রাজী হল। আরেক মামীর খাতিরে শুধু কারবারের গণ্ডগোলে জড়িয়ে জেলে যাওয়া সামলে দিল। এবারে তিন নম্বর নতুন মামীর খাতিরে একটা প্রেস করে দিল।

ক্রমে ক্রমে গলা চড়ছিল সমরেশের, শেষের দিকে সে প্রায় চীৎকার সুরু করেছিল।

প্রেস স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাজ বন্ধ করে তার কথা শুনছে।

আরও জোরে চীৎকার করে সমরেশ বলে, কেন, বড় কোন ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিতে পারত না মামা? ছেলেমানুষি একটা ছাপাখানা করে দিয়ে সব দিক সামলাচ্ছে। বাবার তিনশ' টাকা চুরি করে পালিয়ে মামা বড় হয়েছে—আমায় ব্যবসায়ে নামার সুযোগ দিলে মামার চেয়ে বড় হতে পারব না কে বলেছে?

নন্দিতা এবং কুমার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

নন্দিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, মামা তোমার ভালই করেছে। তোমার মত ভাবুক ছেলেকে খোলাবাজারে ব্যবসায়ে নামাবার দায় নিলে তুমি নিজেও ডুবতে, মামাকেও ডোবাতে। প্রেসটা চালিয়ে কের্দ্দানি দেখাও না? তারপর নয় বড়বাজারে মাড়োয়ারী আর সায়েবদের সঙ্গে কম্পিটিশন চালাতে যাবে?

কুমার বলে, মেয়েরাও তোর চেয়ে ভাল হিসাব নিকাষ করতে পারে সমু।

সমর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: আমি সাতদিন বাড়ী থেকে ঘর থেকে বেরোব না।

নন্দিতা প্রায় ধমকের সুরে বলে, ওসব প্রক্রিয়ায় আজকের দিনে কাজ হয় না সমরেশ। ওসব যোগাভ্যাসের দিনকাল পার হয়ে গেছে। সাতদিন ঘরের কোণায় ভয় ভাবনা চিন্তা ধ্যান ধারনা চালিয়েই মর্ম কথাটা ধরতে পারবে—এরকম ধারণাই তোমায় ভাবপ্রবনতায় চরম প্রমাণ। তার চেয়ে সাতদিনের ছুটি নাও, এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে দেখে এসো—কাজ হবে।

সমরেশ ধাতস্থ হয়ে হাঁকে, মহাদেব!

হাফ প্যাণ্ট হাফ সার্ট পরা সতের আঠার বছরের ছেলেটা এসে সেলাম ঠুকে বলে, জী?

সহরতলীর কোন এক পাটের কলে কাজ করে তার বাপের এক সহোদর ভাই—শুধু এইটুকু ভরসা করে মহাদেব সহরে এসেছিল।

তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে প্রেসের ছুটকো কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল ভবানী।

একটা পয়সা ময়লা ধুতিটার খুঁটে ছিল না মহাদেবের। একটা পয়সা দু'চার দিনের মধ্যে পাওয়ার আশা ছিল না কারও।

তবু সে দশ টাকায় প্রেসের দারোয়ানগিরি আর বয়গিরি করতে রাজী হয় নি—এত ছোট নতুন প্রেস। পনের টাকার জন্য জিদ ধরে আদায় করেছিল।

সমরেশ হুকুম দেয়, চা ঔর চপ্‌ লে আও।

মহাদেব সবিনয়ে বলে, দোকানদার বল্‌ দিয়া সিলিপ্‌সে ঔর মাল নাহি দেগা হুজুর।

ড্রয়ার খুলে দশ্‌টাকার একটা নোট বার করে মহাদেবের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সমরেশ গর্জন করে ওঠে, হাম সিলিপ্‌সে আননে বোলা হায় তুমকো বজ্জাত হারামজাদা?

মহাদেব নোটটা লুপে নিয়ে বলে, মাপ কীজিয়ে হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ্য হুকুম তামিল করে চা-বিস্কুট আনতে চলে যায় না। গম্ভীর মুখে জানায় যে বিশ পঁচিশ টাকা বাকী পড়ে আছে বলেই যে দোকানী সমরেশের মত মহারাজ ব্যক্তিকে আর এক পয়সা ধার দিতে রাজী না হয়ে তার চাকরকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে, সে দোকান থেকে আর কোনদিন সে কিছু আনতে যাবে না।

কাছেই আরেকটা নতুন দোকান খুলেছে। ওই দোকান থেকে সব কিছু সে এনে দেবে।

মহাদেব হাসিমুখে বলে, বাবুজী, হামি লোক তো তিন মাহিনাকা উপর কাম করতা। খানা মিলা ঔর দুটো প্যাণ্ট মিলা, একঠো জামা মিলা। বেতন নাই মিলেগা বাবুজী?

সমরেশ গর্জন করে ওঠে, যা আনতে দিলাম সেটা আগে নিয়ে আয় তো হারামজাদা। মাইনের কথা পরে হবে।

দশটাকার নোটটা নিয়ে সেই যে মহাদেব চা-বিস্কুট আনতে যায়, আর ফিরে আসে না।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করে প্রেসের একজন কম্পোজিটরকে দিয়ে চা আর বিস্কুটের বদলে চা আর সন্দেশ আনিয়ে দিয়ে সমরেশ এমনভাবে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে যে নন্দিতা বা কুমারেশ মুখ খুলতেও মায়া বোধ করে।

তারা সন্দেশ খায়।

ঠাণ্ডা চাও খায়।

সমরেশ ধাতস্থ হবে এই আশাতে খায়।

সমরেশ হঠাৎ একটু হাসে, বলে, তোমাদের খুলেই বলি। এটা পলিসির ব্যাপার—আমার অবস্থা এর মধ্যে কাহিল হয়ে আসে নি। আমার পাওনা দিতে লোকে যেমন ছ্যাচরামি করছে, লোকের পাওনা দিতে আমিও সেরকম ছ্যাঁচরামি সুরু করেছি।

আবার সমরেশ হাসে।

: এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছি তো, তাই তোমাদের দেখিয়ে দশ টাকার নোটটা ছুঁড়ে দিয়ে বাহাদুরী করার ঝোঁকটা সামলাতে পারলাম না।

নন্দিতা মৃদুস্বরে বলে, তিনমাস মাইনে পায় নি বলছিল ?

সমরেশ বলে, ব্যাটার মাইনেই ঠিক হয় নি, মাইনে পাবে কিরকম ? কেঁদে কেঁদে বলেছিল শুধু খেতে পেলেই জান্ দিয়ে খাটবে—কাজ দেখে পরে দু'চার টাকা বেতন যদি খুশী হয়তো দেব।

কুমার বলে, পনের টাকা দিতে রাজী হয়েছিলে।

সমরেশ বলে, কয়েক মাস কাজ শেখার পর দেব বলেছিলাম, খুশী হয়ে তাই মেনে নিয়েছিল।

নন্দিতা বলে, তুমি অমনি বিনা মাইনেতে তিন মাস খাটিয়ে নিলে ? পয়সাওলাদের পাওনা দিতে পাল্লা দিয়ে ছ্যাচরামি কর তার একটা মানে বোঝা যায়—এভাবে এই গরীব বেচারাদের ঘাড় ভাঙা তো সাংঘাতিক কথা! দশ টাকার নোটটা নিয়ে ভেগেছে বেশ করেছে, ও যদি তোমার তবিল ভেঙ্গে পালাত তাহলেও ওকে আমি দোষ দিতাম না।

সমরেশ গরম হয়ে বলে, আমার বাবার লাখ টাকার কারবারটা সকলে খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিল—

নন্দিতা আরও নরম স্বরে বলে, কারা খেয়ে শেষ করে দিল—ওরা ? যাদের এমনি করে খাটাও শুধু খেতে পেয়ে যারা তিন মাস হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে রাজী হয় ?

সমরেশ যুক্তিতর্কের ধার দিয়ে যায় না, গরম হয়ে বলে, তোমরা বুঝবে না! কি অবস্থা থেকে কি অবস্থায় পড়ে কীভাবে মামাদের দয়ায় সামলাবার সুযোগ পেয়েছি—তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। একটা পয়সা আমার কাছে এখন এক ফোঁটা গায়ের রক্ত—

: এভাবে পারবে পয়সা করতে ?

: চেষ্টা করে দেখি।

কুমার প্রশ্ন করে, একটা পয়সা এক ফোঁটা রক্ত, যাকে পাওনা পয়সা না দিয়ে পারা যায় তাকেই না দেওয়ার পলিসি—আমায় কেন ঠিক তারিখে মাইনের টাকাটা গুণে দিস?

সমরেশ হেসে বলে, ভেবেছিস মস্ত ধাঁধাঁয় ফেললি? একেবারে জব্দ করে দিলি? তোর বেলাতেও আমার পলিসি চলছে। তোকে ঠিক সময়ে ঠিক মত মাইনে না দিয়ে উপায় নেই বলেই দিই—পারলে তোকেও আমি বিনা মাইনেয় খাটাতাম।

কুমার হেসে বলে, তুই এবার পাগল হয়ে যাবি।

সমরেশও হেসে বলে, পাগল তো হয়েই গিয়েছিলাম—পাগলামিটা এবার সামলে নিচ্ছি।

নন্দিতা ও কুমার আবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

নন্দিতা প্রায় সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে, কটায় বাড়ী ফেরো?

: নটা দশটায়।

: কটায় আসো?

: আটটা নটায়।

: তাহলে মানে দাঁড়াচ্ছে, রাত দশটার পরে গেলে কিম্বা সকাল আটটার আগে গেলে তোমায় বাড়ীতে পাওয়া যায়?

সমরেশ মাথা নাড়ে।

: সব দিন পাওয়া যায় না। কোনদিন রাত বারটা একটায় গিয়েও পাবে না, ভোর পাঁচটায় গিয়েও পাবে না।

: মানে?

: বড় কাজ পেলে কাজের খাতিরে দু'একটা রাত বাইরে কাটাতে হয়। মাগনায় পেগ খেয়ে নেশাও করতে হয়। তেমন নেশা অবশ্য

আমি করি না, বাড়ী ফিরতে পারি, কিন্তু ওই যে বললাম একটা পয়সা আমার এক ফোঁটা রক্ত। যত খুসী ডিম মাংস পরোটা বিনা পয়সায় খাওয়ায়, হিসাবটা ছাড়তে পারি না।

: হিসাব?

: হিসাব বৈ কি।

প্রেমের কাজের চাপেই কুমারকে চলে যেতে হয়।

সমরেশ বলে, আমাকে তো বেরোতে হবে?

: কতক্ষণের জন্য?

: ঘণ্টা দেড়েক।

: আমি এখানে কিছুক্ষণ বসে থাকতে চাইলে আপত্তি করবে?

: যতক্ষণ খুসী বসে থাকো।

সমরেশ আর ফেরে না। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে নন্দিদা বাড়ী ফিরে যায়!

তিনদিন পরে নন্দিতা ভোর রাত্রে সমরেশকে পাকড়াও করে। তার জানা ছিল যে সমরেশ শেষ রাত্রে ওঠে।

প্রণতিও যে আজকাল দাদার মত শেষ রাত্রে উঠতে সুরু করেছে এটা তার জানা ছিল না।

একতলা ভাড়া হয়ে গেছে।

দোতলায় তাদের শোয়ার ঘরে বসিয়ে নন্দিতাকে প্রণতি বলে, দাদা কিন্তু রেগে যাবে বলে রাখছি।

: কেন রেগে যাবে?

: সারাদিন এত খেটে এসে একটু বিশ্রাম না পেলে মানুষ রেগে রাগ যাবে না?

নন্দিতা হাসিমুখে তার গাল টিপে দিয়ে বলে, রাগবে না। সারাদিন খেটে যাতে একটু বিশ্রাম পায় সেকথা বলতেই এসেছি।

সত্যিই কি ভালবাসা হয়েছিল কুমার আর নন্দিতার?

কে জানে!

সমরেশ অবশ্য বিশ্বাস করে যে সত্যিই দু'জনের ভালবাসা হয়েছিল। তবে তার মনে বার বার সংশয় জেগেছে যে ভালবাসাটা দু'পক্ষেরই ছিল, না, একপক্ষের ছিল।

সমরেশ আজও জানে না যে ভালবাসা একপক্ষে হয় না। ওকে আমি ভালবেসেছি—একজনের এটা ভাবাই তো ভালবাসা নয়। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গেলেও নয়। ওটা স্রেফ ন্যাকামি, ছেলেমানুষী, আত্মকণ্ডূয়ন।

দেহধর্মী দুই বিপরীতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, পরস্পরকে উগ্রভাবে চাওয়া এবং না চাওয়ায় মোট সংজ্ঞা ভালবাসা।

কুমার ও নন্দিতার মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল কিনা জানবার জন্য ওদের কয়েক বছরের অতীত মেলামেশার কাহিনী ঘাঁটতে হয়।

উপায় কি?

সব দিক দিয়েই বেমানান।

বয়সে জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে—সব হিসাবেই নন্দিতা তাকে ছাড়িয়ে আছে। এমন কি লম্বায়ও সে দু তিন ইঞ্চি বড় হবে।

ইদানীং রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করলেও একমাত্র হয়তো গায়ের জোরে নন্দিতা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

এরকম কারো সঙ্গে ভাব করার কথা ভাবা যায়?

কিন্তু কেউ যদি উদ্যোগী হয়ে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটায় তাহলে আর উপায় কি।

নন্দিতা নিজেই বলে, সত্যি কথা বলতে ভয় কি? তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। একটু হাবাগোবা কাঁচাপাকা ভারিক্কি সংসারী মানুষ—

নন্দিতা হাসে।

: ছ্যাবলা মানুষ দু'চোখে দেখতে পারি না। তুমি ছ্যাবলা নও বলেই বোধ হয়!

: শুধু এই জন্য? মুখের ওপর বোকা হাবা বললেও রাগ করি না বলেও হতে পারে!

: ও বাবা!—রাগ হয়ে গেল? একটু বোকা হাবা মানে কি বললাম তাও বুঝলে না, এমন বোকা হাবা? তোমার মাথাটাকে ভোঁতা বলি নি—বলেছি তুমি স্মার্ট নও, চালাক নও। সেটা তোমার দোষ নয়। একটা বাজে চাকরির ছুতোয় যে ফেমিলিতে একমাত্র ছেলের লেখাপড়া খতম করিয়ে দেওয়া হয়, সে ফেমিলিতে মানুষ হয়ে কি করে তুমি স্মার্ট হবে, চালাক হবে? প্রশংসা করলাম—হয়ে গেল রাগ!

এসব ভাবের আলাপ।

এ ধরনের আলাপ কারণে বা অকারণে একজন আরেকজনের গেলেও হত, আবার একজন আরেকজনকে ডেকে নিয়ে বাজারে যাবার সময় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও হত।

বোকা হাবা বললে কুমারের রাগ হত, তার কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী লাগত নন্দিতার আরেক ধরণের কথা শুনে।

নন্দিতা মাঝে মাঝেই তাকে সতর্ক করে দিত, বোকা হাবার মতই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করত যে স্বপ্নেও সে যেন ভুল না করে বসে যে তার এই ভাল লাগা ভালবাসা!

থলি হাতে বাজারেই হয়তো যাচ্ছে সকালবেলার মানুষ ও গাড়ীর ভিড় ঠেলে ঠেকিয়ে এড়িয়ে এড়িয়ে—হঠাৎ বলে বসত, বাজারে যাব, বাড়ী গিয়ে ডেকে এনে সাথী করলাম। অন্য কাউকে এরকম প্রশ্রয় দিলে হয়তো রাস্তার মাঝখানেই প্রেম নিবেদন করে বসত। ওদিক দিয়ে বোকামি কোরো না কিন্তু—আমি একদম তোমার প্রেমে পড়িনি। তোমায় শুধু ভাল লাগে, বাস্—আর কিছু নয়। আমার ভাল লাগার অন্য মানে বুঝে নিও না, সাবধান!

কুমার রেগে বলত, কথায় ব্যবহারে এতটুকু ইয়ে ভাব দেখেছ আমার কোনদিন? ত্রিশ বছরের বুড়ী, ঠিক বয়সে বিয়ে হলে পাঁচ ছেলের মা হতে, কত লোকের সঙ্গে ছ্যাবলামি করেছ ঠিক নেই—আমি তোমার প্রেমের কাঙাল নই!

নন্দিতা রাগত না, হাসিমুখে শান্ত ভাবেই বলত, আস্তে কথা বলো না? প্রেমের কাঙাল নও বলেই তো তোমায় ভাল লাগে। কত প্রশ্রয় দিই, তবু কেঁউ কেঁউ সুরু কর না, হাত ধরার চেষ্টা কর না। এরকম একটা পুরুষ বন্ধু পেয়েছি—এ কি আমার কম ভাগ্যি? তাইতো মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিই, ছেলেমানুষী কোরো না।

শুনে কুমারও হাসত।

থলি দুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলত, একদিন ঠেলা বুঝবে। তোমায় তো আমি খেলাচ্ছি। একটু সামলে সুমলে নিই, একদিন তোমায় নির্জনে কোথাও নিয়ে গিয়ে—

: এখুনি চল না?

: খুব রাজী আছি—চল।

: কিন্তু গায়ের জোরে তো পারবে না আমার সঙ্গে। শরীরটা ভাল

করার চেষ্টা কর না, ভাল খাওয়া দাওয়া, একটু ব্যায়ামট্যায়াম করলে কি অপরাধ হয়?

: ওসব কিছুই দরকার হবে না—দরকার যদি হয় তো আমার নিজের জন্য হবে। হাড়ে যা জোর আছে তাতেই তোমাকে অনায়াসে শায়েস্তা করতে পারি!

: পারবে? একদিন পরীক্ষা করা যাক না! সত্যি কিন্তু চেষ্টা করবে, গুণ্ডার মত মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে—ফাঁকি দিতে পারবে না। খবরের কাগজে পাশবিক অত্যাচারের খবর পড়ি আর আমার কি মনে হয় জানো? ভয়ে নিশ্চয় হাত পা এলিয়ে দিয়েছিল। নইলে কারো সাধ্য আছে কোন মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভোগ করে!

কুমার খানিক নীরবে হেঁটে গিয়ে বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ হেসে বলত, দেশটা কতকাল পরাধীন ছিল ভুলে গেছ? পুরুষরাই পাশবিক অত্যাচার সয়ে সয়ে মরছে। গুণ্ডাদের সঙ্গে মেয়েদের গায়ের জোরের হিসাব!

থেমে দাঁড়িয়ে নন্দিতা সেকেলে নাটকের বিশেষ মুহূর্তের নায়িকার মত বিলোল কটাক্ষ হেনে বলিত—মাঝে মাঝে তোমার মুখে এ রকম কথাগুলি বলেই তো—

শেষের দিকে কুমারের সঙ্গে নন্দিতার দেখা সাক্ষাৎ হত খুব কম। নন্দিতার আগ্রহের অভাবের জন্য নয়, কুমারের আগ্রহ যেন হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে গিয়েছিল।

কুমারের মা আর বোন যেদিন সমরেশকে দুপুরে খেতে বলে ছিল, কুমারের কি অসুখ হয়েছে তার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছিল, তার কয়েক মাস আগে।

দু'জনের মেলামেশার রকম লক্ষ্য করে সবে সকলের মনে খটকা লেগেছিল, ভাসা ভাসা ভাবে সকলে বলাবলি সুরু করেছিল যে তাদের অনুমান যদি সত্যিই হয়, দুজনের যদি ভাব হয়েই থাকে—প্রায় সমবয়সী দু'জনের মিলনটা কি দরের ব্যাপার দাড়াবে?

সুমিত্রা ঝেঁঝে উঠে বলত, প্রায় সমবয়সী মানে? নোনাদি দাদার চেয়ে তিন চার বছরের বড—হয় তো তার চেয়ে বড়। নোনাদি ক'বছর বয়স ভাঁড়িয়ে বলে কে জানে!

এটা গায়ের জ্বালার কথা।

নন্দিতা এবং কুমারের জন্মের আগে থেকেই দু'টি পরিবারের মধ্যে মোটামুটি জানাশোনা ছিল, কষে দেখতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে এর কম একটা সুদূর সম্পর্কও নাকি আছে তাদের মধ্যে।

এটা কারো অজানা নয় যে নন্দিতা কুমারের চেয়ে বছর দেড়েক বড়।

সেটাই বা কম কি?

পাঁচ বছরে গৌরীদান মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, পঁচিশ বছরের ছেলের সঙ্গে বাইশ বছরের মেয়ের ঘটক মারফৎ বিয়ে হলেও লোকে আর মাথা ঘামায় না—কিন্তু মেয়ের বয়স ছেলের চেয়ে বেশী?

মোটে বছর দেড়েক হলেও বেশী?

তাদের মেলামেশা ঝিমিয়ে গিয়ে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাতে পরিণত হওয়ায় অনেকে স্বস্তি বোধ করেছিল, কেউ কেউ ক্ষুণ্ণও হয়েছিল। ক্ষুণ্ণ হয়েছিল শুধু কুমারের বন্ধু আর নন্দিতার বান্ধবীরা।

একমাত্র সমরেশ ছাড়া সবাই বুঝে গিয়েছিল যে তাদের অনুমান ছিল ভুল।

ভবানীর সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে হবার পর একমাত্র সমরেশ ছাড়া কারো মনে কোন সংশয় ছিল না।

সমরেশের মনে সংশয় ছিল বলেই নন্দিতা পাটনা চলে যাবার পর কুমার যে ভবানীর কাছে ব্যাপার বুঝতে গিয়েছিল—সে সম্পর্কে কুমারের অজুহাত সে মানতে পারে নি। সাইকোলজির বই ঘাঁটা বিদ্যা বাস্তবে মিলিয়ে দেখতে চায়—এটা হাস্যকর অজুহাত মনে হয়েছিল।

ভবানী হঠাৎ অনিমাকে বিয়ে করে ফেলার কয়েক মাস পরে নন্দিতা ফিরে এলে একটু ঘনঘনই কুমার ও নন্দিতার দেখাশোনা হচ্ছে জেনে অন্য সকলে খেয়াল করার আগেই কুমারের মা আর সুমিত্রা রীতিমত শঙ্কা বোধ করে।

সুমিত্রা একদিন বলেই বসে, নোনাদি একবারটি আসে না—তুমি কেন এত ঘন ঘন ওদের বাড়ী যাও দাদা?

কুমার হেসে বলে, কী বকছিস পাগলের মত? ঘন ঘন তোর নোনাদির বাড়ী যাই?

: যাও না?

: দু'তিন মাসে দু'তিনবার গিয়েছি কিনা সন্দেহ। আমার সময় আছে কারো বাড়ী যাবার?

সুমিত্রা বোকার মত বলে, রোজ রোজ তোমাদের তবে দেখা হয় কি করে?

কুমার গম্ভীর হয়ে গিয়ে গভীর খেদের সঙ্গে বলে, তুই এমন ছ্যাচরা হয়ে গেছিস্? এসব ভাবনা নিয়ে মাথা খারাপ করিস? আমি ইচ্ছে করলেই তোদের ভাসিয়ে দিয়ে তোর নোনাদিকে নিয়ে চির জীবনের জন্য হনিমুন করতে চলে যেতে পারতাম—তোদের জন্যই আমি তা করিনি। আমরা কি ঠিক করেছিলাম জানিস? আমরা মানে তোর নোনাদি

আর আমি যা ঠিক করেছিলাম।—দূরের কোন একটা শহরে দু'জনে যেমন তেমন চাকরী নিয়ে চলে যাব—আর ফিরব না। তিন বছর চেষ্টা করে কোন একটা সহরে আমরা দুজনে পঞ্চাশ ষাট টাকার চাকরী জোটাতে পারিনি। তোর নোনাদির জোটে তো আমার জোটে না, আমার জোটে তো তোর নোনাদির জোটে না। তারপর শরীরটা বিগড়ে গেল, আমি অসম্ভবের আশা ত্যাগ করলাম—

কুমার টেরও পায় না সুমিত্রার কি প্রাণান্তকর সংযম দরকার হয় শান্ত স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করতে, শরীরটা বিগড়ে গেল? কি হয়েছিল দাদা? কি অসুখ হয়েছিল?

: অসুখ আবার কি হবে? অসুখ বিসুখ কিছু নয়, শরীরটা শুধু বিগড়ে গিয়েছিল।

এগারো

তাকে ভাল লাগে ?

শুধু ভাল লাগে ?

নন্দিতার ভাবসাব ভাল করে বুঝতে না পারলেও তার একমাত্র বোনের রকম দেখে কুমার ভড়কে যায়।

এক পোয়া মাছ এনেছে বাজার থেকে, খানির একটু তেল এনেছে—রোজকার শাক পাতার বদলে ছাঁকা তরকারী এনেছে আলু পটল আর একটা কচি লাউ।

বোনের তবু গোমড়া মুখ।

কুমার ক্ষুব্ধ হয়ে বলত, কেন, তোদের মনের মত বাজার হয় নি আজ ? কত খাবি ? মা আর কাকীমার তো একাদশী। ওরা তো কেউ খাবে না। খাব শুধু—তিনটে ছেলেমেয়ে, তুই আর আমি !

: ছাই বাজার করেছ।

: কেন ?

মন্তব্য আসত এই এই ভাবে—

: কত বাজার করেছ আমাদের মনের হিসাব করে ! নোনাদি'র শেখানো বাজার তো! নোনাদি বাজারে ডেকে নিয়ে গেলেই তোমার যেন খাপছাড়া বাজার হয়।

কুমার খানিকক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কম পড়বে নাকি রে ?

: কম পড়বে ! দু' তিন দিনের বাজার এনেছ। তরকারী আনলে রেখে ঢেকে দু'তিন দিন করা যায়—মাছ তো এ বেলা রাঁধতে হবেই। রাঁধতেও হবে, খেতেও হবেই। নোনাদির কি, মাছটাছ এনে ফেলিয়ে ছড়িয়ে খায়। দামী দামী শাড়ী গায়ে চড়িয়ে এদিক ওদিক গায়ে ফুঁ দিয়ে চড়ে বেড়ায়। তোমার আক্কেল নেই ? বোনেরা ছেঁড়া কাপড়ের নেংটি এঁটে রয়েছে—নোনাদির পরামর্শে কাপড়ের বদলে একগাদা মাছ এনে খাওয়াচ্ছ ?

: ও !

: নোনাদির খপ্পরে পড়ে তুমি বড় ইয়ে হয়ে গেছ দাদা !

খুড়তুতো বোন সুধারও গাল ফুলেছিল। সে কিন্তু মুখ বুজে ছিল আগাগোড়া। কুমারের লাঞ্ছনায় এবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

সে ফোঁস করে ওঠে, দাদা ছোটলোক হয় নি, তোমরাই ছোটলোক হয়ে গেছ। একটু মাছ এনেছে বলে কি আরম্ভ করেছে তখন থেকে। তোমাদের জন্য এনেছে নাকি মাছ ? আমার জন্য এনেছে—আমি একলা খাব মাছ।

কুমারের মুখে অস্থায়ী একটু হাসি দেখা দিয়েছিল।

সুধা ঝাঁঝের সঙ্গে আবার বলেছিল, নোনাদির হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে সবাই। পরের মেয়ে' তবু একটু দরদ আছে—বোন হয়ে তোমাদের খালি হিংসা !

কুমার ওঠে দাঁড়িয়েছিল, কার চড়টা সশব্দে সুধার গালে পড়ে সে দেখতে পায় নি।

খানিক পরে সুধাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য জানা যেত কিন্তু সে জিজ্ঞাসাও করে না।

ওসব সস্তা কৌতুহল কুমারের ছিল না।

প্রাণে এই সহজ সরল প্রশ্ন জাগলে উপকারই অবশ্য হত কুমারের যে কার জন্য কি বিষয়ে কেন এই কৌতুহল ?

নিজের চালচলনের খানিকটা মানে বুঝতে পারত ওই কৌতুহলের মানে বুঝবার চেষ্টা করে।

বসন্তের মতই অস্থায়ী মিলনের উন্মাদনা? এক সঙ্গে মিলে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া?

নন্দিতার সম্পর্কে এ সব চিন্তা কুমারের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল কিনা একমাত্র সে নিজে ছাড়া কেউ তা বলতে পারবে না।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কারণে অকারণে যাদের লাগত ঠোকা-ঠুকি, অশান্তি ব্যথা বেদনা রাগ অভিমান গেঁজিয়ে উঠত কমে বেড়ে দিবারাত্রি, মান অভিমান বিবাদ বিদ্বেষ ঝগড়াঝাঁটি হিসাব নিকাশ কথা কাটাকাটি—

সব এলোমেলো মনে হয়।

মিথ্যা মনে হয়।

কেবল তার একার বেলা নয়, সকলের জীবনই যেন বহুরূপী মিথ্যায় জট পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সকলের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়ে, প্রেমকে সস্তা দামে কিনে, পিতৃত্বকে সস্তা দামে কেনার জন্য মাতৃত্বকে সস্তা দামে কেনার কারণ বুঝিয়ে জগতে একটা ওলটপালট ঘটিয়ে দেবার আগ্রহ ঝিমিয়ে দেবার বিরামহীন চেষ্টা চলেছে।

সমস্ত সস্তা হিসাব বরবাদ করতে চেয়ে আর সেটা কাজে পরিণত করতে গিয়ে কুমার দেখল কুলান যায় না।

তার সাধ্য নেই।

কারণ, জগৎটা উল্টে দেবার প্রয়োজন তার একার নয় বলে সে অন্য

অনেকের সাথে হাতে হাত মিলিয়েই সেটা করা সম্ভব বলে মেনেছে। নিজের এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নন্দিতাকে পাওয়া অসম্ভব বলেই কি অগত্যা তাকে হিসাব করতে হয় পৃথিবীর মানুষের এগোবার পথ ?

নন্দিতাও কি জেনে গিয়েছে যে কাব্য-উপন্যাসে যত ফেনিয়ে লেখা হয়েছে তার চেয়ে হাজার গুণ জোরালো ভালবাসা হলেও সে ভালবাসাকে অবাস্তব অর্থহীন স্বপ্ন বলে অস্বীকার করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই ?

জগত যদি অন্য রকম হত, অন্য সব মানুষের সঙ্গে তাদের দু'জনেরও থাকত নিজের নিজের জীবনকে রূপ দেবার স্বাধীনতা—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াত অন্যরকম।

শুধু ব্যাপার নয়, তাদের চেতনাও হত অন্যরকম। ভালবাসার মানে পর্যন্ত বুঝত অন্যভাবে!

আজকাল প্রায়ই মাঝরাতে কুমারের ঘুম ভেঙ্গে যায়, অনেক চেষ্টাতেও আর ঘুম আসে না।

মনে হয়, ভোঁতা মাথা—বোকা হাবা মানুষ। ব্যাপার বোঝা তার পক্ষে অসম্ভব। ভোরবেলা থেকে এত খেটেখুটে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমালো, মাঝরাত্রে শেষ হয়ে গেল ঘুমের পালা।

রোগ নেই কিছু নেই—কেন সে অঘোরে ঘুমোতে পারে না সারারাত? কেন তাকে নীরস শুকনো নীতি আর তত্ত্বকথার বই পড়ে রাত ভোর করতে হয়, রাতজাগা শ্রান্তিতে অবসন্ন দেহ নিয়ে সুরু করতে হয় সারাদিনের খাটুনি ?

মা বোনেদের একটা সাধারণ হিসাব নিকাশ আছে যার মোট কথাটা

এই যে—রোজগেরে যোয়ান ছেলে, পয়সা কামিয়ে মা বোনকে পুষছে, বৌ ঘরে না এলে কি রাত জাগা রোগ ঘুচবে ?

বৌ ?

নাঃ, পাশে একজনকে চেয়ে তো ঘুম ভাঙ্গে না তার, কোন মানুষের অভাব তো মোটেই সে বোধ করে না।

কোন কোন দিন মনে হয় যে নন্দিতার সঙ্গ পেলে মন্দ হত না, আলাপ আলোচনা হাসি তামাসায় ঘুম আবার এলে আসত, না এলেও বিশেষ কিছু আসত যেত না।

এমনি কোন কোন নিদ্রাহীন রাত্রির শেষে সে সোজা গিয়ে হাজির হত নন্দিতাদের বাড়ী।

দরজা খুলত নন্দিতা নিজে।

প্রথমেই চোখে পড়ত বাইরের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নন্দিতার ভাই অশোক আর নতুন ভাড়াটে ভূদেবের যোয়ান ছেলে ভবেশ। তারপর ভিতরে গিয়ে টের পেত যে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে আকাশ যখন ভোরের আলোয় সাফ হয়ে আসছে তখনও কেবল নন্দিতা আর হাঁপানির রোগী ভূদেব ছাড়া সমস্ত বাড়ীটা অঘোরে ঘুমিয়ে আছে!

তার কিন্তু হিংসা হত না।

সারাদিন এত খেটেও ঘুমের জন্য অর্দ্ধেক রাত্রি ছটফট করতে হত, মাঝে মাঝে বড়ি খেতে হত, তবু হিংসা হত না।

তার শুধু শঙ্কা জাগত যে মাথাটাই হয় তো তার একদিন খারাপ হয়ে যাবে।

মস্ত একটা ইলেকট্রিক ষ্টোভ ধরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে নন্দিতা তাকে দিত গরম চা আর মচ্‌মচে আলুভাজা অথবা মামলেট।

এই রকম চাট দিয়ে ভোর রাত্রে চা খেতে খেতে কুমার অনুভব করত, বাড়ীটা তার চারিদিকে জাগছে।

এতক্ষণ ধীরে ধীরে জাগছিল, এবা- তাড়াতাড়ি জাগছে।

কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে যতক্ষণ সে কথা বলত কাপটা হাতে ধরে রেখে, কেউ উঁকিও দিত না।

কাছে ও দূরে কলকারখানায় এলোমেলো ভোঁ বাজার খানিক পরে আবির্ভাব ঘটত ভূদেবের।

বাইরে থেকে প্রায় আদেশের সুরে জিজ্ঞাসা করত, বাড়তি চা আছে নাকি রে?

কুমার বলত, আসুন না, তৈরী না থাকে তৈরী করে দেবে। এসে বসুন না?

ভূদেব ঘরে এসে বসলে সে ভূমিকা না করেই সুরু করে দিত—কাল যে বলছিলেন, আপনারা যেভাবে করে এসেছেন ওভাবেই শুধু দেশের আর দশের জন্য কিছু করা যায়—কথাটা আমি মানতে পারিনি কিন্তু।

নন্দিতা আগেই কেটলিতে জল ভরে ষ্টোভে চড়িয়ে দিত, নিজের জন্য সরিয়ে রাখা আলুভাজা আর মামলেটের টুকরাগুলি ভূদেবের জন্য প্লেটে সাজিয়ে ফেলত।

ভূদেবের জীর্ণ শীর্ণ চেহারা। প্রথম রাতে যেটুকু ঘুম হয়, তারপর আর ঘুম আসে না, হাঁপানির টান না উঠলেও আসে না।

সে বলত, নাই বা মানতে পারলে? আমি তো তোমার কাছে আব্দার করিনি যে আমার কথা মানতেই হবে!

: আপনার যুক্তি ভুল। কোন লজিক নেই। দেশসেবকেরা

নিজেরাই ঠিক করবে কি ভাবে দেশের ভাল করা যায়—এটা হতেই পারে না!

নন্দিতা বলত, বসতে না বসতে আরম্ভ হয়ে গেল?

ভূদেব বলত, আমি আরম্ভ করিনি কিন্তু। আমরা সেকেলে মানুষ, তর্কযুদ্ধ ভাল লাগলেও আগে জাঁকিয়ে বসে খানিকক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ করতাম, খানিকক্ষণ কথার পাঁয়তাড়া কষতাম—

কুমার বলত, সেদিন কি আর আছে? কত সময় ছিল আপনাদের। নানা বিষয়ে আলাপ জমিয়ে কথার পাঁয়তাড়া কষতে গেলে তর্ক পর্যন্ত কোনদিন পৌছনো যাবে না, আমাকে আগেই কেটে পড়তে হবে।

ভূদেব বলত, এই কথাই বলছিলাম সেদিন। সময় নেই, ধৈর্য্য নেই, চিন্তা করার সময় নেই, এরকম ব্যাস্তবাগীশ মানুষদের সাধ্য আছে না অধিকার আছে যে বলবে—এইভাবে দেশের উন্নতি হবে? সব ত্যাগ করে যারা দেশসেবার কাজটাই জীবনের একমাত্র ব্রত করেছে—তারাই পথের সন্ধান বলতে পারে।

কুমার বলত, এসব সেকেলে নেতাদের আজগুবি কথা। আমরা যেটুকু বুঝেছি আর করেছি, করেছি আপোষে—সুবিধা পেয়ে। মাথা খাটাতে ওস্তাদ হয়েছি, ফাঁকা সম্মান আর কিছু নগদ দামে মাথার কাজ আপোষে বিক্রী করেছি বলেই আমরা সুবিধা পেয়েছি, আরামে থেকেছি। আমরাও ওই পয়সারই জন্যই মাথা খাটাই।

ভূদেব চটে বলে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই বলছ আমরা পয়সার জন্য মাথা খাটাই। কত পয়সা আছে আমাদের? এই কুসংস্কার ভরা অন্ধকার দেশে আমরাই আলো জেলে রেখেছি। একটু আলোর জন্য আমরাই জীবন দিয়েছি। পয়সাওলা লোকের ছ্যাচরামির নিন্দা আমরাই করতে পারি। আমরা বিপ্লব করি নি?

সব কিছু আপোষে করেছি? বেশ তো, আপোষ কি সব অবস্থাতেই খারাপ? আপোষের প্রয়োজন হয় না? একেবারে কিছু না করার চেয়ে আপোষে কিছু করা ভাল নয়? তুমি নিজেও তো ওই রকম রাস্তাই খুঁজছ! নিজের কোয়ালিফিকেশন সার্থক করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে ভালরকম রোজগার করে সুখী হবে।

কুমার বলে, নিশ্চয়, আমার এই কথাটাই তো আপনারা বুঝতে পারছেন না। নিজেকে আমি ফাঁকি দেব না, এটাই আসল কথা। আমি আমার নিজের ধাত জানি। শুধু বিদ্যা আর পয়সা ঘেঁটে আমার প্রাণ ভরবে না, সাধারণ মানুষের জন্যও আমাকে কিছু করতে হবে। আবার সাধারণ মানুষের খাতিরে জীবনপাত করার সাধও আমার নেই। নিজেকে আমি তাই শুধু মানুষ ভাবি, আপনার মত সেরা মানুষ, মহাপুরুষ ভাবি না। ওটা ধাপ্পাবাজি।

এবার নন্দিতাও চটে বলে, সামলে কথা কও না কুমার? বাপের বয়সী মানুষকে এসব বলা উচিত নয়।

কুমার বলে, তা হলে চুপচাপ থাকাই ভাল। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো ওঁকে খোঁচা দিই নি। আমাদের মধ্যে এ রকম কিছু ধাপ্পাবাজ আছে, তাদের কথা বলেছি।

ভূদেব বলে, আমি তো তাদেরি একজন?

কুমার বলে, রাগ করলে কি করব বলুন? আপনার কথা মেনেই নিলাম আমি। দেশের কোটি কোটি মানুষকে পিছনে অন্ধকারে ঠেলে রাখা হয়েছিল, এ অবস্থায় যেটুকু করার আমরাই করেছিলাম বৈকি! তার অনেক দাম আছে নিশ্চয়! কিন্তু ওই কোটি কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি যদি বলতে চান—

: একজন মহাপুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না?

: কোটি কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে?

: এত বড় কথা নাইবা বল্লে? আমরা সাংসারিক কথা বলছি।

: বড় বড় কথার ব্যাপারে বড় বড় কথা না বললে চলে? সামঞ্জস্য রাখতে হবে তো!

নন্দিতা খিল খিল করে হেসে উঠত। বলত, ও! সামঞ্জস্য রাখার জন্য তোমার বড় বড় কথা বলা! কথা বলার জন্য কথা বলা! তাহলে আর তর্ক কিসের? আরেকটু লিকার আছে, আধ কাপ করে দিচ্ছি, খেতে খেতে দু'জনে এবার আপোষে কথা বল। বেশী গরম করে দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি খেতে পারবে না।

কুমারের কথা শুনতে শুনতে নন্দিতার কখনো মজা লাগত, কখনো রাগ হত, কখনো সাধ জাগত সোজাসুজি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।

তবু তাকে বিদায় দিতে গলির মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে সে বলত, তুমি আর এভাবে তর্ক কোরো না বুড়ো মানুষটার সঙ্গে।

কুমার বলত, সোজা কথা বুঝতে পার না কেন? এরকম তর্কই উনি চান—ভালবাসেন। তুমি চটেছ, উনি খুশী হয়েছেন। কাল ভোরে এলে দেখবে, আবার এসে তর্ক জুড়বেন। যাই হোক, আমার নিজের কয়েকটা কথা আছে, শুনবে তো?

: শুনব।

কুমার কৃতার্থ হবার ভাব দেখিয়ে বলত, তা হলে আমার সঙ্গে চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

: কাপড় বদলে আসি?

: এসো।

রাস্তার ধারে কুমার দাঁড়িয়ে থাকত। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত। কাছেই কোথাও সমাজ-সংসার সব ভুলে গিয়ে লাউড স্পীকার গাঁ গাঁ

আওয়াজে বাজতে সুরু করেছে—যে বাজনায় প্রাণের কোন সাড়া নেই।

এরকম গর্জন করা সুর বাজানো শুনলে যেন মানুষের রোগ, শোক দুঃখ বেদনা প্রাণের জ্বালা সব সেরে যাবে, মানুষ বেঁচে যাবে। পূজা পার্বনের দিন নয়, সম্ভবত কোন বিয়েবাড়ীর উৎসবকে জীবন্ত করে তুলতে এমন প্রচণ্ড সুর ছড়ানো হচ্ছে।

নন্দিতা খুব তাড়াতাড়িই কাপড় বদলে চলে আসত।

হঠাৎ দরদ দেখাত সুমিত্রার জন্য।

চলতে চলতে বলত, সুমিত্রাকে কোন সরকারী চাকুরের ছেলের সঙ্গে কিম্বা কোন লেখক গায়ক ছবি-আঁকা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিও।

: ওর বিয়ে দেওয়া যাবে না।

: কেন?

: আমি বিয়ে না করলে সুমিত্রা বিয়ে করবে না।

: ওকে বলো নি যে বিয়ে করা না করা ওর ইচ্ছার ব্যাপার নয়, তোমার ইচ্ছা- হয় রোজগার করুক, নয় বিয়ে হোক, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে স্বামীর রোজগার খাক, তুমি আর ওকে পুষতে পারবে না? ওকে কারো বৌ করে বিদেয় করতে না পারলে তুমি নিজে কাউকে বৌ করে ঘরে আনতে পারবে না?

: ওসব কায়দা অনেক আগেই খাটিয়েছি। ফল হয় না। সুমিত্রা কি বলে জানো?—আমায় তাড়ালে তবে তোমার বৌ-পোষার ক্ষমতা হবে? অমন বৌ দিয়ে করবে কি?

নন্দিতা আস্তে আস্তে হাঁটত। এভাবে শাড়ীর একটা আঁচল কোমরে এঁটে আরেকটা দিক গায়ে জড়িয়ে ঘরে চলাফেরা করাই তার অভ্যাস নয়, শাড়ীটা খুব দামী আর আধুনিক হলেও সেকেলে গিন্নী-বান্নিদের

মত সহজভাবে শুধু গায়ে জড়িয়ে পথ চলতে তার বিশ্রী লাগে, থেকে থেকে গায়ে যেন কাঁটা দেয়। আঁচলটা বার বার এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে চালাচালি করে।

সুমিত্রা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, এত চেষ্টা করেও কিছু সুবিধা হলনা? কিছু না হলে তো ডুবে যাবে।

সমরেশ শুধু বলে, ডুবে যেতে বাকী নেই, এখন শুধু উঠবার চেষ্টা।

: একটা চাকরী নিলেও তো পার?

: এতকাল ধরে এত কষ্ট করে যেমন তেমন একটা চাকরী তো নেওয়া যায় না। কোন লাভ নেই ওরকম চাকরী নিয়ে।

কুমারও মাঝে মাঝে আসে। নিজের স্বাস্থ্য খরচ করে এতগুলি পরীক্ষা পাশ করে তাকে একটা মাষ্টারি নিতে হয়েছে। পঁচাত্তর টাকা বেতনের একটা কেরাণীগিরি মত মাষ্টারি। ওই চাকরি থেকেও আবার তাকে বিদায় করার আয়োজন চলছিল।

টুইশনের হিসাব ধরলে আরও কয়েকটা টাকা—কিন্তু তার মাসিক ব্যয় দেড়শো টাকার মত।

ওই চাকরীটা চোখ কান বুজে না নিয়ে সংসার চালাবার উপায় ছিল না কুমারের।

স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে।

অথচ দরকার মত টাকার ব্যবস্থা হয় নি।

ছুটির দিনেও কুমারকে তার নিজের ছাত্র পড়াতে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আত্মীয়তা বন্ধুত্বের জোর খাটিয়ে চাকরী যারা দিতে পারে তাদের বাড়ীতেও কুমারকে হাঁটাহাঁটি করতে হয়—যদি ভাল কিছু জুটে যায় এই আশায়।

সবদিন এসে স্থমিত্রা সমরেশের নাগাল পায় না।

প্রীতি কেমন করে টের পায় কে জানে যে স্থমিত্রা এসেছে। নিজের কাছে ডেকে পাঠায়।

হাসিমুখে আদর করে বসতে দিয়ে বলে, তোমরাই সত্যি-কারের সত্যযুগের সতী মেয়ে এ কলিযুগে।

: কী বলছেন প্রীতিদি? আমরা একালের মেয়েরা তো মানিই না ওসব সতীত্বপনা!

: মানো না? বটে? বসো না। জল ফুটেছে—চা করে আনাই। কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনেই জানালা দিয়ে তোমায় দেখে কেটলি চাপিয়েছিলাম। জানি তো সমু বাড়ী নেই। একটু বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করে মুখ শুকনো করে ফিরে যাবে? এক কাপ চা খাইয়ে ছুটো মিষ্টি কথা বলব না তোমাকে!

প্রীতি তাকে ডাকলে অন্য কেউ কাছে আসে না। আড়াল থেকে তফাৎ থেকে তাদের কথা শোনে।

সবাই তো জানে একেলে মেয়ের পুরুষালি চালচলন নিয়ে বিব্রত হবার পক্ষে প্রীতির একবিন্দু সহানুভূতি নেই। স্থমিত্রাকে সে কি কথাটা বুঝিয়ে দিতে চায় তাও সকলের জানা—সমরেশকে জয় করার এবং বশ করার জন্য স্থমিত্রা যে কোন উপায় অবলম্বন করুক, সেটা মোটেই দোষের হবে না।

নানা ঝন্‌ঝাটে মনটা বিগড়ে আছে সমরেশের, তার তেমন উৎসাহ না দেখা যাক—স্থমিত্রার উচিত তাদের মিলন যাতে তাড়াতাড়ি ঘটে, সেজন্য চেষ্টা করা, এরকম কুমারী বেশে মাঝে মাঝে না এসে সে যাতে একেবারে বৌ সেজে এবাড়ীতে বাস করতে পারে, সেজন্য তারই উঠে পড়ে লেগে যাওয়া দরকার॥

ধমক দিলে তো শুনবে না বুঝবে না সুমিত্রা।'

আদর করে তাই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে পছন্দ করা ছেলেকে রেহাই না দিয়ে দখল করাই একেলে মেয়ের প্রধান কাজ, তাদের ওটাই সতীত্ব, নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

প্রণতি চা দিয়ে যায়—দাঁড়িয়ে এক মিনিট কথাও বলে যায়। সেও যেন জানিয়ে দিতে চায় যে বৌদি হয়ে ঘরে এলে তারা সবাই সুমিত্রাকে ভালবাসবে!

সুমিত্রা একটু চুপ করে থেকে বলে, যাক গে, আগে বিয়ে হোক, তারপর সতীত্ব আর নারীত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।

প্রীতি বলে, ওমা। সতীত্ব বুঝি বিয়ের পর সুরু হয়? সতী মেয়ে জন্ম থেকে সতী। ওটাই আসল সতীত্ব। ভবিষ্যৎ শ্বশুর শাশুড়ী ননদদের মত নিয়ে, পাড়া পড়শীর মত নিয়ে, কারো সঙ্গে প্রেম করলে কি কোন মেয়ে অসতী হয়? তবে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবেই এটা ঠিক থাকা দরকার।

গরম চা সুমিত্রা খায়নি। ঠাণ্ডা চা এক চুমুকে খেয়ে সে কাপ প্লেট নামিয়ে রাখে।

প্রীতি এমন পাগল হয়ে উঠল কেন তাদের মিলন ঘটাতে—সামাজিক মিলনের ব্যবস্থাটা পরে হলেও কিছুমাত্র আসবে যাবে না আশ্বাস দিয়ে?

একি উদ্ভট উপদেশ প্রীতির!

মেয়েরা মেয়েলিপণার সীমা ছাড়িয়ে কোনদিন এক পা এগোবে না, চিরকালের এই নিয়মনীতি একেবারে উল্টে দেবার পরামর্শ দিচ্ছে প্রীতি!

আনমনা হয়ে সুমিত্রা খানিকক্ষণ কল্পনা করার চেষ্টা করে—

উপদেশটা সে কিভাবে পালন করতে পারে এবং তার ফলাফল কি হওয়া সম্ভব।

তাই সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, প্রীতিদি, স্বামীর সঙ্গে ক'মাস ঘর-কন্না করেছিলে তুমি ?

প্রীতি যেন ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, আমার কথা বাদ দে।

: কেন বাদ দেব তোমার কথা ? তুমি কি মানুষ নও ?

প্রীতি রেগে বলে, অবস্থার হিসাবটাও ধরতে হয় জানিস তো ?

বারো

জীবনের হিসাব তবে কি ?

কোন অর্থে তবে কষতে হবে জীবনের মূল্য ? কোন্ সুখ দুঃখ আরাম বিলাস আনন্দ বেদনার হিসাবে মাপা যাবে মানুষের জীবনের সার্থকতা এবং ব্যর্থতা ?

সমরেশ বুঝে গিয়েছে যে কেন বাঁচা না জেনে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

এসব খুব গরম চিন্তা। জীবনের মানে বুঝবার চিন্তা ছাড়া কোন চিন্তাই বেশী তপ্ত নয়।

সমরেশের তাই মনে হয় কেবল চিন্তায় চিন্তায় যেন দগ্ধ হয়ে যাবে তার মন প্রাণ।

পুরুষ মানুষ। বয়স বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। আজ পর্য্যন্ত টের পেল না শান্ত নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের উপায় কি।

কুমারের কেবল মা আর বোন নিয়ে কারবার।

নন্দিতার সঙ্গে দেখাশোনা আলাপ আলোচনা করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে কোনদিন এমন উদ্ভট কথা সে কল্পনাও করে নি। নন্দিতাকে কোনদিন নিজের একচেটিয়া দখলে পাবে, সাধ জাগলে প্রমাণ পাবে যে নন্দিতারও রক্ত মাংসের একটা দেহ আছে।

বোঝাপড়া হোক বা না হোক, কুমার আর নন্দিতার মধ্যে ভাব আছে এই ধারণা নন্দিতার তীব্র আকর্ষণকে আত্মীয়তাবোধের মায়ামমতায় পরিণত করেছিল।

তারপর হঠাৎ মামী বনে গিয়ে সে সব মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। তার আগে কোন মেয়ের পক্ষেই নন্দিতাকে ডিঙিয়ে তার মনে উঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু নন্দিতা মামী বনে যাবার পরও সে কেন কোন মেয়ের জন্য আকর্ষণ অনুভব করে না?

মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়, সুমিত্রার সঙ্গে একটু ভাব করলে দোষ কি! সুমিত্রা যে অনেকদিন থেকেই ওরকম কিছু প্রত্যাশা করে আসছে তাও তার অজানা নয়।

কিন্তু প্রাণ যেন সাড়া দেয় না।

কারবারটা গেছে।

বড় একটা বাড়ী আছে বটে কিন্তু এতবড় বাড়ী আর এতগুলি পোষ্যই যেন তাড়াতাড়ি এনে দিয়েছে অচল অবস্থা।

তবু আজও সমরেশ অবশ্য ধারণাও করতে পারে না যে তার নিজের প্রাণের দাম কতটুকু।

সেও তো একটা ব্যক্তি। তারও তো ব্যক্তিগত হিসাব আছে জীবনের দাম কষাকষির। কিন্তু সে এখনো বোঝেনি যে এতদিন দু'চার জনের কাছে ছাড়া তার প্রাণের দামটা ছিল বিরাট ব্যবসা আর অনেক পয়সা থাকার জের-টানা দাম।

টাকাই যাদের ধর্ম এবং কর্ম, খেটে রোজগার করা টাকা নয়, মানুষের রক্ত শোষণ করা টাকা—সে সব মানুষ তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ওরা তার মরা বাঁচা তুচ্ছ করেই চলবে।

হঠাৎ সে দোতলাটা ভাড়া দিয়ে দেয় রমণীমোহন নামে একজন মোটা পেনসন-ভোগী ভদ্রলোককে—তারও মস্ত বড় পরিবার।

প্রত্যেক মাসে ঠিক তারিখে নিয়মিত ভাড়া দেয়।

নিজেই আসে।

টাকা গুণে দিতে দিতে আপশোষ করে বলে, বাড়ী একটা করতাম, এতবড় না হলেও ছোটখাট একটা বাড়ী তোলার মত পয়সা কি আর করিনি এতকাল চাকরী করে? তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ঠিক বুঝবে না— ছেলেমেয়ে কটার জন্য বাড়ী করতে সাহস পাই না। মারামারি কাটাকাটি করবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে মরার আগে নগদ টাকা ভাগ করে দিয়ে যাব—যে যার পথ দেখবে।

দোতলা বাড়ীতে যে মানুষগুলি ভিড় করে ছিল তারা গাদাগাদি করে সম্বল করেছে শুধু একতলাটা। দম যেন আটকে আসতে চায় সকলের।

নিজের ঘরটিও ছেড়ে দিতে হয়েছে সমরেশকে। খাট আর চেয়ার টেবিলটা রাখার ঠাঁইটুকু শুধু জুটেছে—টেবিল চেয়ার সরে গেছে কোণের দিকে ঠেলে দেওয়া খাটের মাথার কাছে।

একান্তে প্রাণখুলে দুটো কথা বলার সুযোগ নেই, সুমিত্রা তবু আজকাল ঘন ঘন আসা যাওয়া সুরু করেছে।

সমরেশ যখন বাড়ী থাকবে জানা কথা তখনই অবশ্য সে আসে— সমরেশের সঙ্গেই সে বেশীর ভাগ কথাবার্তা চালায়।

সমরেশ খাটে বসলে সে বসে খাটের এ মাথায় সরানো অনেক দামী পুরানো ভাঙ্গা চেয়ারটায়, সমরেশ ওই চেয়ারে বসে থাকলে সে বসে ভিতরের মালমশলা খসতে সুরু-করা সেকেলে মোটা গদির বিছানায়।

সুমিত্রা আসে, সকলের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করে সমরেশের সঙ্গে আলাপ চালায়—সেজন্য বাড়ীর মানুষরা বিরক্ত বা ভীত হয় না।

তারা বরং চায় যে সুমিত্রা এসে যত খুসী আরও বেশী ভাব জমাক সমরেশের সঙ্গে।

বাড়াবাড়ি করলে সমরেশ চটে যাবে, নইলে বাড়ীর সকলে হয় তো খোলা ছাদে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের নির্জনে মেলামেশার সুযোগ করে দিত

সুমিত্রাকেই বিয়ে করুক সমরেশ!

সকলের ধারণা জন্মেছে যে বিয়ে করে সংসারী হলে তার ছেলেমানুষি ভাব কেটে যাবে, দায়িত্বজ্ঞান জন্মাবে, একটা কোন কারবার আবার খাড়া করতে পারবে বাপ দাদার পথ অনুসরণ করে।

নন্দিতা যে কেন প্রায়ই সমরেশের সঙ্গে গল্প করতে আসে!

স্বামী হয়েছে, আর ভাবনা নেই।

কিন্তু সে আসে যায় বলেই হয়তো সমরেশের মনটা সুমিত্রার দিকে যাচ্ছে না।

কে বলতে পারে!

নন্দিতার সমাদর কমে গেছে। সকলের ব্যবহারে তুচ্ছ করার ভাবটাই স্পষ্ট। কিন্তু নন্দিতা যেন গ্রাহ্যও করে না।

সেদিন সন্ধ্যায় নন্দিতার বিষম মাথা ধরেছিল।

মাথা ধরা কিনা কে জানে। শূলবেদনা পেটে হয়, দাঁতে হয়— মস্তিষ্কেও যে হয় সমরেশের জানা ছিল না।

নন্দিতা এসে খাটে বসে। বিরস মুখে জিজ্ঞাসা করে, আমার শরীর এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন বলতে পার?

: আমি কি ডাক্তার? ডাক্তারকে দিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করালেই জবাবটা বেরিয়ে আসবে।

: আসবে কি? কারণটা শরীরে না মনে সেটাই যে বুঝতে পারছি না। কোন ডাক্তার দেখাব—শরীরের ডাক্তার না মনের ডাক্তার?

: কুমার কি বলে ?

: কুমার বলে মনের ডাক্তারকে দেখাতে। মনের ডাক্তার মানেই নাকি শরীর প্লাস মনের ডাক্তার—শরীরের ডাক্তার না হয়ে নাকি কেউ মনের ডাক্তার হতে পারে না। মনটাও নাকি আমাদের শরীরেরই একটা বিশেষ অঙ্গ।

: এক হিসাবে তাই বৈকি। শরীরে ওষুধ দিয়ে মনটাকে কণ্ট্রোল করা যায়। এটা অবশ্য সোজা সাধারণ হিসাব—গোড়ার হিসাব। খেলে আর নিশ্বাস নিলে প্রাণী বাঁচে ওই ধরণের হিসাব। এটা ধরে নিয়েও মনকে পৃথক্ করে ধরে বিজ্ঞানের একটা বড় শাখা গড়ে উঠেছে। শরীরের ওপর মনের কর্তালি কম নয়। বেদনা পেলাম মনে, চোখ টাটিয়ে জল ঝরতে লাগল।

: দেহ আর মন পৃথক্ নয় বলছ ?

: মোটেই পৃথক নয়।

: প্রেম দেহগত না মনগত ?

: ছু'য়ে মিলে। দেহ দিয়ে প্রেম হয় না, সেটা পাগলের উদ্ভট কল্পনা। শুধু মন দিয়েও প্রেম হয় না—সেটা মানসিক ছ্যাবলামি। প্রেম হল দেহমন মিলে মিশে দৈহিক আর ওই দেহগত মনটার মানসিক যোগ বিয়োগ সৃষ্টি করা। জীবন জটিল হলে এ ক্রিয়াটাও জটিল হয়।

প্রণতি চা এনে দিয়েছিল। মুখ বাঁকিয়েছিল নন্দিতা।

কাপ-ভরা চা যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকে, নন্দিতা কয়েকবার ওঠে বসে, জানালায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে চুল খোলে যেন এই কাজটা করতেই সে এ বাড়ীতে এসেছিল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আমার মন যদি দেহ মনের ওই সম্পর্কের

নিয়মটা মানতে না চায়? আমার মন যদি বলে যে জগৎ সংসার চুলোয় যাক্—

সমরেশ বলে, আর বেশী ফেনিও না। বাড়ীর প্রত্যেকে আমাদের কথা শুনছে। হলেই বা মনে প্রাণে একেলে, বেড়া ভাঙ্গার সাধ্য আছে? দেখলে তো, বুঝলে তো, নিজের মনটা নিজের শক্তি দিয়ে বশে আনতে পারছ না বলেই পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করছ?

নন্দিতাকে শূল বেদনার রোগিনীর মতই সর্ব্বাঙ্গ মুচড়ে মুচড়ে পাক খেতে দেখে আর অসহ্য যাতনায় কাতরাতে শুনে সমরেশ যথারীতি দুঃখিত হয়। ভাবে যে আগে তো এই উপসর্গ তার ছিল না! কী এই রোগ যা পিষে পিটিয়ে ককিয়ে কাঁদিয়ে প্রায় শেষ করে দিয়ে যায়?

বিকাল পাঁচটা।

দোতলা বাড়ীটার দুটো তলাই বাড়ীর মানুষের ভিড়ে গম গম করছে।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ ঘরে এসেছে চারতলা বাড়ীটার পাশ কাটিয়ে।

খাটের পাশের চেয়ারটাতে সমরেশ বসামাত্র খাটের বিছানা থেকে ছিটকে গিয়ে নন্দিতা তার কোলে মাথা গুঁজে মেঝেতে বসে পড়ে।

আর্তস্বরে বলে, মাথাটা কেটে ফেলো, শীগগির মাথাটা কেটে ফেলো আমার। মরে গেলাম, সত্যি আমি মরে গেলাম।

সমরেশ তার মাথায় হাত রেখে চুপ করে বসে থাকে। ডাক্তার ডাকার কথা সে উচ্চারণও করে না।

ইচ্ছা করলেই নন্দিতা বড় বড় ডাক্তারকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাতে পারে।

সুমিত্রা কয়েকবার এসে ঘুরে যায়, সমরেশের দেখা পায় না।

তাকে এড়িয়ে চলার জন্য সে বাড়ীতে থাকার সময়টা নিশ্চয় বদলে

ফেলে নি! কাজের চাপেই নিশ্চয় তাকে বদলে দিতে হয়েছে ঘরে বাইরে কাজ ও বিশ্রাম করার সময়-তালিকা।

কিন্তু তাকে না জানিয়ে কেন?

সমরেশ কি জানে না যে সে মনে প্রাণে কামনা করে, তার একটা গতি হোক? দু'এক বছর দেখা না হলেও সে ক্ষুণ্ণ হবে না?

প্রীতি যাই বলুক, সুমিত্রা বুঝতে পারে, গায়ে পড়ে ব্যাপার বুঝতে গিয়ে কোন লাভ নেই। দু'দিন দেখা না হলে যে ব্যাকুল হয়ে হয়ে ছুটে আসত, হঠাৎ সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে তাকে এড়িয়ে চলতে!

শুকনো নীরস জীবন।

শুধু দায় আর খাটুনি।

সমরেশের আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসভরা ভালবাসা তাই কি সে এমন অন্ধ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল?

বিচার বিবেচনা না করেই?

নির্মম হৃদয়হীন জগতে ব্যর্থতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে দায় পালনের জীবন-পাত লড়াই চালাতে চালাতে তৃষ্ণায় এমনি কাঠ হয়ে গিয়েছিল তার বুক যে সুমিত্রার স্বতস্ফূর্ত ছেলেমানুষী হৃদয়াবেগ গোড়ার দিকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত প্রায় কাতরভাবে গ্রহণ করেছিল?

তারও তবে আবেগ আছে, চোখকান বুজে ভাবের মানস তরীতে ভেসে যাবার ঝোঁক আছে।

দেখা একদিন হবে এটা জানাই ছিল।

এতদিন ধরে এমন ভালবাসার খেলা চালিয়ে যাওয়ার পর একই সহরের এ পাড়ায় ও পাড়ায় দু'জনে তারা জীবন কাটাবে চিরকালের জন্ত মুখ দেখাদেখি এড়িয়ে গিয়ে!

তাও কি সম্ভব ?

আত্মীয় বন্ধুর মারফতেই কত যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে ! অন্য সব যেমন ছিল তেমনি থাকবে, শুধু তাদের সম্পর্কের এইসব সূত্রগুলি রাতারাতি ছিঁড়ে যাবে !

তাই হঠাৎ একদিন প্রীতি এসে একটা বাজে অছিলায় তাকে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলে সে আশ্চর্য্য হয় না। শুধু ভাবে, প্রীতির এত মাথা ব্যথা কেন তার জন্য ?

অথবা এ দরদ সমরেশের জন্য ?

প্রীতি কি সত্যই বিশ্বাস করে যে সমরেশ তার দিকে ছাড়া আর কোন মেয়ের দিকেই তাকাবে না ?

প্রীতি বলে, একটু দেরী করেই যেও। সমুর ফিরতে রাত হয়।

সুমিত্রা বলে, কেন, আগে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে গল্প করলে চলবে না বুঝি ?

: কত তোমার গল্প করার সময় ! একবার গিয়ে উঁকি মেরে আসার সময়ও তো পাও না।

কুমারের খবর সে জিজ্ঞাসা করে বিদায় নেবার খনিক আগে।

: কুমার কেমন আছে ?

: ওইরকম—খারাপের দিকে যাচ্ছে না এইটুকু। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। কারো কোন কথা শোনে না, আমরা করব কি।

প্রীতি সায় দিয়ে বলে, পুরুষ মানুষ, একা সব দায় বইছে, নিজের কথা ভাবতে পারছে না। নিজে তোমাদের চেষ্টা করে ওর বোঝা হাল্কা করে দিতে হবে। সেরে যাবে—ভয় নেই।

আটটার সময় সমরেশদের বাড়ী পৌছে সুমিত্রা শোনে তাকে রাত্রে খেতে বলা হয়েছে এ খবর না জেনেই সমরেশ বেরিয়ে গিয়েছে।

: দিদির কি রকম ভুলো মন ছাখো; সারাদিন কিছু বলেনি, বিকালে হঠাৎ বলে কিনা, আরে, সুমিত্রাকে তো রাত্রে খেতে বলেছি! আমরা শুনে অবাক!

সুমিত্রা ভাবে, সমরেশের সম্পর্কে এমনি সংশয় জেগেছে প্রীতির মনে! সে রাত্রে খেতে আসবে জানা থাকলে পাছে সমরেশ কোন ছুতোয় তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে এই আশঙ্কায় খবরটা প্রীতি বাড়ীর লোকের কাছে বিকাল পর্যন্ত চেপে গেছে!

ব্যাপার তবে সত্যই গুরুতর? তার সঙ্গে বোঝাপড়া এড়িয়ে চললেও প্রীতির সঙ্গে নিশ্চয় এ বিষয়ে কথা হয়েছে সমরেশের এবং ভেবে চিন্তে এইভাবে তাদের মুখোমুখি এনে দেবার উপায় সে ঠিক করেছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা সুমিত্রা বোধ করে না।

তার মনে হয়, তাদের দেখা করিয়ে দেবার জন্য প্রীতি এরকম ব্যস্ত হয়ে না উঠলেই বরং ভাল ছিল। প্রীতির কি একবার খেয়ালও হল না যে হয় তো তাদের শুধু কলহ বা নিছক ভুল বোঝার ব্যাপার নয়! দুজনকে এভাবে মুখোমুখি এনে দিলে বোঝাপড়া হওয়ার বদলে ভেঙ্গেও যেতে পারে তাদের সম্পর্ক!

দশটার কিছু আগেই সমরেশ বাড়ী ফেরে।

সুমিত্রাকে এত রাত্রে এ বাড়ীতে দেখে তার মধ্যে বিশেষ কোন ভাবান্তর ঘটেছে কিনা টের পাওয়া যায় না। একটু বিস্ময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সে জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে তুমি এখানে?

সুমিত্রা বলে, নেমন্তন্ন খেতে এসেছি।

: নেমন্তন্ন?

প্রীতি বলে, আমি ওকে খেতে বলেছিলাম।

: ও!

সমরেশের শীর্ণ মুখে গভীর শ্রান্তির ছাপ দেখে সুমিত্রা বড়ই মমতা আর উদ্বেগ বোধ করে।

আরও যেন রোগা হয়ে গেছে সমরেশ।

যাই ঘটে থাক তার হৃদয় মনে, যে কারণেই সে হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা সুরু করে থাক, সুমিত্রার এতটুকু রাগ বা অভিমান কখনো জাগে নি। আজও মমতার সঙ্গে তার মনে হয় যে বেচারাকে বিব্রত না করলেই ভাল হত!

না জানি কি তোলপাড় চলেছে সমরেশের মধ্যে!

রাত্রি হয়ে গেছে বলেই সুমিত্রাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না, রাত হয়েছে বলে একা একা বাড়ী ফিরতে তার অসুবিধা অথবা ভয় হবার প্রশ্নই ওঠে না।

কথা তাদের সমরেশের ঘরে বসেও হতে পারত। প্রীতি উদ্যোগী হয়ে সে সুযোগও সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু সুমিত্রা কি না ঠিক করেছিল যে সমরেশকে বিব্রত করবে না, চাপ দিয়ে তার কাছ থেকে তার অদ্ভুত ব্যবহারের কৈফিয়ৎ আদায় করবে না, দু'চার মিনিট কথা বলে সে তাই উঠে পড়ে।

: না, রাত হয়েছে, এবার পালাই।

সমরেশ একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলে, যাবে? চলো তোমায় খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুমিত্রা টের পায়, হঠাৎ সে মন স্থির করেছে।

তার রহস্যময় রূপান্তরের কারণ আজকেই সে তাকে সব খুলে বলবে।

সুমিত্রা বলে, চাও তো আরও খানিকক্ষণ বসতেও পারি। এত রাতে বাড়ী ফিরে আবার—

: তা হোক, কথা বলতে বলতে এগোই চল।

প্রীতিকে খুশী করে তারা বার হয়, পথে নেমে সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, বাড়ী পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে কষ্ট হবে?

: আমার কষ্ট হবে? খুব মিষ্ট ভদ্রতা শিখেছ তো আজকাল! নিজের কষ্ট হবে কি না তাই বলো!

সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে গভীর আপশোষের সঙ্গে যোগ দেয়, দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি চেহারাই যে করছ দিন দিন! অসুখ বিসুখ হয়নি তো? তুমিও লুকোচ্ছ না তো?

: না, অসুখ হয়নি।

: হতে কতক্ষণ! রোগ তো ওৎ পেতেই আছে। দাদা কি ভাবতে পেরেছিল এমন একটা বিষম রোগ ধরবে? তুমি কিন্তু সাবধান! তোমার মত রোগা দুর্ব্বল মানুষকেই কিন্তু সহজে কাবু করে।

: আমাদের বংশে কারো কখনো ছিল না।

: এটা কি বংশগত রোগ নাকি? এত লেখাপড়া শিখে তোমরাও যদি—

: একটা ধাত থাকে!

: বংশগত ধাত? কি যে বলে! ধাত যদি বলতে চাও তো বলো অপুষ্টির ধাত, দুর্ব্বলতার ধাত, বেশী খাটুনীর ধাত।

সমরেশ চুপ করে হাঁটে।

সুমিত্রা বলে, আমাদের বংশে কারো ছিল নাকি? বাজে খেয়ে কম খেয়ে বেশী খেটে দাদাই ধাত তৈরী করেছিল।

তার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ কিন্তু সমরেশ তোলে না, একেবারে অপ্রত্যাশিত কথা বলে।

জিজ্ঞাসা করে, একটা চাকরি করবে?

সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে বলে, চাকরি? পেলে তো এক্ষুনি করি।

দাদার শরীরের জন্য নিজেই পড়া ছেড়ে দিলাম—আমার এই বিদ্যা নিয়ে কি চাকরী হয়?

সমরেশ বলে, আপিসের চাকরী নয়, বেশী বিদ্যা দরকার হবে না। একটি ছেলে আর মেয়ের গার্জেন টিচারির কাজ। সারাদিন থাকতে হবে কিন্তু—রাত্রে পড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে ছুটি পাবে। মাইনে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ, পরে ঠিক করবে।

: নেব কাজ। কাদের বাড়ী?

: আমরা বলি মিত্র সায়েব। বড় চাকরী করে।

সুমিত্রা জোর দিয়ে বলে, বড় চাকরি করুক আর ছোট চাকরিই করুক আমার মাইনে আর ভাল ব্যবহার পেলেই হল!

কুমারের মার মনটা বিগড়ে যায়।

এত বড় মেয়ে। ভাইকে একটু রেহাই দিতে সে ভোর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পরের বাড়ী কাটায়! উপকার করতে চেয়ে তাকে এমন আঘাত হানল সমরেশ।

খুব নীচু দিয়ে উড়ে যায় প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটা। কী প্রচণ্ড আওয়াজ! দিগন্ত যেন কাঁপছে।

কুমারের মার বুকটা ধরাস করে ওঠে। ধড়ফড়ানি যেন বাড়তে থাকে উড়োজাহাজটার মাথার উপরে আসা পর্য্যন্ত আওয়াজ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ছেলের জন্যই কড়ায়ে খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কয়েক টুকরো আলু আর পেঁয়াজ। তপ্ত তেলে নয়, নিরামিষ উত্তপ্ত ঘিয়ে।

ঝাল মশলা দিয়ে আলু পেঁয়াজের ঝোল তৈরী করে তাতে সেদ্ধ ডিম দু'টো ছেড়ে দেবে।

হয়ে গেল কুমারের প্রধান খাদ্য রান্না। কী বিচ্ছিরি খাওয়াই সে খেতে শিখেছে ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়ে।

গন্ধে বমি আসে। তবু যত্ন করে রাঁধতে হয়। তার ছেলেই তো খাবে?

বেচারা করবে কি? সুমিত্রা মিত্র সাহেবের বাড়ীতে খাওয়া আর পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনে চাকরী নিয়ে জোর করে কুমারকে রোজ দু'টো ডিম আর একপো দুধ খেতে বাধ্য করেছে।

কুমারের মা নিজেও জানে না খুন্তি নাড়া স্থগিত করে কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে পুরানো বাড়ীর ছোট উঠানের ধারে শুকনো মৃতপ্রায় তুলসী গাছটার বাঁধানো মঞ্চের গা-ঘেঁষে।

বুক কাঁপছে কিন্তু সম্মোহিতা হয়ে চেয়ে আছে আকাশের ওই ঝক ঝকে রূপালি রহস্যময় গতিশীল বিভীষিকার দিকে।

ওই উড়োজাহাজটা মুখ থুবড়ে আছড়ে যদি পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় মিত্র সায়েবের ঘর ঘরবাড়ী?

সুধা খরচ দিয়ে এখানে থেকে কলেজে পড়ে। সামনে পরীক্ষা। প্রাণপণে পড়তে পড়তে সুধা তবু টের পায় এত কষ্টে ধরানো উনানে জরুরী রান্না চাপিয়েও মায়াময়ী বোধ হয় অন্য ভাবে আনমনা হয়ে ভুলে গেছে রান্নাবান্নার দায়।

কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারে না কোন চিন্তা তাকে আনমনা করে দিয়েছে। ওই উড়ো জাহাজটা আছড়ে পড়ে সপরিবারে মিত্র সায়েবদের সঙ্গে সুমিত্রাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে—এই উদ্ভট কল্পনা যে কামনা হয়ে মায়াময়ীর মস্তিষ্কে পাক দিচ্ছে এটা পৃথিবীর সেরা মনস্তত্ত্ববিদ বলে দিলেও বোধ হয় সুধা বিশ্বাস করত না!

কড়ায়ে জল দিয়ে খুন্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে সুধা ডাকে, কাকীমা, কী সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে তোমার তরকারী থেকে !

আওয়াজ চরমে তুলে উড়োজাহাজটা দেড় মাইল দূরের ঘাঁটিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে নিশ্চয় ।

কোথাও আছাড় খেয়ে পড়ে জ্বলে উঠলে আগুনের শিখা এখান থেকে নিশ্চয় দেখা যেত ।

তেরো

ঠিক কুমার যা বলেছিল।

ভবানী যদি দায় নেয় আর হাল ধরে তবেই সে নতুন কারবার ফেঁদে চালাতে পারবে, পয়সার মুখ দেখবে।

চোখ কাণ বুজে যদি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে ভবানীর নির্দেশ আর উপদেশ।

কিছু কিছু পয়সা আসছে।

দৈনিক দু'বেলা হাঁড়ি চড়ানোর ভাবনা মিটেছে। আপনা থেকেই যেন বাতিল হয়ে গেছে তার ভিটামিন-যুক্ত শাক খাওয়ানোর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা—মাছ মাংস ডিম আর সবচেয়ে দামী তরকারী রান্না হচ্ছে, ভাজা ছেঁচকি চচ্চার হচ্ছে, সিদ্ধ হচ্ছে পোড়া হচ্ছে, দই দুধ মিষ্টান্নও বাদ যাচ্ছে না।

কী অপচয়!

লক্ষ্য করে শিউরে উঠে সমরেশ প্রায় ক্ষেপে যায়।

বলে, থালায় বাসনে নর্দমায় যদি ভাত তরকারী ফেলা হয়েছে দেখতে পাই, সাতদিন বাজার বন্ধ থাকবে। সবাই আবার শাক-ভাত খাবে।

প্রীতি ঝংকার দিয়ে বলে, আমায় অত ভয় দেখাস নে। আমি আর তোর ঘাড়ে খাচ্ছি না।

সমরেশ রেগে বলে, তাই তো সবাইকে বিগড়ে দিচ্ছিস। কি বিশ্রী স্বভাব যে তোর হয়েছে আজকাল।

: চাকরানীর মত না চললেই যেন খারাপ হয়ে যাই, না ?

: নিজেই তো তুই দায় নিয়েছিলি ? এতকাল চালিয়ে এসেছিলি ? বিরাম খোরপোষ পাঠায় বলেই সব বাতিল হয়ে গেল ! নতুন কারবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি বলেই তুই সংসারে এমন ছয়লাপ চলতে দিবি ?

: ছয়লাপ কিসের শুনি ? বাবা থাকতে কত সমারোহ হত। তোমার আমলে কিছুই তো নেই। ছোট বোনেরা বড় হয়েছে, গলার হার হাতের চুড়ি মানানসই করে দিতে পারলে না। ওদের মনে কষ্ট হয় না ? দশটা মেয়ের গয়না কাপড় জামা দেখে বাবার জন্য ওদের কান্না পায় না ?

সমরেশ নিষ্ঠুরের মত বলে, মাঝে মাঝে কাঁদা ভাল।

প্রীতি বলে, কান্না পায়, কাঁদেও। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদে কাটানো যায় কি ? মানুষের খিদেতেষ্টাও তো পায় ? একটু হাসিখুসী আমোদ আহ্লাদ করার সাধ আহ্লাদও তো জাগে ?

দেহমন ঝিমিয়ে আসছিল সমরেশের—খিদের তাগিদ সব হিসাব নিকাশ বাতিল করে দিতে চাইছিল। তবু সে প্রাণের জোরে সজ্ঞান থেকে বলে, ভাত, মাছ দুধ চিনি তরকারী ছড়িয়ে নষ্ট করে বুঝি সে সাধটা মেটাবে ?

: ওটা তুই বাজে যুক্তি তুলেছিস্। সব ঘরেই খাবার জিনিষ কিছু কিছু ফেলনা যায়।

: ওই খাবার জিনিষ ফেলনা পেলে কত ঘরের কত মানুষ বেঁচে যায় খবর রাখ ?

: আমার খবর রাখার দরকার ?

রাগে গা জলে যায় সমরেশের, সে চেঁচিয়ে বলে, তোদের মত বেহদ্দ বেহায়া বোধহয় জগতে নেই।

: না থাকাই ভাল। পুরুষ মানুষ, সংসারের দায় ঘাড়ে নিয়ে টানতে পারিস না, লজ্জাসরম তোদেরি ভাল মানায়। আমরা বেহায়া হলে কার কি এসে যায় জগতে?

এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে নি, সংসার চলছে মামার দয়ার দানে। প্রেস করতে লেগেছে অনেক টাকা, এখন পর্যন্ত বাইরের কাজ যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রেস চালু রাখার খরচটাও সব উঠে আসছে না। খান কয়েক বই যা ছাপিয়ে বার করেছে তার খরচ কবে উঠে আসবে তাও জানা নেই।

একেই কি বলে ফাঁদ?

ঝোঁকের মাথায় তাকে দিয়ে ছাপাখানা চালু করিয়ে বই ছাপিয়ে বার করার লাইন ধরিয়ে দিয়ে ভবানী বোধহয় ভুল করেছে—বোধহয় বিপাকে পড়েছে। এ লাইনে তারও কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই—যে কটা কারবার করে সে টাকা করেছে তার সঙ্গে কোনদিন বইএর জগতের কোন সম্পর্কই ছিল না, ছাপাখানার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু লেটার হেড, রসিদ বই ইত্যাদি ছাপিয়ে নেবার।

কোথায় কার কাছে কখন কিভাবে গিয়ে কোন কৌশলে কাজের কন্ট্রাক্ট বাগিয়ে ছাপাখানায় লাভ করা যায় সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না ভবানীর।

কে জানে অবস্থা কি দাঁড়াবে। কে জানে অবস্থা বিবেচনা করে শেষ পর্যান্ত ভবানী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

হয় তো আসল তুলবার আশা হারিয়ে লোকসান দিয়ে চলতে চলতে একদিন তাকেই সে দায়ী করে বসবে যে সে একেবারে অপদার্থ, তার দ্বারা কোনদিন কিছু হবে না।

তার জন্য কিছু করতে যাওয়াই ঝকমারির কাজ।

বলে হয়তো তাকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করে প্রেসটা বেচে দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে।

অনিমার মন রাখার জন্য তার পিছনে টাকা ঢেলে তার একটা হিল্লে করে দেওয়ার ইচ্ছাটাও তো ভবানীর একটা সাময়িক ঝোঁক ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভবানী মুখে আশ্বাস দিয়ে কাজে ব্যবস্থা করে দিলেও তাই সমরেশের চিন্তা ভাবনার অন্ত হয় নি।

তার আতঙ্ক কিছুমাত্র দূর হয় নি।

এদিকে বাড়ীর সবাই ধরে নিয়েছে যে তার আর ভাবনা কি! ভবানী যখন দায় নিয়েছে সমরেশকে দাঁড় করিয়ে দেবার, সংসার চালাবার জন্য শ' পাঁচেক টাকা যখন ইতিমধ্যেই মাসে মাসে আনতে সুরু করেছে আগের অবস্থা ফিরে আসতে আর দেরী কদিন!

অচল অবস্থার সময় প্রীতি যেমন তার পক্ষ নিয়ে সকলের সঙ্গে লড়াই করেছিল, সচল অবস্থা এসে গিয়েছে ধরে নিয়ে এখন সে সকলের পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে সুরু করেছে ঝগড়া।

উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে এসে গলা চড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে সমরেশকে বলে, এ সুযোগ হারাস নে সমু। জীবনে কিন্তু দ্বিতীয় বার এ সুযোগ আর আসবে না।

: কিসের সুযোগ?

: ছেলেমানুষি করিস্ না।

সমরেশ নিজেও প্রেসের কাজ যোগানোর চেষ্টায় প্রাণপাত করছে। মামা যাতে তাকে অপদার্থ বলে বাতিল করতে না পারে।

সারাদিন কাজের ধান্ধায় বাইরে কাটে। বাড়ীতে শুধু সকালটুকু আর রাত্রিটুকু।

মধ্যাহ্ন ভোজনটাও বাইরেই চলে।

আপিস কাছারি কলকারখানা বন্ধ থাকার বিশেষ কোন পরবের দিনে ছাপাখানা বন্ধ থাকলে সে অবশ্য দুপুরে বাড়ীতেই খায়, সারাদিন এক রকম বাড়ী ছেড়ে বার হয় না।

মোটা রকম সলিড রকম ছাপার কাজ দিতে পারার মালিকরা ছুটির দিনে বিরক্ত করলে বড়ই চটে যায়।

ছুটির দিন ওরকম কাজ যোগাড়ের ব্যাপারে ও-রকম কোন লোকের কাছে যেতে ভবানীও তাকে বারণ করে দিয়েছে।

সকালবেলা দু'একটা ইলিশ মাছ কিংবা দু'এক সের সন্দেশ দিয়ে আসতে দু'চার মিনিটের জন্য গেল, সে আলাদা কথা। সনাতনেরা কিংবা আত্মীয়েরা ভুলতে পারে ও-সব কথা, ঝগড়াও তারা করতে পারে ওসব ব্যাপার নিয়ে, সমরেশ শুধু ইলিশ মাছ কিংবা সন্দেশ পৌঁছে দিয়ে দু' একটা মিষ্টি কথার জবাব দিয়ে চলে আসবে।

দেখা পাবার জন্য ভাবতে হবে না। সমরেশ একাই তো আর ইলিশ মাছ আর সন্দেশ উপহার দিতে যাবে না। সমরেশ একাই তো আর চেষ্টা করছে না লাভজনক কিছু বাগাবার জন্য!

দু'চার মিনিটের জন্য দেখা দিতে, উপহার গ্রহণ করতে এবং দু'একটা মিষ্টি কথা বলতে ওরা সকলে প্রস্তুত হয়েই থাকবে।

সমরেশ ওসব নিয়ে না গেলেই বরং ক্ষুন্ন হবে।

ছুটির দিন সমরেশ বাড়ী ছেড়ে বার হয় না।

সংসার চালানোর ব্যাপার নিয়ে প্রীতির সঙ্গে তার আজকাল চলে অবিরাম কলহ।

কে জানত সমরেশের মনের খেদ এমনভাবে জমতে জমতে বোমার মত ফেটে পড়বে স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ ছুটির দিনে।

রান্নার সমারোহ করেছিল প্রীতি।

কখন পয়সা বাগিয়েছে, কাকে দিয়ে বাজার করিয়েছে, কাকে দিয়ে সওদা আনিয়েছে সে-ই জানে। সকাল থেকে মহাসমারোহে সুরু হয়েছে বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজ।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই প্রীতি নিজে থেকে তাকে জানায়, আরে না, যা ভাবছিস তা নয়। শুধু পোলাও আর মাংস করব—পাঁচ রকম ভাজি নয়, শুধু মাছ ভাজা। পাঁচ রকম ভাজাটাজা করে মাছের কালিয়া করতে আজকাল কত খরচ লাগে বুঝি না আমি? সব রকম ভাজা বাদ, কালিয়া বাদ—শুধু—মাছ ভাজা।

: তোর টাকায় এসব হচ্ছে?

: আমার টাকায় হবে কেন? আমি আনিয়েছি সব, তুই আমায় মিটিয়ে দিবি।

সমরেশ রেগে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, বিয়ামের কাছে খোরপোষ আদায় করে দেখছি মস্ত হিসেবি হয়ে উঠেছিস—একেবারে লাট-গিন্নীর মত হিসেবী?

প্রীতিও রেগে বলে, বাবা থাকতে আজকের দিনে কত কি রান্না-বান্না হত। আমি তো কিছুই করছি না তার তুলনায়। আমিও তো পাঁচশ টাকা দিচ্ছি সংসার খরচে?

: কিভাবে দিচ্ছিস্? মাস হিসাবে দিচ্ছিস না দিন হিসাবে দিচ্ছিস?

আজ কত খরচ করেছিস হিসেব দিতে সাহস পাবি? আমি মাসে চারশো টাকা ঢালি, পঁচিশটে টাকা দিয়ে তুই যেন মালিকানা পেয়ে গেছিস সংসারের।

: সংসার সামলাচ্ছি না? সারাদিন খাটছি না?

সমরেশ হাত জোড় করে বলে, দয়া করে তুই আমাকে রেহাই দে। তোকে সংসার সামলাতে হবে না, পঁচিশ টাকা দিয়ে পাঁচশো টাকার দায় ঘাড়ে চাপাতে হবে না—দয়া করে তুই হাত গুটিয়ে চুপচাপ থাকলেই আমি স্বস্তি পাব, সংসারটাও স্বস্তি পাবে।

ঝগড়া কতবার চরমে উঠেছে,—কতবার সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে কত অকথ্য অপমানজনক কথা প্রীতিকে বলেছে—রেগে কেঁদে প্রীতিও তাকে কী তীব্রভাবেই ধিক্কার জানিয়েছে।

আজ প্রীতি ঝগড়া করে না।

শুধু বলে, তোর বাড়ীতে আমি আর থাকব না।

বলে, এক কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রণতি মুখ বাঁকিয়ে বলে, রাগের কি বহর, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন! কোথায় যাবি, কার কাছে থাকবি?

সুমতি বলে, পাড়ায় কারো বাড়ী গিয়ে বসে থাকবে—রাগ পড়লেই ফিরে আসবে।

পোলাও মাংস রান্না করা বাকী থাকে না। মস্ত বড় রুই মাছের খণ্ডগুলি প্রীতি শুধু ভাজা করে দিয়ে খরচ বাঁচাবে ঠিক করেছিল—অনেক আলু পেঁয়াজ মশলা সহযোগে সেগুলো দিয়ে শেষ পর্যন্ত কালিয়া রান্না করা হয়।

রাগে গা জ্বলে যায়, সেই সঙ্গে সমরেশের মনে হয় যে তার মত বোকা বোধহয় জগতে নেই। অপচয় আর বাড়তি খরচের জন্য ওদের

সঙ্গে বকাবকি না করে সোজাসুজি ওসব খরচ দিতে অস্বীকার করলেই চুকে যেত।

টাকা তো থাকে তার কাছে।

এদিকে বকাবকি করবে আবার খরচগুলি সব চোখকাণ বুজে জুগিয়েও যাবে, তবুও নিজেদের স্বভাব ওরা নিজে থেকে শুধরে নেবে ওরা কি তেমন মানুষ!

ওরা তো জানিয়েই দিয়েছে ভাল খাওয়া ভাল পরা ওদের ন্যায্য অধিকার, উচিত পাওনা।

কিন্তু প্রীতি কি সত্যই রাগ করে চলে গেল, তার বাড়ীতে সত্যই আর থাকবে না? অথবা সুমতির কথাই ঠিক, রাগ কমলে ফিরে আসবে?

বেলা বাড়ে। মহাসমারোহে ভোজ খাওয়া হয়। সমরেশ শুধু ডাল তরকারী আর একটুকরো মাছ দিয়ে সাদা ভাত খায়। সে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে তার মত গরীব মানুষের পেটে পোলাও মাংস সইবে না।

প্রণতি খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল, এটা তোমার খেয়াল-খুসীর কথা!

প্রীতি বাড়ী ফেরে বিকালে।

ততক্ষণে সকলেই তার জন্য রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে সুরু করেছিল। সমরেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সকলের চেয়ে বেশী—কারণ, তারই কেবল বার বার মনে পড়ছিল যে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন প্রীতির নয়, বিয়ের কিছুদিন পরেই স্বামীর সঙ্গে তার চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

কে জানে ঝোঁকের বশে সে কি কাণ্ড করে বসবে অথবা করে বসেছে!

জরুরী না হলেও একটা কাজে বার হওয়া দরকার ছিল, প্রীতি না ফেরা পর্য্যন্ত সে বার হতে পারছিল না।

প্রীতিকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

প্রণতি খুসীর স্বরে বলে, রাগ পড়তে এতক্ষণ লাগল মেজদির?

প্রীতি গম্ভীর মুখে নির্ব্বিকার ভাবে বলে, রাগের কি আছে? সমু আমায় পছন্দ করে না, ওর বাড়ীতে আমি শুধু ঝন্‌ঝাট বাধাই—আমি তাই অন্য যাগায় থাকবার ব্যবস্থা করে এলাম। জিনিষপত্র কটা নিতে এসেছি।

শুনে সকলের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

অন্য যাগায় থাকার ব্যবস্থা করে সে জিনিষপত্র নিতে এসেছে!

সমরেশ নরম স্বরে বলে, কেন পাগলামি করছিস? কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি হলেই কি একেবারে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়?

প্রীতি তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে বলে, তুই নিজেই তো বলেছিস আমি নাক না গলালে তুই স্বস্তি পাবি, তোর সংসার স্বস্তি পাবে। পঁচিশ টাকা খাই-খরচা দিয়ে পাঁচশো টাকার সংসারের ব্যাপারে নাক গলানো সত্যি আমার উচিত হয় নি।

প্রীতির গলা কেঁপে যায়।

: কিন্তু করব কি বল্? ওই হল আমার স্বভাব—চিরকালের অভ্যেস। নাক না গলিয়ে আমি পারব না। হাত পা গুটিয়ে ঠুঁটো হয়ে থেকে খাব আর ঘুমোব, আমি তা পারব না। তার চেয়ে তোরাই স্বস্তি পা, আমি বিদেয় হই।

সংযম বজায় রাখা আর সম্ভব হয় না প্রীতির পক্ষে, এবার সে কেঁদে ফেলে।

বলে, আমি একলা মানুষ, একটা পেটের ব্যাপার—যেখানে থাকি চলে যাবে।

সমরেশ বিচলিত হয়ে প্রায় করুণ সুরে বলে, কী এমন বলেছি তোকে আমি? শুধু বলেছি বাড়াবাড়ি করিস না। এখনো তো কিছু করতে পারি নি, বড়লোক হয়ে যাই নি? দুটো দিন সবুর করতে বলেছি।

ঃ তোর সাথে আমার বনবে না।

বাইরে থেকে গাড়ীওলার তাগিদ আসে।

জিনিষপত্র নিয়ে যাবার জন্য প্রীতি ট্যাক্সিতে আসে নি, ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীতে এসেছে।

প্রীতি বলে, যাক গে, ঠিকঠাক যখন করেই এসেছি, চলেই যাই। হাসিমুখে যেদিন বাবার সংসারের ব্যাপারে আমাকে নাক গলাতে দিতে পারবি সেদিন ডাকিস, ফিরে আসব।

সুমতি সুনীতিরা প্রায় একসঙ্গে কলরব করে উঠে একই প্রশ্ন করে, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? কোথায় থাকবে ঠিক করে এলে?

প্রীতি একটু হেসে বলে, নিজের লোকের বাড়ীতেই যাচ্ছি। আপন জনের বাড়ীতে।

সমরেশ প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ আমাদের জানাবে না?

প্রীতি হাসিমুখেই বলে, পাগল হয়েছিস? আমি কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করছি? আমাদের দু'নম্বর মামীর বাড়ীতে গিয়ে থাকব। খরচ দিয়েই অবশ্য থাকব।

রাগ করে ভায়ের বাড়ী ছেড়ে নন্দিতাদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেবে! নন্দিতা অবশ্য সম্পর্কে মামী হয় প্রীতির—কিন্তু মামাকে সে

ত্যাগ করেছে। স্বামী-ত্যাগিনী দু'জনের মধ্যে কেমন মিল হবে কে জানে!

আবার বাইরে থেকে তাগিদ আসে গাড়োয়ানের।

প্রীতি একলা মানুষ কিন্তু তার মালপত্র কম নয়। ধনী বাপের ছেলের সঙ্গে মহিম মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, উভয় পক্ষ থেকে প্রীতি ট্রাঙ্ক সুটকেশই পেয়েছিল ডজনখানেক।

একটা ঘোড়ার গাড়ীতে কি আঁটবে তার জিনিষপত্র?

প্রীতি বলে, না না, সব জিনিষ নেব না। শুধু একটা বাক্স, একটা সুটকেশ—বিছানা আর টুকিটাকি জিনিষ। চিরদিনের জন্য যাচ্ছি নাকি আমি বাপের বাড়ী ছেড়ে?

বেশী রাত্রে নন্দিতা আসে।

সমরেশকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভেবো না। কিছুকাল থাক না আমার কাছে? বেচারার জীবনে পরের সংসার নিয়ে মেতে থাকা ছাড়া কোন রস কষ বৈচিত্র্য নেই।

: জ্বালিয়ে মারবে।

: না। আমায় বাঁচাবে, মাকে বাঁচাবে। সংসারের সব ঝন্‌ঝাট ঘাড়ে নেবে। আমি জানি তো ওকে।

: খরচ বাড়িয়ে দেবে দশগুণ।

: পারবে না। স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে তোমার মামা আর চাইলেই আমায় আবোল তাবোল টাকা দেয় না। মাসিক বরাদ্দের এক পয়সা বেশী দেবে না। শুনে কি বলল জানো? সব পুরুষেরাই নাকি এক ছাঁচে গড়া, যত না দিয়ে পারে। সেইজন্য মায়া মমতা না করে যত পারা যায়

আদায় করে নেওয়া উচিত। দরকার হলে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে ছোটলোকামি করলেও দোষ নেই।

সমরেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তোমরা মেয়েরা ভারি ইয়ে। এতকাল দিব্যি মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিতে পারল, বিরামের কাছ থেকে খোরপোষের টাকাটা পাবে ঠিক হতেই বিদায় নিল। তোমরা মেয়েরা বড় স্বার্থপর।

নন্দিতাও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, মিছে কথা বোলো না; প্রীতি কোনদিন মুখ গুঁজে কাটায় নি—হৈ চৈ করেই কাটিয়েছে। তোমার অবস্থা যখন কাহিল হয়েছিল তখন বরং সামলে সুমলেই চালিয়েছে। অবস্থা ফিরেছে অথচ তুমি ওকে এতটুকু হৈ চৈ করতে দেবে না—এটা ওর সইল না।

: অবস্থা ফিরেছে নাকি আমার ?

: ফিরেছে বৈকি। এখন তুমি একটা ছাপাখানার মালিক, মস্ত বড় প্রকাশক।

সমরেশ হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

কথাটা অবশ্য ঠিক।

নিজে সব টাকা দিলেও ভবানী কিন্তু সত্যই ছাপাখানা বা প্রকাশনীর কোন রকম মালিকানা নিজের নামে রাখে নি—তাকেই মালিক করে দিয়েছে সব কিছুর।

সে রাজী না হলে ছাপাখানা বা প্রকাশনী বিক্রী করার ক্ষমতাও ভবানীর নেই।

শুধু তাই নয়।

ইচ্ছা করলে ভবানীকে সে ছাপাখানায় ঢুকতে পর্যন্ত না দিতে পারে, ঢুকলে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারে।

পারে বটে কিন্তু ভবানীকে বাদ দিয়ে একলা দাঁড়াবার কল্পনা করার সাধ্য কি তার আছে?

শুধু তাই নয়।

পনের হাজার টাকার একটা বণ্ড ভবানী তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে প্রেস দেবার আগে।

প্রেস চলে না। বই চলে না।

ভবানীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সমরেশ আশঙ্কা করেছিল, তারই যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায় একদিন।

বছরখানেক পরে।

হপ্তায় দু'তিন দিন দু'এক ঘণ্টার জন্য প্রেসে আসত, কাজকর্মের হিসাব জানত আর ব্যাপার বুঝত—প্রায় নিয়মিতভাবে।

মাস দু'ই সে প্রেসে আসে না।

সমরেশ মাঝে মাঝে পরামর্শ চাইতে কিম্বা এমনি দেখা করতে গেলে পরামর্শ দিতে কিম্বা প্রেসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না।

মাঝে মাঝে একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বলে, কতদিকে মাথা ঘামাবো বল? আমার কি একটা দায়? সব ঠিকঠাক করে দিলাম, অ্যাদ্দিন দেখিয়ে শুনিয়ে শিখিয়ে দিলাম, এবার নিজে চালিয়ে যা!

মুখে সে যাই বলুক সমরেশের টের পেতে কষ্ট হয় না যে প্রেসের জন্য মাথা সে ভাল করেই ঘামাচ্ছে!

প্রেসের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে তার যে বৈরাগ্য জন্মেনি সেটা জানা যায় কুমারের কাছে থেকে।

নিজে এসে সমরেশের কাছে ব্যাপার বোঝার বদলে সে কুমারকে তলব করে নিয়ে গিয়ে তার কাছে ব্যাপার জেনে নেয়।

প্রকাশ্যভাবেই করে, কোন রকম গোপনতা চালায় না।

প্রেস ও প্রকাশনীর কাগজ-কলমে মালিক সমরেশের কাছে নোট পাঠায় যে কুমার যেন এতটা বেজে এত মিনিটের সময় তার সঙ্গে আপিসে গিয়ে দেখা করে।

কুমার যথাসময়ে দেখা করতে যায় ভবানীর সঙ্গে, সমরেশ যায় মামা বাড়ীতে অণিমার সঙ্গে কথা বলতে।

সর্বদা ব্যবহার করে তার সাহেবী পোষাক দু'টির চাকচিক্য নষ্ট হয়ে এসেছিল, ক্রমে ক্রমে সে টের পেয়েছিল যে এই পোষাকে সাধারণ একটা ছাপাখানা আর সাধারণ বাংলা বই ছাপার কাজ তদারক করতে যাওয়ার মানে হয় না।

কিছুদিন থেকে সে দেশী বেশেই প্রেসে আসছিল।

ভবানী শুধু জিজ্ঞাসা করছিল, পোষাক ছাড়লি কেন?

: ছাড়ি নি, তুলে রেখেছি। কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে পোষাক পরেই যাই। প্রেসে ও পোষাকে এসে কি হবে? প্রেস খুব বড় হোক' বইগুলো চলুক—তখন ওই রকম পোষাক পরে আসব।

ভবানী আর কিছু বলে নি।

সময় অসময় হিসাব না করে যখন সে যাক অণিমা খুসী হয়ে বলে, এসো ভাগ্নে, এসো। কাজের সময় কাজ ফেলে এলেই সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রমাণ পাই কিনা যে সত্যিকারের টান আছে!

: তোমার টানের মান যে ওদিকে রাখতে পারছি না ছোটমামী!

সরমাকে সে শুধু মামী বলত, নন্দিতাকে বলে নতুন মামী। অণিমার ছোটমামী নামটা তার জন্যই চালু হয়ে গেছে।

অণিমা বলে, তাই মুখ এমন শুকনো? ব্যাপারটা কি শুনি?

সমরেশ বলে, তুমি তো মামাকে দিয়ে ব্যবস্থা করিয়ে দিলে। আমি

যে এদিকে চালাতে পারছি না? উন্নতি করা দূরে থাক, লোকসান দিয়ে যাচ্ছি। মামা বোধ হয় আর টানবে না, অপদার্থ বলে এবার আমাকে বাতিল করে দেবে।

অণিমা একটু হেসে বলে, ইস্, বাতিল করে দিলেই হল! আমাকেও তাহলে বাতিল করতে হবে।

: কিন্তু মামাই বা এভাবে কদ্দিন টানবে বল? আমি যে পারছি না সে দোষ তো মামার নয়। মামা অনেক করেছে।

: ছাই করেছে। এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া কেন যা চলে না, তোমার মত চালাক চতুর খাটিয়ে ছেলে প্রাণপণ করেও যা চালাতে পারে না! কে পায়ে ধরে বলেছিল ছাপাখানা করে দিতে? অন্য কোন ব্যবস্থা করে দিলেই হত!

: মামা তো ভাল ভেবেই করেছে।

: ভাল ভেবেই করুক আর মন্দ ভেবেই করুক, দায় যখন নিয়েছে তখন তোমার জন্য ভাল কিছু করতেই হবে। তুমি বোকা হাবা আলসে হলে বরং কথা ছিল, যাই করে দেওয়া হোক, তুমি চালাতে পারবে না। তাতো আর নয়! ছাপাখানা না চলে, ছাপাখানা উঠিয়ে দিয়ে অন্য ব্যবস্থা করে দেবে।

সমরেশ খানিক্ষণ বিমূঢ়ের মত অণিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভবানীর উপর এত জোর অণিমার? অথবা এ শুধু ছেলেমানুষী বুদ্ধি?

মনের আক্ষেপটা প্রকাশ করেবে কিনা সমরেশকে একটু ভাবতে হয়। অণিমাকে কথাটা শোনানো মানেই নিকের স্বার্থে ঘা মারা—তার জন্য ভবানীর ওপর জোর খাটাতে অণিমা হয় তো ভড়কে যাবে!

পরক্ষণে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সমরেশ বলে, আমি কি ভাবছি জানো? আমার জন্য শেষকালে মামা না তোমার ওপর চটে যায়!

অণিমা একটু হেসে বলে, চটে গিয়ে আমার কি করবে? দিদিটা ছিল বোকা, নিজের মনে গুমরে মরত আর শরীর মন খারাপ করে বিষের বড়ি খেত। নিজে একটু শক্ত হলেই নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাতে বসাতে পারত না মানুষটাকে?

সমরেশ অভিভূত হয়ে শোনে। সরমা নয় নরম ছিল, নন্দিতার মত শক্ত মেয়েও তো হার মেনে পালিয়ে গিয়েছিল।

অণিমা কি নন্দিতার চেয়েও শক্ত মেয়ে? নাকে দড়ি দিয়ে ভবানীকে ওঠাবার বসাবার ক্ষমতা সত্যই কি তার আছে?

অথবা এ শুধু তার ছেলেমানুষী অহঙ্কার?

অণিমাও স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে।

আর সে হাসে না।

সহজ সুরেই বলে, তুমি হলে ভাগ্নে মানুষ, তোমায় বলা উচিত হত না। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার জন্যে তোমার রীতিমত ভাবনা হয়েছে। না বলে তাই পারলাম না। পরশুর ব্যাপারটাই বলি, চালাক আছো, আসল ব্যাপার বুঝে নেবে।

সমরেশ ভাবে না জানি কি গুরুতর কথাই অণিমা তার কাছে ফাঁস করবে। অণিমা যা বলে তা শুনে তার ছেলেমানুষী অহঙ্কার সম্পর্কেই তার ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

: পরশু কি কাণ্ড হয়েছিল জানো? তোমার মামা তো বাইরে থেকে খেয়ে টেয়ে টইটম্বুর হয়ে অনেক রাতে বাড়ী ফিরল। আমি কিছুই বললাম না,—বলে লাভ কি? শুধরে তো আর নেওয়া যাবে না মানুষটাকে, কিছু বলতে গেলেই ঝগড়াঝাটি, অশান্তি। আমি শুধু জিগ্‌গেস করলাম, এত রাত হল যে? একটা জবাবও দিল না। কী গোমড়া মুখ! পোষাক ছেড়ে বাথরুম ঘুরে এসে বসার ঘরে বসে ভুবনের

মাকে হুকুম দিল পেগ আনতে। ভুবনের মা তো ভয়ে কেঁপে অস্থির। ও বেচারা কি পেগ দিতে জানে? আমিই গিয়ে একটা পেগ দিলাম।

সমরেশ আশ্চর্য্য হয়ে বলে, পেগ দিতে তুমি শিখলে কোথায়?

অণিমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, এখানে এসে শিখলাম—তোমার ছোট-মামী হবার পর শিখলাম। দু'এক মাস চেয়ে চেয়ে দেখলাম যে মানুষটা পেগ চাইলে পেগ দিতেই হবে—নইলে নিস্তার নেই। পেগ দিত বলেই তো আগেকার ওই সুন্দরী রাঁধুনীটা সংসার খরচের টাকা থেকে মাসে দু'তিন শ' টাকা চুরি করতে পারত—দিদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেও টিঁকে থাকতে পারত। দিদি কতবার জবাব দিয়েছে সুন্দরীকে, তোমার মামা একথা ওকথা বলে কাজে বজায় রেখেছে। নইলে এমন আস্পর্দ্ধা হয়? দিদির সঙ্গে কথা মুখে মুখে সমানভাবে কথা কইতে সাহস পায়? আমি এসে দু'মাস ব্যাপার বুঝলাম—তৃতীয় মাসে ওকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিলাম।

সরমার মরার দিনের কথা সমরেশের মনে পড়ে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অনেক দামী বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা আসবাবে রক্ষা করা পচা খাবার খেতে দেওয়ার জন্য যেদিন রাগের মাথায় সতেজে সরমা সুন্দরীকে ভর্ৎসনা করেছিল এবং ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে মরে গিয়েছিল।

ভুবনের মা চা খাবার নিয়ে আসায় বাধা পড়েছিল অণিমার কথায়। চা কয়েকটি বিস্কুট আর দু'টি টাটকা সন্দেশ।

ছোটমামার বাড়ীতে একেবারে যেন পাল্টে গেছে চা খাবার খেতে দেবার ব্যবস্থা।

অণিমার নয়া ব্যবস্থা?

অণিমা তার আসল কথায় ফিরে এসে বলে, পেগ দিলাম, গেলাসে একবার চুমুকও দিল না। চোখ পাকিয়ে কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, সারা

দুপুর নাকি পাড়া বেড়িয়ে বজ্জাতি করে বেড়াও? আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মানুষটার মনের ভাব। রাগ না করে তাই বললাম, দুপুরবেলা খালি বাড়ীতেই বজ্জাতি করা সহজ, পাড়ার মেয়ে বৌদের সঙ্গে ভাব করলে কি বজ্জাতি করার সুযোগ মেলে। তোমার মামা কি বললে জানো? মেয়েদের সঙ্গে ভাব কর না ছেলেদের সঙ্গে ফূর্তি কর? শুনেই আমি লাথি মেরে পেগের গ্লাসটা আছড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দিলাম। রাতে পাঁচ ছ' বার ডাকল, কত মিনতি করল, আমি আর সাড়াও দিলাম না। কোথায় শুয়ে ঘুমিয়েছিল কে জানে, শেষরাত্রে দরজায় কী ধাক্কা—দরজা খুলতেই কি করল জান?

সমরেশের কল্পনা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, সে চুপ করে থাকে।

অণিমা বলে, একেবারে পায়ে ধরে বলল, অন্যায় করেছি, এবারের মত মাপ কর।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, তারপর? এইখানেই শেষ হয়ে গেল? পায়ে ধরে মাপ চেয়ে মামা নিজের বিছানায় ঘুমোতে গেল, তুমি নিজের গোসাঘরে ঘুমিয়ে রইলে?

অণিমা রেগে বলে, মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি বোকা-হাবা। একটা মানুষ ওভাবে পায়ে ধরে মাপ চাওয়ার পর গোসা ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমানো যায়?

সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে সমরেশ কোন কুল কিনারা পায় না। শেষরাত্রে নেশা কেটে গেলে ভবানী তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছে—এর মধ্যে স্বামীর ওপর অণিমার বিশেষ প্রতিপত্তির কোন প্রমাণ সমরেশ খুঁজে পায় না।

নেশা করেও নন্দিতাকে বরং ওরকম বিশ্রী কথা বলার সাহস ভবানীর হত না—কোনদিন বলতেও পারে নি।

দুপুরবেলা পাড়ায় একটু এবাড়ী ওবাড়ী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে যাওয়া তো সামান্য কথা, দু'তিন দিন কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসার পরও নন্দিতাকে ওরকম কথা বলতে ভবানী ভরসা পায় নি।

অণিমার কোমলতা আর ছেলেমানুষী আহ্লাদীপনা পছন্দ করে বলেই কি ভবানী তাকে প্রশ্রয় দেয়—অন্যায় কথা বলার জন্য পায়ে ধরে ক্ষমা পর্য্যন্ত চায়?

স্বামীর ওপর তার প্রতিপত্তির এটাই কি আসল স্বরূপ? নন্দিতার সত্যিকারের জোর ছিল—অণিমাকে ভবানী দয়া করে জোর খাটাতে দেয়?

অণিমার ওপর মায়া পড়েছিল, সমরেশের মনে গুরুতর আশঙ্কা জাগে। এই ছেলেমানুষী ভাবালুতা নিয়ে, ভবানীর সখের আদর ও প্রশ্রয়কে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ওঠানো বসানোর ক্ষমতা বলে ধরে নিয়ে, অণিমা কতদিন সামলে চলতে পারবে?

পাড়া বেড়ানো নিয়েই যদি ইতিমধ্যে বিশ্রী তিরস্কারের পালা সুরু হয়ে গিয়ে থাকে, সখের দরদ পাতলা হয়ে এলে ভবানী কি ব্যবহার সুরু করে দেবে কে জানে!

অণিমা নরম সুরে জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছ? বকলাম বলে গোসা হল নাকি?

সমরেশ হেসে বলে, আমি কি মেয়েছেলে যে কথায় কথায় গোসা করব? সরলভাবে একটা কথার জবাব দেবে?

: নিশ্চয় দেব।

: মামার আদর তোমার ভাল লাগে?

: এ আবার কেমন ধারা কথা।

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি একটা কথা কথা ভুল বুঝেছ—মামা

খারাপ ব্যবহার করত বলে প্রথম মামীকে বিষের বড়ি খাওয়া ধরতে হয় নি। মামার আদর সইত না। দু'নম্বর মামীও মামার আদরের চোটেই পালিয়ে বেঁচেছিল—মামার শাসন অসহ্য হয়ে উঠেছিল বলে নয়। তাই জিজ্ঞেস করছি, মামার আদর সইছে তো?

অণিমা হেসে বলে, আমি আহ্লাদী মেয়ে তো, আদরে আমার অরুচি হয় না। আনাড়ি ছোঁড়ার বদলে তাদের আহ্লাদ করতে জানে এরকম পাকাপোক্ত বর পেয়েছি বলেই আমি খুসী হয়েছি ভাগ্নে!

কৃত্রিমতা নয়; তার কথার মধ্যে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি সমরেশকে আরও ভাবিত করে তোলে।

কুমার অনেক আগেই প্রেসে ফিরে একমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল—কাজ নিয়ে এতই যেন সে ব্যস্ত যে সমরেশ ফিরলেও মুখ তুলে তাকাবার অবকাশ নেই।

অথচ নন্দিতার নতুন একটা বই ছাপা ছাড়া প্রেসের কাজ আছে সামান্যই।

: কি করছিস?

প্রশ্ন শুনে তবে কুমার মুখ তোলে।

: তোর মামার বিশেষ হুকুম তামিল করছি।

: আয় চা খেয়ে আসি। ব্যাপার শুনব। আমায় বলা বারণ নয় তো?

কুমার একটু হেসে বলে, তোর মামা অত বোকা নয়। তোকে বলতে বারণ করলে আরও যে বেশী করে বলব সে জ্ঞানটুকু ভদ্রলোকের ভালরকম আছে। আবার চা খেতে দোকানে যাব? চা আনিয়ে

এখানে বসেই শোন না. সব বলছি। জটিল বা গোপনীয় ব্যাপার কিছু হয়, কালের মধ্যে কতগুলি ষ্টেটমেণ্ট দাখিল করার হুকুম হয়েছে।

সমরেশও হেসে বলে, জানিস না আমিই আসল মালিক? ইচ্ছা হলে কালই তোকে ফায়ার করতে পারি? এখানে বসে ওসব কথা বলা যায় না।

তার সতেজ নিশ্চিন্ত ভাব দেখে কুমার একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

: তোর হুকুম শুনেই তবে চলি।

কাছেই চায়ের দোকান। এখন প্রায় ফাঁকা। ঘণ্টাখানেক পরে আফিসগুলিতে ছুটির ঘণ্টা পড়ার পর একটা চেয়ার বা বেঞ্চিও খালি থাকবে না।

মাংসের চপ, মাছের কাটলেট বা ডিমের মামলেট সমরেশ নিয়মিত খায়। বাড়ীতে শুধু শাকান্ন জুটবে বলে নয়। সারাদিন খেটে দেহ মন ভয়ানক রকম ঝিমিয়ে যায় বলে, একটু কিছু খেয়ে না নিয়ে ট্রামে বাসে সার্কাসি কসরৎ করতে করতে ঘরে ফেরার ক্ষমতা থাকে না বলেও বটে।

কুমার বলে, বেশী কিছু বলেন নি। মোট কথা হল—প্রেসটা তুলে দেবেন। এই প্রেস বা পাবলিশিং চালিয়ে গিয়ে আখেরে কোন লাভ হবে না, যা লোকসান গেছে সেটা মেনে নিয়ে তুলে দেওয়াই ভাল। আমি ষ্টেটমেণ্ট দেবার পর তোর সঙ্গে কথা বলবেন। আমায় ভরসা দিয়ে বল্লেন যে তোরও ভাবনার কারণ নেই, আমারও ভাবনার কারণ নেই, আমাকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে চাকরী দেবেন, তোর জন্য অন্য ব্যবস্থা করবেন।

সমরেশ ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, নতুন ব্যবস্থা কি করবেন বললেন?

: কি করবেন নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছেন নতুন ব্যবস্থা করবেন।

সমরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যাক্ গে। কি হয় দেখা যাক। মামার কথার ওপরে তো আর কথা নেই। মামাই তো হাল ধরে সব চালাচ্ছে।

: ভেসে গেলি ?

: বন্যায় ভাসিয়ে নিচ্ছে, করব কি ?

বাড়ী ফিরে সমরেশ জামা কাপড় ছাড়ে না, মুখ হাত ধোয় না, বাইরের ঘরে বসে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যায়।

আগে ছিল, এখন তার নিজস্ব একটা ঘরও নেই। ইচ্ছা করলে নিজের জন্য একটা ঘর সে দখলে রাখতে পারে অনায়াসে, নিজেই সে বাতিল করে দিয়েছে সে ব্যবস্থা।

দোতলাটা ভাড়া দেবার পর।

তার এই উদারতার মূল্য দিতে বাড়ীর মানুষ কিন্তু তার প্রয়োজনের মর্যাদা বজায় রেখেই চলে।

বৈঠকখানায় আজকাল তিনটে বড় বড় বিছানা হয়, তিনজন আশ্রিতা মাসী কাকী আর পিসী নিজের নিজের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সেই বিছানায় রাত কাটায়।

বিছানা পাতা হয় সন্ধ্যা-রাতেই। আজ সমরেশ বৈঠকখানার বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সিগারেট টানছে বলে ঘুমের জন্য বাচ্চাকাচ্চাদের কান্না সুরু হয়ে যায়—তাদের জন্য বিছানা পাতা যাচ্ছে না।

সুমতি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেউ আসবে না কি রে ?

: না।

: জামা কাপড় না ছেড়ে চুপচাপ বসে আছিস ?

: এমনি একটু বিশ্রাম করছি।

তারপর সবাই পরামর্শ করে সুনীতিকে পাঠায় তাকে ধাতস্থ করার জন্য।

সুনীতি একটু ভয়ে ভয়েই বলে, খাবে না দাদা? তোমার ভাত রুটি বেড়ে রেখে দেব ?

কাঁপা গলায় প্রশ্ন করার মধ্যে তার ভয় টের পেয়ে সমরেশ সত্যই ধাতস্থ হয়, চিন্তাজগত থেকে নেমে এসে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করে, তোরা খেয়েছিস ?

: বাচ্চারা খেয়েছে। তোমায় দিয়েই আমরা খাব। এবরের বিছানা পাতবো তো ?

: পাত। আমার জন্য মিছিমিছি বসে থাকিস কেন বল্ তো তোরা? খেয়ে নিলেই হয়।

: তুমি বেরোলে আমরা আর বসে থাকি না। আজ তুমি বাড়ী আছো, তাই।

সকলে ভেবেছিল মেজাজ বুঝি খারাপ হয়ে আছে সমরেশের, কিন্তু এবার যেন তাকে বেশীরকম ধীর আর শান্ত মনে হয়। সকলের সঙ্গে নরম স্বরে কথা বলে, বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খায়, মুখে হাসিখুসী ভাবের একান্ত অভাবের জন্যই বোধ হয় তাকে একটু অন্যমনস্ক আর একটু গম্ভীর মনে হয়।

সুমতি জিজ্ঞাসা করে, শরীর খারাপ হয় নি তো? একা একা চুপ-চাপ বসে এত কি ভাবছিলি ?

সমরেশ বলে, কি ভাবছিলাম? বিষম একটা সমস্যায় পড়েছি, কি করা উচিত তাই ভাবছিলাম।

প্রণতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ভেবে নিশ্চয় ঠিক করতে পেরেছ কি করবে? তাই তোমাকে এখন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে!

সমরেশ এবার একটু হাসে, ঠিক করেছি কিন্তু তোমরা যেমন ভাবছ তেমন কিছু নয়,—একেবারে উল্টো ব্যাপার। আমার সঙ্গে তোমরাও মজা টের পাবে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

প্রণতিই আবার বলে, একটু জানিয়ে রাখো না ব্যাপারটা, আমাদেরও তো তৈরী হতে হবে মজা টের পাওয়ার জন্য!

: মামার সঙ্গে ঝগড়া করব। নিজে সব ব্যবস্থা করব। মামার মুখ চেয়ে থেকেই আমার কিছু হচ্ছে না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি না। মামা তো শুধু দায় টানছে। আমি উঠি বা পড়ি মামার বয়ে গেল। এবার নিজে সব করব। বছরখানেক তোমাদের সকলকে বেশ একটু কষ্ট করতে হবে।—আগে থেকে জানিয়ে রাখছি।

কেউ কিছু বলার আগে কপাল চাপড়ে সুমতি বলে, আবার আরও বেশী কষ্ট করতে হবে।

পিসী বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সমু! নিজের পায়ে তুই কুড়ল মারতে চাইছিস।

সমরেশ ধীর শান্তভাবে বলে, এতদিনে বরং মাথা ঠিক হয়েছে—এবার ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি। তোমরা ভয় পেয়ো না, মনটাকে একটু শক্ত কর—বাবার সময়কার অবস্থা কোন দিন ফিরবে কিনা জানি না, তবে তোমাদের যাতে কষ্ট না করতে হয় দু'এক বছরের মধ্যে সে ব্যবস্থা আমি করছি!

অন্যেরা চুপ করে থাকে, প্রণতিই যেন সবচেয়ে বেশী ঘাবড়ে গিয়ে বলে, ও বাবা, আরও দু'এক বছর!

সমরেশ বলে, বাজে বই পড়ে শুয়ে বসে দিন কাটাস, তোর সময় কাটতে চায় না। কোন একটা কাজের কাজে লেগে যা—একটা ছুটো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরও পাবি না।

বাড়ীর মানুষদের জন্য বড়ই অস্বস্তি বোধ করে সমরেশ।

তার বাবার ছিল ফলাও কারবারের মোটা রোজগার—কোনদিন কেউ টের পায় নি অভাব অনটন কাকে বলে।

তার আমলে শুধু নাই নাই বুলি।

ছু'এক বছর সে নিজেই সহ্য করতে পারবে কি ওদের আর্তনাদ?

কাজের ধান্ধায় সকাল থেকে অনেক রাত অবধি মেতে থাকবে এইটুকুই যা ভরসা।

পরদিন সকালে প্রায় সকলের আগে প্রেসে যায়। কুমার যথাসময়ে কাজে এলে সে তার সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেয়।

তাকে চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জানায় না, সকলে শুনবে কি শুনবে না গ্রাহ্য না করে তার টেবিলের সামনে বসে জোর গলায় বলে, ষ্টেটমেন্টটা দিচ্ছিস দে, কিন্তু প্রেস আমি ওঠাব না, পাবলিশিংও বন্ধ করব না।

মুখ তুলে পেনের গোড়াটা গালে ঠেকিয়ে কুমার নীরবে চেয়ে থাকে।

সমরেশ বলে, আরও ছু'একবছর চেষ্টা করব, আমার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করব, মামার কথায় উঠব বসব না।

কুমার বলে, ভবানীবাবুকে বলেছিস? রাজী হয়েছেন?

: আজ বলব। রাজী করাব।

তার আত্ম-বিশ্বাসের চরম বহরটা কুমারের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক

মনে হয়। কাল চিহ্ন ছিল না -রাতারাতি তার এমন আত্মপ্রত্যয় গজিয়ে উঠল!

: উনি মানবেন?

: মানবেন।

সমরেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে আবার বলে, তবে মামা যদি তোকে অন্য পোষ্টে নিতে চায়, আমি কোন আপত্তি করব না।

হাতে লেখা স্টেটমেণ্টটা টাইপ করতে করতে কুমার মুখ না তুলে বলে, তোর অন্য ব্যবস্থা হলে তবে তো আমার অন্য চাকরী।

: না, মামা তোকে স্পেশাল চাকরী দেবে। তোর কাজ খুব পছন্দ হয়েছে। সেইজন্যেই তো ষ্টেটমেণ্ট তৈরী করে দিতে আপত্তি করলাম না।

: আপত্তি করবি মানে?

: করতাম—তোর খাতিরে করলাম না। বলেছে যখন, ষ্টেটমেণ্টটা তৈরী কব—খুসী হবে। আমি কি করছি না করছি তার সঙ্গে মামা তোকে জড়াবে না—আরেকটু বেশী মাইনের ভাল কাজে লাগাবে। মাইনে কিছু বেশী দেবে, শুধু খাটিয়ে ছাড়বে না কিন্তু, দায় চাপাবে, দায় মানিয়ে ছাড়বে।

: খাটা বুঝি দায় মানা নয়?

: খাটার দায় নয়, খাটানোর দায়। নিজে খাটবি, সেই সঙ্গে অন্যদের খাটানোর দায়ও খানিকটা মেনে চলবি, ভালভাবে যদি কাজ করতে পারিস—তর্ তর্ করে মামা তোর উন্নতি করে দেবে। দু'চার বছর পরে হয় তো দেখবি তোকে মোটেই খাটতে হচ্ছে না, যারা খাটছে তাদের ভাল রকম খাটিয়ে নেবার বুদ্ধি খাটাবার জন্য মাসে হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিস।

কুমার হাত গুটিয়ে বলে, সেটা বুঝি খাটুনি নয়? খাটুয়েদের বেশী খাটানোর জন্ত বুদ্ধি খাটানোটা? ওটা চলতি হিসেব নয় তা আমি জানি—মাসে হাজার টাকা মাইনে কেন, খাটুয়েদের রক্ত শুষে দু'চার বছরে লাখপতি হবার কায়দা আমিও জানি।

: মোটেই জানিস না। জানলে কায়দাটা খাটাস না কেন? কেন এরকম খেটে মরিস?

: ও কায়দায় লাখপতি হয়ে লাভ নেই জেনেছি বলে। লাখপতিদের অনুমোদন ছাড়া আজ জগতে কারো সাধ্য আছে নিজের খুশীমত লাখপতি হয়? লাখপতিরা বিপাকে পড়েই বিশেষ বিশেষ দশ বিশ জনের লাখপতি হবার আকাঙ্ক্ষাকে মেনে নেয়। কায়দা করে বেশীর ভাগকে কাবু করে বাধ্য হয়ে দু'চার জনকে লাখপতি হতে দেয়।

সমরেশ বলে, ঠিক, সত্যি কথা। আমিও এসব মনেপ্রাণে বুঝি—বোঝাটা কাজের বেলা কাজে লাগে না সেটাই হয়েছে মুস্কিল। একবার উঠে পড়ে লেগে দেখি কিছু করতে পারি কিনা। না পারলে নয় মরব। আসল দায় তো ঘাড়ে নেই।

: আসল দায়?

: বিয়ে তো করি নি—বৌ ছেলেমেয়ের দায় নেই।

: তাই বল। তুই ধাঁধায় কথা কইতে ভালবাসিস। আমিও তো বিয়ে করি নি—আমারও তবে আসল কোন দায় নেই। কথাটার মানে কিন্তু আমি একদম বুঝলাম না। দায় হল দায়—তার আবার আসল আর নকল কি?

প্রেসটা যাতে তুলে না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে সমরেশ অণিমার কাছে যায় না, সোজাসুজি ভবানীর কাছে দরবার করতে যায়।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি প্রেস তুলে দেবার কথা ভাবছ মামা ?

ভবানী একমুহূর্ত ভেবে বলে, ভাবছি তো, ওটা রেখে আর লাভ কি হবে ? তোর জন্য অন্য কি ব্যবস্থা ব্যবসা করা যায় তাও ভাবছি।

সমরেশ জোরের সঙ্গে বলে, আর কিছুদিন টাইম দাও—আমাকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চালাতে দাও। কোন ব্যাপারে তুমি কোন কথা বলবে না—কোন পরামর্শ পর্য্যন্ত দেবে না। আমি যা করব তাই সই।

ভবানী একটু আশ্চর্য্য হয়েই তার দিকে তাকায়।

তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, ছ'মাস আমি তোর প্রেসের ব্যাপারে কিছুই বলি নি। আমায় অত খেয়ালী ভাবিস না। আমিও ওটা ভেবেছি—আমার কথা শুনে চলার জন্য হয় তো কিছু করতে পারছিস না। ছ'মাস তাই তোকে স্বাধীনভাবে চলতে দিয়েছি। কুমারের কাছে ষ্টেটমেণ্টও চেয়েছি এই জন্য। আগের সঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করে দেখব এই ছ'মাসে কতটা তফাৎ হয়েছে, সামান্য হলেও তুই কিছু করতে পেরেছিস কিনা—

সমরেশ রেগে গিয়ে বাধা দিয়ে বলে, একথাটা জানিয়ে দিলে হত না আমাকে ? এ ছ'মাস স্বাধীনভাবে আমি কিছুই করি নি, তুমি যেমন যেমন বলেছিলে তারই জের টেনে এসেছি।

তাকে এমনভাবে রেগে উঠতে দেখে ভবানী আবার আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমরেশ ধাতস্থ হয়ে বলে, আমায় কিছু না জানিয়ে ছ'মাসের স্বাধীনতা দিয়েছ, আমায় জানিয়ে ছ'মাসের স্বাধীনতা দাও—প্রেস আর পাবলিশিংএর ব্যাপারে দু'এক মাসে কিছু বোঝা যায় না।

: ছ'মাসে তুই কি করবি ?

: লাভ না দেখাতে পারি—প্রেসটাকে সেল্‌ফ্ সাপোর্টিং করে দেব। যে বই ছাপা হয়েছে সে হিসাব ধরতে পারবে না। আমি যাচাই করে বাছাই করে যে বই ছাপব শুধু সে বই-এর বিক্রী থেকে হিসাব কষবে লোকসান যাবে না লাভ হবে।

: বই-এর হিসাবটা কি ভাবে কষব? বই তো প্রেসেই ছাপা হবে। কাগজ আর অন্য খরচ নয় প্রেসের হিসাবে ধরব না—ছাপার খরচের হিসাব তো ধরতে হবে?

সমরেশ হেসে বলে, সে কথাই তো বলছি মামা - প্রেস আর বইয়ের ব্যবসার ব্যাপার তুমি একদম বোঝো না! প্রেসে বই ক্রেডিটে ছাপা হবে, কিন্তু বইটাও তো প্রেসের? বই মার খেলে প্রেসের লোকসান, বই চললে লাভ। একটা বই বাজারে ছাড়ার পর দু'তিন মাসের বিক্রী থেকেই বোঝা যায় মার খাবে না লাভ দেবে। প্রেসের সেল্‌ফ্ সাপোর্টিং হবার হিসাবটা ওই হিসাবে কষবে।

ভবানী অনেকক্ষণ সিগারেট টানে, অনেকক্ষণ ভাবে। বার বার সমরেশের মুখের দিকে তাকায়।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, পারবি তো?

: পারব।

ভবানী ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বলে, বেশ, আরও ছ'মাস আমি টানব। আবার একটা নতুন ব্যবস্থা করার চেয়ে এটা অনেক ভাল। একটা কথা কিন্তু তোমায় দিতে হবে—যদি না পার, আমায় আর জ্বালাতন করবে না।

: নিশ্চয় না।

: ছোটমামীর কাছে গিয়ে কাঁদুনি গেয়ে মন ভুলিয়ে আমায় আর কোনরকম ঝন্‌ঝাটে ফেলবে না।

: নিশ্চয় না। ছোট মামীর কাছে তো আমি যাই নি? ছোট মামীকে তো কিছুই বলিনি? ভেবে চিন্তে আমি সরাসরি তোমার কাছে এসেছি।

ভবানী ভেবে চিন্তে বলে, তুই বরং নিজেই গিয়ে ছোট মামীকে জানিয়ে আয় যে আমি তোকে আরও ছ'মাস টাইম দিয়েছি—সব বিষয়ে তোকে স্বাধীনতা দিয়েছি। তোর ব্যাপার নিয়ে বড বেশী জ্বালাতন করছে আমাকে।

কান লাল হয়ে যায় সমরেশের।

ভবানী হঠাৎ থেমে যায়। আধ পোড়া সিগারেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেলিফোনের নামান রিসিভারটা যথাস্থানে বসিয়ে আরেকটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে সে বলে, তাই ভাল, তুই নিজে গিয়ে জানিয়ে আয় নতুন ব্যবস্থার কথা।

: তুমি কখন বাড়ী ফিরবে মামা?

: আমি? দশটা এগারোটা বাজতে পারে—বাড়ী নাও ফিরতে পারি। তুই কি বুঝবি আমার কত ঝন্‌ঝাট!

ছ'মাসের মধ্যে অচল প্রেসটাকে চালু করতে হবে।

ভবানী এত সহজে যে তার প্রস্তাবে রাজী হবে সমরেশ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

সে ধরেই রেখেছিল যে ছোট মামার সঙ্গে বিষম একটা লড়াই হয়ে যাবে। এত সহজে বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ায় তার নিজের মনটাই যেন খুঁত খুঁত করে।

কে জানে কি মতলব এঁটেছে ছোট মামা!

কয়েকদিনের মধ্যে অণিমার কাছে যাবে না স্থির করেছিল। প্রেসে

ফিরে গিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে বিকাল হয়, প্রেসের কাজ থেমে যায়, কুমার তার ষ্টেটমেণ্ট লেখা শেষ করে ভবানীর কাছে দাখিল করতে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রেসের শূন্যতাই যেন তাকে ঠেলে রাস্তায় বার করে দেয়।

বোঝাই বাসের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সে রওনা দেয় ছোট মামার বাড়ীর দিকে।

অণিমাকে সব জানিয়ে রাখাই ভাল।

কে জানে কি হয়।

সদর গেট বন্ধ ছিল।

বাড়ীর মালিক একমাত্র ভবানী ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই—হোক সে রাজা অথবা মন্ত্রী।

সমরেশ গর্জন করে ধমক দিতেই ভুবনের মা বেরিয়ে এসে দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বলে।

সমরেশকে বলে, আপনার আসা যাওয়া বারণ নেই। কি ধমকটাই সেদিন খেয়েছিলাম আপনাকে দুপুরে আসতে বারণ করে। শোয়ার ঘরেই আছেন।

দরজা খোলাই ছিল।

বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সমরেশ বলে, আমি সমরেশ, একটা কথা বলতে এসেছি। ভেতরে আসব?

: এসো।

অণিমার গলার আওয়াজটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে সমরেশের কাণে!

ঘরে ঢুকেই সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

খাটের মাথার দিকে পাশের দেয়াল ঘেঁষে বসানো টিপয়ের ওদিকে

দু'টি চেয়ার। ওদিকের চেয়ারে বসে আছে অণিমা। চোখে মুখে চেহারায় ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এতক্ষণ সে খালি ঘরে কি কাণ্ড চালিয়ে আসছিল।

টিপয়ে ভবানীর প্রিয় দামী বোতল। একটা সোডার বোতল। দামী কাঁচের গেলাসে টল টল করছে রঙীন পানীয়।

: ভড়কে গেলে নাকি গো ভাগ্নেবাবু? এসো, বোসো। কর্তা খেলে দোষ নেই, গিন্নি খেলেই উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়? দিদি বিষ ধরেছিল। আমি অত বোকা মেয়ে নই। একটা কিছু না ধরলে এ বাড়ীতে কোন মতে বাঁচা যায় না হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছে তোমার মামা।

সমরেশ কথা কয় না। দু' তিন পা এগিয়ে গিয়ে খাটের এদিকের শেষ প্রান্তে বসে শুধু একবার কাসে।

গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে দু'হাতে এলোচুলের গোছা পিছনে ঠেলে দিয়ে অণিমা বলে, অনেক ভেবে চিন্তে এটাই ধরলাম। একটা কোন নেশা না ধরে তোমার মামার ঘর করা সত্যি অসম্ভব। দিদি বড়ি খেত, আমি একদিন খেয়ে দেখেছি—সব দুঃখ কষ্ট ভোঁতা করে ভুলিয়ে দেয়, মনে হয়, আমার চেয়ে সুখী মেয়েলোক তো জগতে নেই।

: বাঁচার আনন্দ ভোঁতা করে দেয় না?

: দেয়। বেঁচে আছি না মরে গেছি টের পাওয়া যায় না। তাই তো ওটা বাদ দিলাম। —তোমরা জ্যান্ত যোয়ান মানুষ, মাসী পিসী বৌদি মামী যেমন হোক একটা সম্পর্ক বজায় রেখে তো চলতে হবে তোমাদের সঙ্গে! তাই ভাবলাম, সতী সাধ্বী স্ত্রী হয়েই যখন জীবন কাটাব, স্বামীর নেশাটা ধরাই ভাল!

মুখে যেন খই ফুটছে অনিমার। অণিমা একটু হাসে।—দামী সভ্য নেশা। নিজে ঢের বেশী খায়, কাজেই আমায় বলতে পারবে না কেন

খাই। সোজাসুজি জবাব দেব—তুমি খাও, মজা পাও, আমি তোমার স্ত্রী, তাই তুমি যা খেয়ে মজা পাও, আমিও তাই খেয়ে একটু মজা পেতে চাই; স্বামী স্ত্রীতে সব ব্যাপারে সমান সমান না হলে জমবে কেন? এ হল নিরুপায়ের উপায়। দেখছি অবস্থা বিশেষে জিনিষটা নেহাৎ মন্দ নয়।

: মামা জানে?

: জানে বৈকি। এ জিনিষ কি গোপন করে খাওয়া যায়? তোমার মামার সামনেই তো খাই—তবে, মাঝে মাঝে খাই। রোজ খাই কিনা, কতটা খাই, ওসব খবর রাখে না।

: মামা আপত্তি করে নি?

: আপত্তি করবে কেন? সভ্য সমাজে মেয়ে পুরুষ একত্র বসে খাওয়ার নিয়ম চালু আছে। আমি তো স্বামীর বাড়ীতে বসে একলা একটু খাই—বড় জোর স্বামীর সঙ্গে বসে খাই।

অণিমা আবার মিষ্টি করে একটু হাসে। কিন্তু হাসিটা তেমন মিষ্ট লাগে না সমরেশের কাছে। মুখের একটা অবর্ণনীয় বিকৃত ভাবের সঙ্গে হাসিটা যেন জড়িয়ে গিয়েছে।

অণিমা বলে, আপত্তি করে নি, একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে। রোজ খেলে নেশা পেয়ে বসে, একটু একটু বেশী খাবার ঝোঁককে প্রশ্রয় দিলে সামলানো যায় না। বাড়াবাড়ি করলে চলবে না, সেটা কোনমতেই নাকি বরদাস্ত করবে না।

প্রথমটা সমরেশের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। চোখের সামনে এই কল্পনাতীত ব্যাপার চলতে দেখে কয়েক বার একথাও তার মনে হয়েছিল যে বোধ হয় সে জেগে নেই—খুব সম্ভব স্বপ্ন দেখছে, এখুনি ঘুম ভেঙ্গে স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে।

সমরেশ তাকে আরও কিছুকাল প্রেস চালিয়ে যাবার খবরটা জানায় কিন্তু চালাতে না পারলে অণিমাকে দিয়ে আর তাকে জ্বালাতন না করার যে সর্ত ভবানী দিয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলে না। এ অবস্থায় অণিমাকে ওসব কথা বলার কোন মানে হয় না—ভবানী ফিরলে হয় তো ওই কথা নিয়েই কি বলবে কি করবে কে জানে!

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে সমরেশ একটু স্বস্তি বোধ করে। খাবার আনতে বলার জন্য ভুবনের মাকে ডেকে পাঠাবার আগে অণিমা গেলাস বোতল খাটের নীচে আড়ালে সরিয়ে রাখে।

ভুবনের মা চলে যাবার পর সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, ওরা টের পায় নি?

অণিমা বলে, সবাই টের পেয়েছে. তবে আমি যে নিজের ইচ্ছায় খাওয়া সুরু করেছি, এটা ওরা জানে না। ওদের ধারণা, তোমার মামার ইচ্ছাতেই আমি খাই। উপায় নেই, করব কি।

সমরেশ বলে, তার মানেই তো পাড়ায় মামার বদনাম রটে গেছে।

অণিমা মুখ বাঁকিয়ে বলে, ছেলেমানুষী কথা বলো না। পাড়ায় কত সুনাম তোমার মামার!

পরদিন নন্দিতার সঙ্গে দেখা হয়।

দেখা হয় প্রেসে। নন্দিতা আরেকটা ছোট বই শেষ করেছে, ছাপতে দেবার জন্য একেবারে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছে।

: তাই বল। এইজন্য কিছুদিন তোমার পাত্তা ছিল না।

: তাড়াতাড়ি ছেপে বার করে দিতে হবে। মনে হচ্ছে এ বইটা খুব ভাল হয়েছে—হিট্ করতে পারে।

সমরেশ পাকা প্রকাশকের মত হেসে বলে, হচ্ছে হচ্ছে, ওসব কথা

হচ্ছে। এসেই কাজের কথা সুরু করলে কি ভাল লাগে? কত কি ব্যাপার ঘটছে চাদ্দিকে, আগে ওসব বিষয়ে কথা বলি এসো?

: কি ব্যাপার ঘটছে চারিদিকে?

: চারিদিকে মানে তোমার আমার জীবনে যা ঘটছে, আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের জীবনে যা ঘটছে।

নন্দিতার কেমন একটা বদমেজাজী ভাব—অস্থিরতার ভাব। শান্ত হয়ে বসবার চেষ্টা করে কিন্তু শান্ত আর শক্ত যেন কিছুতেই হতে পারে না—বিচলিত অবস্থাটা আয়ত্তে আনতে পারে না।

কে জানে কি হয়েছে তার! শরীর ভাল নেই? মন ভাল নেই? নতুন কোন অঘটন ঘটেছে?

সমরেশ প্রায় নির্ব্বিকারভাবেই জিজ্ঞাসা করে, মাঝে মাঝে ছোট-মামার বাড়ী যাও বলেছিলে, তোমাদের নাকি ঝগড়া হয় নি, শুধু ছাড়া-ছাড়ি। ছোটমামীর ব্যাপার স্যাপার কিছু লক্ষ্য করেছ?

নন্দিতা একটু রেগে বলে, জেনে শুনে কেন খোঁচা দাও? জানো যে নিরুপায় হয়ে ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছি—

: কি ব্যবস্থা মেনে নিয়েছ?

নন্দিতা কয়েক মূহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, সত্যি জানো না? কিছু জেনেও জানো না বলার ধাত তোমার নেই জানি। বলতে লজ্জা করছে, তবু বলি। অণিমাকে ঘরে এনে মেতে গিয়েছিল তো মানুষটা, আমার জন্য তেমন মাথা ব্যথা ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু বলত, কেন এরকম করছ, এখানে এসেই থাকো না, অণিমা আছে তিন তলায়, তুমি থাকবে দোতলায়, গণ্ডগোল তো কিছুই নেই! আমি শুনতাম আর হাসতাম। অণিমার জন্য ঝোঁকটা গত কয়েক মাস হল তাড়াতাড়ি

কেটে যাচ্ছিল—কর্পূর উড়ে যাওয়ার মত। কত নিন্দাই যে করত আমার কাছে। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?

: বুঝতে পারছি। কাল বিকালে গিয়েছিলাম, দেখে এলাম ছোট মামী মামার বোতলের মদ চালাচ্ছে। ওকে তো বিয়ে করেছিল রাগের মাথায়, তোমার ওপর ঝাল ঝাড়ার জন্য। খুব মিষ্টি আর চালাক ছিল—তাই মেতে গিয়েছিল। শুধু মিষ্টি আর মেয়েলি চালাকি কদ্দিন মামার মত লোকের ভাল লাগে বল?

নন্দিতা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, তুমি না কাজে ডুবে আছ, হিমসিম খাচ্ছ, আসল ব্যাপার না জেনেও এসব তুমি জানলে বুঝলে কি করে? বেচারাকে বাঁচাবার জন্য কত চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না।

: আসল ব্যাপার আমি আগে থেকেই সব জানি। ছোটমামা আসলে তোমাকেই চায়। আগের মামীকে ভুলিয়ে দেবার সাধ্য কেবলমাত্র তোমার ছিল—নতুন মামীর সে ক্ষমতা নেই।

নন্দিতা সোজা হয়ে বসে বলে, তবে আর কেন ভূমিকা করছি, খোলা খুলি বলেই ফেলি। অনেকদিন ধরে তোষামোদ করে ভয় দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। যেই বুঝলো ওভাবে আমায় ভেজানো যাবে না, অমনি সুর পাল্টে দিল। টাকার দরকার জানিয়ে চিঠি পাঠাই—চেক পাঠায় না।

সমরেশ নীরবে চেয়ে থাকে।

: বেশ মিষ্টি করে চিঠি লিখে জানায় যে একটু অসুবিধা আছে, চার পাঁচদিন পরে চেক পাঠাবে। ক'দিন অপেক্ষা করে আমি গিয়ে তাগিদ দিই, একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ে বলে—ও হো, একেবারে ভুলে গেছলাম, কাজের চাপে মাথা কি ঠিক থাকে? কাল পাঠিয়ে দেব। চেক কিন্তু পাঠাল না। মান খুইয়ে আবার গেলাম

—বলল যে চেক তো সে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ডাকের নিশ্চয় গোলমাল হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ? একটা সাদা খামে ভরে হাজার টাকার বিয়ারার চেক আমাকে পাঠিয়েছে—ঠিকমত পেয়ে গেছি। কতরকম অজুহাত দিয়েই যে ক'দিন ধরে আমায় নাচাচ্ছিল—

সমরেশ ধৈর্য হারিয়ে বলে, আমি সব বুঝে গিয়েছি, আর ফেঁপিও না। শেষ কথাটা বল।

: বলছি।

নন্দিতা খোঁপার দু'তিনটে কাঁটা অকারণে টেনে বার করে আবার যথাস্থানেই গুঁজে দেয়। তার যে এত বড় একটা খোঁপা আছে এটা সমরেশ আজ পর্যন্ত খেয়াল করে নি।

মাথা কিন্তু নীচু করে না নন্দিতা। মাথা উঁচু রেখেই বলে, অনেক ঝগড়া ঝাঁটি হল—

: আগে তো হয় নি?

: আগে যে চাইলেই চেক দিত!

: ওঃ!

নন্দিতা বলে, দু'তিন মাস নাচিয়ে সোজাসুজি প্রাণের কথাটা বলল যে হপ্তায় অন্ততঃ তিন দিন ওর বাড়ীর দোতালায় আমায় দিনরাত কাটাতে হবে—নইলে আমার নামে এক পয়সার চেকও আর কাটবে না। আমি অগত্যা রাজী হয়ে গেলাম। বিয়ে করা স্বামী তো, দেহটার সামাজিক মালিক তো, হপ্তায় তিনটে রাত চোখ কান বুজে সামলে শুমলে মানিয়ে দেব। উপায় কি, নইলে সত্যিই চেক পাব না।

সমরেশ মুখ খুলতে যাচ্ছিল নন্দিতা আঙুল উচিয়ে তার মুখ বন্ধ করে বলে, চেক না পেলে কি বিপদ তুমি জান না।

বলতে চাইছ তো অনেক কিছুই। মার অসুখটা সারে নি, চিকিৎসা চলেছে বলেই কোনরকমে খাড়া আছে—চিকিৎসা বন্ধ হলেই মা কাত হবে। বাবার চোখে কি যেন হয়েছে, অনেক পয়সা খরচ করলে সারতেও পারে, নইলে অন্ধ হয়ে যাবে। চোখ নষ্ট হওয়া মানেই বাবার চাকরী খতম। এদিকে আমার ছাপা হবে না—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, ছোট মামী কিভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা?

: খুব খুশী হয়েছে। বলে, বাবা বাঁচলাম, হপ্তায় তিনটে দিন তো ছুটি পাব, তোমার ওপর দিয়ে ঝনঝাট কেটে যাবে।

নন্দিতা গম্ভীর হয়ে বলে, এটাও একটা যুক্তি ধরতে পার আমার পক্ষে। আমার আরেকটা হিসাব—বেচারাকে খানিকটা রেহাই দিচ্ছি। ওকি সামলাতে পারে? দিশেহারা হয়ে মদ খেতে শিখেছে। এমনি খুব চালাক চতুর কিন্তু আদুরে মেয়ে, নরম মন। আমার গলা জড়িয়ে ধরে কি বললে জানো?—দিদি, আমি কিন্তু একটু হিংসের ভাব দেখাব, একটু রাগারাগি ঝগড়াঝাটি করব, সেটা যেন তুমি সত্যি ধরে নিও না। তুমি যেদিন এসে থাকবে, ওই অজুহাতে আমার কাছে বেশী ঘেঁষতে দেব না। সত্যি সত্যি ছুটি পাব।

সমরেশ বলে, তা হলেই সেরেছে।

: তার মানে?

: মানে তোমার নিজের বোঝা উচিত ছিল। তোমার বোধ হয় দোষ নেই, তোমাদের তো খালি ভাবের হিসাব। তুমি যেদিন গিয়ে থাকো, মামার সেদিন খেয়াল থাকে সে তার তিন নম্বর আরেকটা বৌ আছে, তোমার একটা সতীন আছে? তোমায় নিয়েই মামা মেতে থাকে

না? তুমি গেলে মামা তো নিজেই চাইবে যে ছোট মামী ছুটি নিক, তোমাদের জ্বালাতন না করে চোখের আড়ালেই থাকুক।

নন্দিতা চুপ করে থাকে।

: এর বিপদটা বুঝতে পারছ না? ছোট মামী যখন টের পাবে যে ছুটির জন্য ওসব কলাকৌশলের কোন দরকার ছিল না, তোমায় পেলে মামা ওকে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে—তখন ওর মানসিক অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ভাব ঘুচে গিয়ে শত্রুতা আসবে। অশান্তির সীমা থাকবে না। তারপর ছোট মামী কি করবে তা অবশ্য আমি বলতে পারি না– কিন্তু ভয়ানক কিছু করবেই।

হঠাৎ কিছু বলার ক্ষমতা নন্দিতার ছিল না। কুমার প্রেসের কাজের বিষয়ে দরকারী কথা বলতে আসায় আরও কয়েক মিনিট সে চুপ করে বসে চিন্তা করার সুযোগ পায়।

কুমার চলে যাবার পর বলে, দেখি সামলাতে পারি কিনা। মস্ত একটা বিশ্রী দায় ঘাড়ে চাপল যাক গে, দায় মানতেই হবে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে অনেক উপকার করলে।

সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমায় ভড়কে দিতে চাই নি। না বললেও চলত না। কিন্তু এত ভাবছ কেন? দুশ্চিন্তাকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তা কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফায়েড—এসব অনেক রোগের চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক। আমি নিজে টের পেয়েছি। মরার বাড়া গাল নেই কথাটা সত্যি ভারি খাঁটী কথা। এভাবে বাঁচার সুযোগ না যদি থাকে—এভাবে বাঁচার জন্য লড়াই করার মধ্যে বাঁচার সুখ পাব। আমি বাঁচি কিম্বা আমার ছেলেমেয়েরা বাঁচে।

নন্দিতা বিরক্ত হয়ে বলে, চুপ করো। ওসব বড় বড় কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না।

সমরেশ বলে, চুপ করলাম। শুধু একটা আবেদন জানাতে চাই। সংক্ষেপে জানাব।

জবাবে নন্দিতা মুখে কোন কথা বলে না। স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সমরেশ বলে, মনটা আগের মত শক্ত কর না? কিছু না জেনে না বুঝেই আগে মনটা খেয়াল খুশীতে শক্ত করে নিয়েছিলে,—অনেক কিছু জেনে বুঝে এবার মনটা শক্ত কর? ভাবের তেজটা এবার সত্যিকারের কাজের তেজে দাঁড় করাও?

নন্দিতা বলে, চুপ কর! কখন চুপ করে থাকতে হয়, কখন কথা কথা কইতে নেই, এটা তুমি দয়া করে শিখবে? ফাঁকা উপদেশ দেবার ঝোঁকটা একটু সামলাবে? আমার কি মনে হচ্ছে জানো? আমার জীবনে মহা একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এটা যেন তোমার কাছে মজা করে মাথা ঘামানোর মস্ত একটা সুযোগ।

সমরেশ বিব্রত হয় না, কাতর হয়ে মাপ চায় না, নম্র সুরে বলে, তা ঠিক। কাজে কিছু করতে পারব না, বড় বড় উপদেশ আর নীতি কথা শোনাব—এটা সত্যি আমায় একটা বিশ্রী রকম দোষ।

নন্দিতা সহজভাবে বলে, দোষ মানুষের থাকবেই। কোন দোষ নেই শুধু গুণ আছে রক্ত মাংসের এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। গুণ বেশী না দোষ বেশী, গুণ আসল না দোষ আসল—এটাই মানুষের সত্যি বিচার।

নন্দিতা বিদায় নেবার পর সমরেশ কুমারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের আলাপ আলোচনা কিছু কিছু শুনেছিল?

কুমার বলে, না। প্রেমের সবাই কান খাড়া করে থাকে কিন্তু আজ কাল তোরা খুব নীচু গলায় ফিস্‌ফাস্ করে কথা বলিস! কিছু শোনা

যায় না। তবে আন্দাজ করছি কথাবার্তার কেন্দ্র হলেন ভবানীবাবু। উনি আস্তে আস্তে নন্দিতাকে বাগে আনছেন, শাস্তি দিচ্ছেন।

: শাস্তি ?

: শাস্তি বৈকি! বিবাহিতা স্ত্রী, তাকে ঠিক যেন বাজারের ভাড়াটে মেয়েলোকের মত বাঁধা রেখে অপমান করছেন। মেয়েলোকে বাঁধা রাখলে বাবু তার ঘরে যায়—নন্দিতাকে ভবানীবাবুর বাড়ী যেতে হচ্ছে। এর চেয়ে বারোমাস স্থায়ী ভাবে থাকা ঢের ভালো ছিল। এরকম অপমানের জ্বালা সইতে হত না।

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তুই যে আমাকে আরেকদিক দিয়ে ভড়কে দিলি কুমার। আমি ছোট মামীর বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছিলাম—নতুন মামীকে পেলে মামা তাকে চায় না এটা টের পেলে ছোটমামী একটা কাণ্ড করে বসবে। তোর কথা শুনে ভাবছি, এই অপমানের জ্বালা সয়ে চলতে নতুন মামার মাথাটা না আগে বিগড়ে যায়, ভয়ানক কিছু না করে বসে।

কুমার বলে, না, তা করবে না। ওর মার অসুখ বাপের চোখের ঝামেলা, একটার পর একটা বই ছাপা হচ্ছে, নন্দিতা রাগ আর জ্বালা চেপে মানিয়ে চলবে।

সমরেশ খানিকক্ষণ আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, সত্যি বলবি একটা কথা ? আমাদের কথাবার্তা শুনিস্ নি ?

কুমার মাথা নেড়ে বলে, একটা কথাও শুনিনি। নন্দিতাই আমায় বলছিল ভবানীবাবুর ব্যাপারটা কেন ওকে মেনে নিতে হয়েছে।

: ও! তোকেও সব বলেছে!

: নিজে থেকেই বলেছে। আমি জিজ্ঞাসাও করি নি।

কুমার মুখ তুলে চেয়ে চোখের ইসারায় তাকে বসতে বলে, সে বসলে

চাপা গলায় বলে, নন্দিতা যে তোর কাছে আসছে, ফিস্‌ফাস অনেক কথাবার্তা কইছে—এ রিপোর্ট কিন্তু ঠিকমত পৌঁচচ্ছে, ভবানীবাবুর কাছে। নন্দিতা বিদ্রোহ করলেই এবার তোকে দায়ী করবেন! বলবেন যে তোর বুদ্ধি পরামর্শে বিগড়ে গেছে।

: করুক। আমি গ্রাহ্য করি না। মামাকে এবার আমি ব্যাপার টের পাইয়ে দেব।

: এটা হল ছেলেমানুষী জ্বালার কথা। ভবানীবাবুকে ব্যাপার টের পাইয়ে দেবার ক্ষমতা তোর আছে?

: আছে। আমি বিগড়ে গেলেই মামা জব্দ হয়ে যাবে। আগে নিজের সংসার টা সামলাব।

সত্য সত্যই সমরেশ আবার অসহ্য দুর্ভোগের স্তরে ঠেলে দেয় তার মা, মাসী, খুড়ী, পিসী নিজের বোন আর মাসতুতো পিসতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেদের বিরাট সংসারটাকে।

এবার সত্য সত্যই সে কঠোর হয়েছে।

নির্মম নিষ্ঠুর হয়েছে।

সে যা বলবে, যেটুকু ব্যবস্থা করে দেবে, তাই হল চরম কথা। কারো নালিশ, কারো আব্দার কাণে তুলবে না।

নালিশ বা আব্দার কাণে শোনা পর্য্যন্ত বন্ধ করুক—বাড়ীর মানুষের বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ মরা বাঁচার ব্যাপারেও সে কি নির্ব্বিকার হয়ে থাকবে?

সুবর্ণের মেজ ছেলের একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। ডাক্তার এসে বলে গেছে যে হাসপাতালে পাঠালেই ভালো, বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করালেও দিনে রাত্রে অন্ততঃ তিনবার ডাক্তারকে এনে দেখাতে হবে তার

অবস্থা, এমনি ইনজেকসন দিতেই হবে রোজ একটা করে, দরকার হলে বাড়তি ইনজেকসনও দিতে হবে।

সুবর্ণ সমরেশের সেজ পিসীর মেজ মেয়ে। বাপ মা পাকিস্থানে আছে, কাকা দু'জন কলকাতায় এসে ডেরা বেঁধেছে সহরতলীর হাজার দশেক টাকা ন্যায্য মূল্যের একটা একতোলা বাড়ী পনের হাজার টাকা নগদ মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে।

কি ভেবে কেন সুবর্ণ ওদের সঙ্গে পদ্মানদী পাড়িদিয়েছিল কেউ জানে না।

তিনমাস কাটেনি। সে এসে মহিমের পা জড়িয়ে ধরে এ বাড়িতে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল।

তার নিজের আশ্রয়, একটা ছেলের আশ্রয় এবং তার স্বামী রণজিতের আশ্রয়।

তারপর সুবর্ণের তিনটি ছেলেমেয়ে জন্মেছে।

রনজিত চাকরী করছে। সংসার খরচের জন্য মহিমের হাতে সে মাসে পচিশটা টাকা ধরে দিত।

এখনো তাই দেয়। সমরেশের হাতে দেয়।

ছোট ভাই, কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ছেলের প্রাণ বাঁচবার জন্য সুবর্ণ সমরেশের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। সমরেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, কেন মিছে সময় নষ্ট কচ্ছ দিদি? আমার হাতে একটা পয়সাও নেই। আমি কিছুই করতে পারব না।

সুবর্ণ মাথা তুলে আর্ত কণ্ঠে বলে, খোকন মরে যাবে? তুমি কিছুই করবে না?

সমরেশ বলে, আমার করার ক্ষমতা থাকলে কি করতাম না? কি

করব, আমার কিছু করার সাধ্য নেই। নিজের ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা রণজিতবাবুর করা উচিত নয় কি?

সুবর্ণ মুখ তোলে। খোঁপা বাঁধে, এলোমেলো ভাবে বাঁধে।

বাড়ীর মানুষ কেন, পাড়ার যত বাড়ীর মানুষকে শোনানো সম্ভব তেমনিভাবে গলা আকাশে চড়িয়ে বলে, খোকন যদি বিনা চিকিৎসায় মরে আমরা তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাব জন্মের মত।

সমরেশ শান্তকণ্ঠে বলে, অনেকদিন আগেই তোমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল। কত বেকার পথে নেমেছে - হাজার হাজার। রণজিত তো চাকরী করেছে।

: ছাই চাকরী করছে। নিজের হাত খরচ চলে না।

: নিজের হাত খরচ কমিয়ে এবার থেকে তোমাদের খরচ চালাবে। পারলে আমি চালিয়ে যেতাম, একটি কথা বলতাম না, কিন্তু আমার ক্ষমতা নেই, করব কি?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মারা যায় সুবর্ণের মেজ ছেলে। সুবর্ণের গগন-ফাটা আর্ত মড়া-কান্নার সঙ্গে মিশে থাকে সমরেশকে তার ছেলের মরণের জন্য দায়ী করে তাকে অকথ্য অভিসম্পাত দিয়ে চলা।

অনেক রাত্রে সমরেশ বাড়ী ফেরার পর তার গলা আরও চড়ে যায়, অভিশাপ যেন আরও বেশী রকম বীভৎস হয়ে ওঠে।

সমরেশ নির্বিকারভাবে নিত্যকৃত্য সারে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মনে যেন কারো জন্য মমতাও নেই, বিরাগও নেই।

খেতে বসে শুধু যেন এইজন্য যে মানুষের অন্নগত প্রাণ, না খেয়ে মানুষের বাঁচার সাধ্য নেই।

বাঁচতে হলে খেতে হবে।

না খেলে মৃত্যু।

অনশন মানেই আত্মহত্যা।

আজ রাত্রে ভাত হয়নি, সকলের জন্য রুটির ব্যবস্থা হয়েছে। গরীবের প্রাণ বাঁচানো এই রুটি সমরেশের কাছে খুব দামী খাদ্য—খেতে যতই খারাপ লাগুক। নিজে চোখে দেখে লাল বা সাদা গম কিনে নিজে গিয়ে কিম্বা নিজের লোককে পাটিয়ে চোখের সামনে সেই গম ভাঙ্গিয়ে এনে ঘরে তৈরী রুটি খেতে ভাল না লাগলেও কতখানি মানসিক স্বস্তি যে মেলে—সামনে দোয়ানো দুধের মত অন্ততঃ একটা নির্ভেজাল খাদ্য পেটে যাচ্ছে!

তরীতরকারীতে পর্য্যন্ত কি যে ভেজাল চলছে।

ওষুধে ভেজাল, ঘি-এ ভেজাল। মাখনে ভেজাল, দুধে ভেজাল, তেল থেকে স্থুরু করে সাগুবালি এমন কি পান খাবার উপাদান খয়েরটুকুতে পর্য্যন্ত ভেজাল—তার একটা মানে হয়।

ওসবে ভেজাল চালানো সম্ভব, বাঁকা বুদ্ধি খাটিয়ে কায়দা কানুন খাটালেই হল। অবিকল খয়েরের মত দেখতে হলে এবং খেতেও একটু কষা লাগলে, কে টের পাবে যে ওটা খয়ের নয়—সস্তা রসায়নিক প্রক্রিয়ার তৈয়ারী করা গঙ্গামাটির সন্দেশ? কিন্তু গাছে ফলানো তরকারীতে ভেজাল?

টাটকা দেখে দু'সের পটোল কিনে নিয়ে আসে সমরেশ!

সরশ নিটোল সবুজ পটোলগুলি এক রাত্রি তরকারীর ঝুড়িতে কাটিয়েই জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়, বার্দ্ধক্যের ও রুগ্নতার কটা চোকলার অবস্থা পায়।

প্রণতি একটু মুচকে হেসে বলে, কদিনের জলে ভেজানো পটল কে জানে! দেখে চিনতে পার না দাদা?

কী স্থন্দর চেহারা আলুগুলির। কাটার সময় অনেকগুলি ফেলনা

যায়। বাইরে ঠিক আছে, ভেতরে পচা, একটা ভুলে দিয়ে দিলে আলুর গন্ধে খাওয়া যায় না তরকারী।

তবু খেতে হয়।

পেটে জ্বলছে আগুন।

তাতেই যে আগুন শান্ত হোক।

প্রণতি তিনদিন বাড়ী ছিল না।

বাড়ীতে হৈ চৈ চলেছে তিনদিন। চেঁচামেচি হা হুতাশ আর জল্পনা কল্পনা অবধি থাকে নি।

কান পেতে সব শুনেছে সমরেশ।

কেবল সামনা সামনি তাকে কেউ কিছু বলতে গেলে কথা কানে না তুলেই রেগে আগুন হয়ে বলেছে, শুনব'খন শুনব'খন—প্রণতি বাড়ী ফেরেনি? বেশ করেছে, যে বাড়ীই তোমা করেছিস।

বাড়ীতে রাগারাগি করে, বাইরে মোটা টাকার কাজের জন্য জানা চেনা বড় মানুষদের বিরক্ত এবং বিব্রত করে।

এদিকে সস্তা বই ছাপে।

পঞ্চাশ ষাট টাকায় কপি রাইট কেনা নোংরা প্রেমের বই আর গোয়েন্দা কাহিনীর বই ছাপে—

নাম করা লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী যথেষ্ট রোমাঞ্চকর না হলে ভাড়া করা কোন লেখককে দিয়ে রোমাঞ্চকর প্রাণান্তকর প্রেমের মশলা তাতে যোগ করে দেয়।

বড়ই ব্যস্ত সমরেশ আজকাল।

যার কাছ থেকে নগদ বা ভবিষ্যৎ কোন লাভের আশা নেই তাদের সঙ্গে দেখা করলেও দু'এক মিনিটের বেশী কথা কয় না—চেয়ার

ছেড়ে উঠে গিয়ে প্রেসের কাজ তদারক করে কিম্বা বই বিক্রীর হিসাব দেখতে বসে একরকম স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেয় যে আর তার কথা বলার ইচ্ছা বা অবসর নেই।

বাড়ীতে বাজার খরচ খাই-খরচ ছাঁটাই করেছে নির্মমভাবে—প্রায় পাগলের মত।

দুধ—নাম মাত্র, শিশুদেরও কুলোয় না।

চাল আর আটা এমন হিসাবে আসে যে কয়েকজন পেটভরে খেলে বাকী সকলের উপোস দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

তরীতরকারী—শুধু শাকপাতা আনে। এতগুলি মানুষের জন্য আধ সের আলু, দেড় পো' পটল, এক পো' ঝিঙা বেগুন আনার কোন মানে হয়?

নালিশে নালিশে পাগল করে দিতে চায় তারা, যারা মাছ তরকারী কেটেকুটে রান্নাবান্না করে, সকলকে খেতে দেয়।

সমরেশের মাথা গুলিয়ে যায়।

চীৎকার করে সে বলে, বেশ, কাল থেকে সব বন্ধ। দু'একদিন উপোস দিলে তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের জন্য কত করছি।

সুনীতি উঠে দাঁড়ায়।—ঘন ঘন হাত নেড়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজে বলে, আমরা কি তোমার ভাতের কাঙাল? কাল থেকে উনুন ধরবে না এ বাড়ীতে—ভিক্ষার ভাত ডাল রান্না হবে না।

প্রীতি থাকলে কি বলত কে জানে।

গঙ্গা পিসী রেগে বলে, ক'জনকে কতকা'ল কত ডাল-ভাত রেঁধে খাইয়েছিস তুই—বলতো শুনি একবার? ইয়ার্কি না মারলেহ হয় না? বেচারা কতভাবে প্রাণপাত করছে সেটা তোরা কেউ বুঝবি না, ওকেই কেবল দোষাবি।

সমরেশ ঝেঁঝে বলে, পিসী চুপ কর।

গঙ্গাপিসী বুকে হাত গুটিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজবার আগে বলে, আচ্ছা বেশ চুপ করলাম। তুই যেন হৈ চৈ বাঁধিয়ে আমার ঝিমটা ভেঙ্গে দিস না সমু, দিস না।

সে সুরু করেছে প্রাণশক্তির অব্যয় ব্যবহার—আপনজনের প্রাণ বাচানোর ব্যয় সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে।

এমন কুৎসিৎ হয়ে গেল জীবনটা?

ঘরে এবং বাইরে?

ছ'মাসে ছাপাখানা চালান এবং বই ছাপানো থেকে লাভ দেখাতে পারে নি কিন্তু আগামী লাভের এমন সূচনাই সৃষ্টি করে যে খুসীর সীমা থাকে না ভবানীর।

ছ'মাস সে স্বাধীনভাবেই সব কিছু চালাতে দিয়েছে সমরেশকে—সমরেশ মাঝে মাঝে এসে আরও টাকার দাবী জানালে নীরবে চেক সই করে দিয়েছে।

সমরেশ ভাবে, এটা বোধ হয় অণিমা আর নন্দিতার ডবল চাপের ফল।

দু'জনের কাছেই সে নিয়মিত ভাবে যায়। দু'জনকেই খুসী রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

সে অবশ্য বছর দু'য়েকের মধ্যে জানতে পারে নি যে ভবানী তার পাগলের মত উঠে পড়ে কাজে লাগা থেকে ছাপার কাজ, বই ছাপা, বই বিক্রীর ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত খবর বরাবর জেনে এসেছে।

অণিমা হঠাৎ কেন বাপের বাড়ী চলে যায় কেউ বুঝতে পারে না।

ভুবনের মা বার বার বলে, বাবা রে বাবা, কী রকম যে ছটফট করছিল কদিন ধরে, রাতে ঘুম নেই, দুপুরে একটু শোয়া নেই—নাওয়া

নেই, খাওয়া নেই, খালি ঘরে বাইরে করে বেড়ানো। বাবুর নতুন আস্ত বোতলটা দু'দিনে কাবার করেছে, দুপুর রাতে ডবল দাম দিয়ে বাবুকে ফের বোতল আনতে হল। মোকে ডেকে ডেকে কতবার যে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ ভুবনের মা, মদ নাকি বিষ, বেশী করে খেলে মরব না?

নন্দিতা রেগে বলে, ভুবনের মা, আমার জা-এর ব্যাপার তুমি কি আমার চেয়ে ভাল বোঝ? মুখটা একটু বন্ধ রাখলে দোষ কি? না জেনে না বুঝে বক বক কর কেন? তিনটে মদের বোতল ছিল, ছোট বৌ তিনটে বোতল মেঝেতে আছড়ে ভেঙ্গে বাপের বাড়ী গেছে। ঘরটা সাফ করেছি আমি—আমি জানি। নগদ নগদ মরতে হলে যে মদের বিষে কুলোয় না, আসল বিষ খেতে হয়—এটুকু বুদ্ধি ছোট গিন্নির ছিল। ওর নামে এরকম মিছে বদনাম রটিয়ে বেড়ালে তোমায় কিন্তু আমি বাছা তাড়িয়ে দেব।

ভুবনের মা মাথা নীচু করে আড়ালে যাবার পর এক চুমুকে গ্লাস খালি করে বলে, মদ কিন্তু সত্যি সত্যি অতিরিক্ত পরিমাণে খেয়েছিল। আগের দিন বোতল খুলেছিলাম, পরদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে দেখি—বোতল একদম খালি।

নন্দিতা বলে, বেশ তো, সেটা তুমি বুঝবে আমি বুঝব—ভুবনের মা পাড়ার আকাশ ফাটিয়ে বেড়াবে কেন? ওর এত মাথা ব্যাথার তো কোন দরকার নেই!

: ভড়কে গেছে।

: ভড়কে গিয়ে থাকে ঘরের ভাত বেশী করে খাক্। ও কি জানে, বেচারাকে দু'টো দিন সামলে নিতে দিয়েই তুমি আমি দুজনে গিয়ে হাজির হব ওকে ফিরিয়ে আনতে?

ভবানী নতুন কেনা বোতলটা আলমারি থেকে বার করে আনলে নন্দিতা যেন তা হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নেয়— ছিপি খুলে গেলাসে ডবল পেগ ঢেলে দিয়ে বলে, কে খাও? এ জিনিষটা খেয়েই তুমি গোল্লায় যাচ্ছ টের পাও না?

: টের পাই না? কী করব বল। গোল্লা-পন্থী মানুষগুলির সঙ্গে আমার কারবার।

সমরেশ জানে আরও কিছু টাকা ঢালতেই হবে জেনে সে মরিয়া হয়েও সসঙ্কোচে ভবানীর কাছে দরবার করতে গেলেও ভবানী নীরবে চেক কেটে দেবে।

ভবানী যে তার কারবারের পাই-পয়সার হিসাব রাখে, কি ভাবে কাজ চলছে এবং কি ভাবে আদায়পত্র হচ্ছে সব খবর রাখে—এটা জানা না থাকায় বছর কাবার হবার মাস তিনেক পরে সমরেশ একদিন গিয়ে হাসিমুখে ভবানীকে জানায়, তোমার বিশ্বাস রাখতে পেরেছি মামা। নীট্ লাভ করেছি সাড়ে এগার শো টাকা।

ভবানী বলে, বেশ তো, বেশ তো—এই তো চাই! আরেকটা যুদ্ধ লাগবেই মনে হচ্ছে। কোরিয়ার আগুন সহজে নিভবে মনে হয় না। শান্তি শান্তি করে অনেকে চেঁচাচ্ছে বটে কিন্তু আমেরিকা কি ছেড়ে কথা কইবে! এখন থেকে তৈরী থাক। দু' এক বছরের শেষ হবে না যুদ্ধ। এমনিভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে যদি চালাতে পারিস—যুদ্ধের বাজারে লাখ টাকা হেসে খেলে কামাতে পারবি।

: তুমিও তৈরী হচ্ছ নাকি?

: তৈরী হচ্ছি না? এত বড় বড় এতগুলো কারবারের দায় নিয়ে আমিও কি কম মুস্কিলে পড়েছি রে! ভাগ্যে যুদ্ধটা লাগবে!

সমরেশের মনে পড়ে যে বনমালীও কারবার সামলাতে জীবন পাত করতে নেমেও আসল ভরসা খাড়া করেছিল যুদ্ধ।

তাদের দুর্দ্দশা ঘুচাতে যুদ্ধই তবে দরকার?

গত যুদ্ধ তবে চারিদিকে মানুষের এত দুর্দশা বাড়িয়ে দিয়ে গেল কেন? কেমন করে, কোন নিয়মে?

মানুষের অবস্থা ভাল থাকা মন্দ থাকার সঙ্গে তার বাপের কারবারটার সোজাসুজি যোগাযোগ ছিল বলে প্রথম দিকে প্রচুর লাভ বাগিয়েও যুদ্ধ শেষ হবার আগেই কেন সূচনা দেখা গেল—কয়েক বছরের মধ্যেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে?

ইস্, তখন যদি কারবারটা গুটিয়ে নিত তার বাবা!

অন্ধের মত বনমালী যদি টাকা ঢেলে ঢেলে কারবারটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করত আরেকটা যুদ্ধ বাধবার আশায়!

যে টাকা জমেছিল, বিনা কারবারে বিনা আয়ে কয়েক বছর এত বড় সংসারটাকে ভাল ভাবে খাইয়ে পরিয়ে গেলেও একলাখ দেড়লাখ মজুত বাপ এবং বনমালী গত হবার পর।

ভবানীও আরেক যুদ্ধের আশায় আছে। কিন্তু বনমালীকে সে তো ঠিক পরামর্শই দিয়েছিল—কারবার খতম করে ফেলাই ভাল!

বনমালী তখন কারবার খতম করতে রাজী হলে অনেক কম দুরবস্থা হত তার।

কিন্তু আরেকটা যুদ্ধের ভরসা সম্বল করতে সমরেশ সাহস পায় না। বনমালীর যুদ্ধ বিকার তার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল।

ভবানীর যুদ্ধের ভরসা তার কাছে বিপজ্জনক মনে হয়।

যুদ্ধ না বাধলে ভবানী হয় তো নিজেকে বাঁচানোর জন্য আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও গ্রাস করবে!

কিন্তু স্বাধীন ভাবে হলেও এভাবে ছাপাখানা ও বই-এর ব্যবসাও তো সে চালিয়ে যেতে পারবে না।

সারা বছরের প্রাণপাত খাটুনি আর ছোটলোকামির বিনিময়ে সে নীট লাভ করেছে সাড়ে এগার শ' টাকা!

মাইনে মাগ্‌গী ভাতা মিলিয়ে একশ' টাকার সামান্য কেরানীগিরি করলেও তার মোট আয় হত বার শো টাকা!

সাড়ে এগারেশো টাকার জন্য ঘরে বাইরে ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষের কি বিষাক্ত পরিবেশই সৃষ্টি করেছে শুধু মাত্র একটি বছরের অধ্যবসায়ে!

আপন পর প্রায় সকলেই তাকে অমানুষ বলে জেনে গিয়েছে, চিনে গিয়েছে।

দু' একজন ছাড়া মুখের ওপর সেটা অবশ্য কেউ জানায় না। কিন্তু তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি তো একেবারে লোপ পায় নি—ওটুকু বুঝতে তার অসুবিধা হয় না।

সে তো বুঝতে পারে তার সঙ্গে সকলের কথাবার্তা আচার ব্যবহার মেলামেশা কী ভাবে একেবারে পাল্টে গেছে। সকলের সঙ্গেই তার অন্যরকম হয়ে গেছে।

সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে—তার জন্য অনেকের যে খাঁটি দরদ ছিল, সে দরদ শুকিয়ে শেষ হয়ে যেতে বসেছে।

উনানে দুধ চাপিয়ে জাল দিতে দিতে সেটা ক্ষীর হয়ে যায়।

অনেকের প্রাণের কড়ায়ে স্নেহ মায়া বন্ধুত্বের জীবনামৃত ঘন ক্ষীর হয়ে পোড়া লেগে নষ্ট হয়ে গেছে।

এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ হয় না।

অথচ এত বড় সংসারের এত গুলি নিরুপায় মানুষকে বাঁচাবার জন্য জীবন পাত চেষ্টা না করারও কোন অর্থ হয় না।

বাঁচার মানে তবে কি ?

এভাবে ছাপাখানা আর বই ছাপানোর ব্যবসা চালিয়ে লাখপতি হতে পারলেই কি সে মনে করতে পারবে জীবনটা তার সার্থক হয়েছে ?

শরৎকালীন সার্ব্বজনীন পূজার দিন এসে গেছে।

ষষ্ঠীর দিন প্রেস আর বই ছাপানো বিভাগের সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়ানোয় তার মাথাটা প্রায় খারাপ হয়ে যেতে বসেছিল।

কে জানে কি কাণ্ড করত! নন্দিতা সামনে ছিল। সমরেশকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে নন্দিতা মিষ্টি সুরে বলে, ওদের কথা দিই যে আজ অর্দ্ধেক দিন কাজ করে ফিরে যাবার সময় মাইনে বোনাস সব কিছু নিয়ে যাবে, ক'দিন ছুটি জেনে যাবে ? বলব ? তুমি একবার হুকুম দিলেই আমি ওদের বুঝিয়ে বলতে পারি, ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

সমরেশ ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, বলো। তোমরাও যখন ওদের পক্ষ নিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছ—আমার আর কি বলার আছে, কি করার আছে।

নন্দিতার ঘোষনা শুনে সকলে শান্তভাবে নিজের নিজের যায়গায় ফিরে গিয়ে কাজ আরম্ভ করলে নন্দিতা বলে, এমন মন হয়ে গেছে তোমার ? ওরা গরীব মানুষ, পূজার আগে টাকা না পেলে ওদের পূজার আনন্দ মাটি হয়ে যাবে—তুমি ওদের মাইনে বোনাস আটকে দেবার মতলব করেছ ! তোমার একবার খেয়ালও হল না যে সে দিনকাল আর নেই, ওরা নিজেদের অধিকার বুঝতে শিখেছে, দাবী দাওয়া আদায় করতে শিখেছে।

সমরেশ গোমড়া মুখে বলে, আমার দিকটাও তো ওদের দেখতে হবে ? চারটে পার্টি মোটা টাকা আটকে দিয়েছে। আমি ওদের বলেছিলাম, টাকা আদায় হলেই ওদের পাওনা মিটিয়ে দেব।

নন্দিতা ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, তোমার পাওনা তুমি আদায় করতে পারবে না, সেজন্য ওদের ভুগতে হবে? তোমার তো অদ্ভুত বিচার! তুমি না সাড়ে এগার'শ টাকা নীট লাভ করেছিলে? লাভ থেকে ওদের পাওনা মিটিয়ে দাও, দরকার হলে মামার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে এসো। ও-তো সব ডুবিয়ে দিতে বসেছিল, তুমিই বুদ্ধি খাটিয়ে খেটে খুটে দাঁড় করিয়েছ। কত কিছু আশা করছে—পূজোর পরেই আরও টাকা ঢেলে সব দশগুণ বাড়িয়ে দেবে।

: পূজোর পরে ডাল সিজন্।

: ডাল সিজন্ কেটে যাবার পর করবে।

সমরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এই ছ্যাচরামির কারবার করব কিনা আমি সিরিয়াসলি তাই ভাবছি।

নন্দিতা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, সে হল আলাদা কথা। মন না বসলে ছেড়ে দেবে, ফুরিয়ে গেল।

তারপর বলে, কিন্তু ছ্যাচরামি চালাচ্ছ কেন? ভাল বই কি বিক্রী হয় না এদেশে? ভাল লেখকলেখিকার বইএর এত চাহিদা কেন তবে? কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন লেখকলেখিকা—আজও তাদের ভাল ভাল বইগুলি হরদম বিক্রী হচ্ছে বাজে অখাদ্য বই ছেপে দেশের সর্ব্বনাশ করে পয়সা করায় ছেচরা সাধ তোমার জাগল কেন?

সমরেশ বলে, মামার যে ধৈর্য্য নেই, মামা যে সময় দিতে চায় না।

নন্দিতা বলে, তোমার মামাকে ধৈর্য শিক্ষা দেবার দায় তো আমরা দুই মামী মিলে মিশে নিয়েছি। মেয়েলোক বলে বুঝি ক্ষমতায় বিশ্বাস হল না?

সমরেশ চুপ করে যায়।

প্রণতির সন্ধান মেলে না, খবর মেলে।

তার নিজের হাতের লেখা একখানা খামের চিঠি আসে—সে ভালই আছে, সমরেশকে বিব্রত না করে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে, তার জন্য কেউ যেন চিন্তিত বা বিব্রত না হয়।

একটা বিশেষ ধরণের চাকরী করছে।

বাড়ীতে থেকে এ চাকরী করতে অনুমতি পেত না—তাকে চাকরী করতে দিতে কেউ রাজী হত না। অগত্যা বাধ্য হয়ে কাউকে কিছু না জানিয়েই চাকরীটা সে নিয়ে নিয়েছে।

তার জন্য কারো ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সে একালের মেয়ে, নিজেকে সামলে চলতে শুধু জানে না, পারেও।

প্রণতি ঠিকানা দেয় নি, শুধু পোষ্টাপিসের নামটা লিখেছে। জানিয়েছে তাকে চিঠি লিখতে হলে পোষ্টাপিসের কেয়ারে দিলেই চলবে—রোজ তাকে দু'বার পোষ্টাপিসে যেতে হয়, চিঠি পেতে অসুবিধা হবে না।

প্রীতি ও নন্দিতাকে সে চিঠিটা পড়ায়। দু'জনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রায় গায়ের জোরে দু'জনকে সঙ্গে টেনে নিয়ে ট্যাক্সি করে সকালবেলা হাজির হয় ওই পোষ্টাপিসে।

প্ল্যাষ্টিকের একটা বড় মোটা ভারি ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রণতি পোষ্টাপিসে আসে সাড়ে দশটার পর।

তাদের দেখে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে কাছে গিয়ে বলে, আমি তাই ভাবছিলাম, পুলিশী হিসেব কষে পোষ্টাপিসে না এসে তোমরা পারবে না! একটু বোসো, জরুরী কাজটা সেরে আসছি।

তাদের চোখের সামনে সে ছ'জন নানা জাতের পুরুষ ও একজন মেয়ের পেছনে চিঠি ও পার্শেল রেজিষ্ট্রী করার কাউণ্টারের লাইনটার

পিছনে দাঁড়ায়, দেড় ঘণ্টা পরে গোটা পনের ছোট বড় পার্শেল প্রৌঢ় বয়সী রেজিষ্ট্রেশন কেরানীর নির্দ্দেশ মত টিকট এঁটে এঁটে জমা দিয়ে ফিরে আসে।

জোর গলায় বলে, কোথায় থাকি, কার কাজ করি—এসব কিন্তু জানাব না। মনে কর আমায় তোমরা বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে ভাগিয়ে দিয়েছ। স্বামীই আমাকে বাপের বাড়ী যেতে দেয় না।

সমরেশ হাত তুলে নন্দিতা ও প্রীতিকে মুখ খুলতে বারণ করে।

বলে, স্বামীর ঘরে পাঠানোর মধ্যে কোন গোপনতার ব্যাপার নেই। অমুকের ছেলে, অমুক ঠিকানায় অনেক বছর আছে এই এই পাশ করেছে কিম্বা অমুক কাজে ঢুকেছে, এসব হিসাব নিকাশ বাদ দিয়েই মেয়ে লোককে আমরা বাপ ভায়েরা স্বামী নামক জীবের হাতে সঁপে দিয়ে রেহাই পাই বলতে চাস? ঘটক জাতটাই তা'হলে সমাজে গড়ে উঠত না। কোন দরকার থাকত না ঘটকের। ছেলে মেয়ের বিয়ে লাগসই করতে পারত বলেই সমাজে ঘটক জাতটার উৎপত্তি হয়েছিল।

তেরো

মরিয়া হয়ে দিশেহারার মত চেষ্টা চালিয়েছিল ছাপা আর বই প্রকাশের কারবারটাকে বছরখানেকের মধ্যে লাভজনক করে তুলতে!

ভবানী সময় দিয়েছিল ছ'মাস।

কিন্তু সমরেশ জানত, ওই ছ'মাসকে টেনে বাড়িয়ে এক বছর দেড় বছর করা সম্ভব হবে।

উন্নতির কোন লক্ষণ শুধু যদি সে দেখাতে পারে।

সামান্য হলেও লাভ দেখিয়ে ভবানীকে সে পুলকিত করে দিয়েছে।

কয়েক হাজার টাকা জলে যাবে ধরে নিয়েছিল ভবানী।

এক বছরে হাতে নাতে নগদ টাকা লাভ দেখিয়ে ভবানীর ক্ষোভটাকে সে পরিণত করেছে আশা এবং আনন্দে।

এখন কয়েক বছর সে লাভ না টানতে পারলেও ভবানী টেনে যাবে—তাকে শুধু প্রকারান্তরে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখতে হবে যে এমনি ভাবেই সে মোটা লাভের জন্য কাজ করে যাবে।

নিজে বেশী নাই বা খাটল।

অন্যদের খাটিয়ে লাভের ব্যবস্থা করতে পারলেই হল।

লাভ বাগাবার জন্য সে খাঁটি ছ্যাচরামিতে পোক্ত হয়েছে—তার কাছে ভবানী এখন অনেক কিছু আশা করে।

নন্দিতা হেসে বলে, আমি তো আগেই তোমায় বলেছি। মানুষটা পয়সা বোঝে, যে কোন লাইনে যে কোন উপায়ে পয়সা পেলেই হল।

আজ নগদ নগদ না পাওয়া যাক্, পরে একদিন পাওয়া যাবে—এ গ্যারান্টি পেলেও চলে। মুখে আজকাল তোমার প্রশংসা ধরে না।

নন্দিতার ছোট নতুন বইটা সত্যই বাজারে হিট্ করেছে। বইটা বার হতেই চারিদিকে খুব নিন্দা রটেছিল, কোন লেখিকা যে এরকম কুৎসিৎ অশ্লীল বই লিখে স্বনামে প্রকাশ করতে দিতে পারে—কয়েকজন পর্য্যালোচকের কাছে এটাও নাকি অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল।

একটা গুজব রটেছিল যে অশ্লীলতার দোষে বইটা হয় তো বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ছ'মাসে বইখানার তিনটি সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। প্রকাশক হিসাবে সমরেশের লাভও মন্দ হয় নি।

প্লট খুব সহজ। রূপহীনা বলে একটি মেয়েকে তার স্বামী ত্যাগ করে—সুন্দরী আরেকটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করার পর। এজন্য বাপের বাড়ীতেও মেয়েটির ছিল অনাদর, ঝি রাঁধুনীর মত দিন কাটিয়েও বকাঝকার অন্ত ছিল না।

কিছুদিন পরে মেয়েটি টের পেল যে তার রূপ নেই কিন্তু যৌবন আছে এবং সে যৌবনের মূল্য দেবার মানুষও আছে। নিয়মনীতি সংস্কার সব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের মূল্যে সে তখন নিজের ভাল থাকা ভাল খাওয়া ভাল পরার ব্যবস্থা করল।

প্রীতি মুখ বাঁকিয়ে বলে, আহা, কি গল্পই লিখেছে! রূপ নেই তার যৌবন আছে—শুকনো গাছে ফল ফলেছে।

চতুর্থ সংস্করণ ছাপাবার সময় সমরেশের কি হয় সে-ই জানে, সে একেবারে বেঁকে বসে। বলে, না, এ বই আমার নামে প্রকাশ করব না।

: তার মানে ?

: নোংরা বই প্রকাশ করে আমার বদনাম হচ্ছে। তুমি নিজের নামে প্রকাশ কর, অন্য কারে নাম দিয়ে প্রকাশ কর, আমি প্রকাশক হিসাবে নাম দেব না।

নন্দিতা হেসে বলে, বইটা নোংরা নাকি? তোমারও তাই মত?

সমরেশ বলে, নোংরা বৈ কি। তুমি সরাসরি মেয়েদের দেহ বিক্রী করার পক্ষে প্রচার করেছ।

নন্দিতা আবার হাসে।—কি যে আছে তোমাদের মগজে! তুমিও ধরে নিয়েছ ওইরকম নোংরা বলে এতলোকে বইটা কিনছে, হৈ চৈ করছে? অন্যদিকটা একবার খেয়ালও হল না!

: অন্য দিক মানে?

: মেয়েটা বিদ্রোহ করেছে, তেজের সঙ্গে নিজের স্বাধীনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করেছে, এ অবস্থার মেয়েদের যে অন্য কোন পথ খোলা থাকে না সমাজের এটা একটা কলঙ্ক? বুঝুক বা না বুঝুক, এথাই লোকের ভাল লাগছে—মেয়েদের তেজী হতে, বিদ্রোহ করতে, স্বাধীন হতে বলেছি।

সমরেশ খানিক চুপ করে ভাবে।

তারপর গভীর আপশোষের সঙ্গে বলে, এদিকটা তো আমার একেবারে খেয়াল হয় নি! এও যে লড়াই, তুমি লড়াইকে তুলে ধরেছ বলে লোকে খুশী হয়েছে।

নন্দিতা বলে, নোংরা বর্ণনা আছে এরকম একটা লাইন তুলে দেখাতে পার বইটা থেকে?

: অথচ সবাই বলছে বিশ্রী নোংরা বই!

: সবাই নয়, তোমাদের মত পণ্ডিতেরা, মার্জিতরুচি সমাজের মঙ্গল-কামীরা বলছে। যুক্তিটা তো তুমিও তুললে—আমি মেয়েদের দেহ

বিক্রীর পক্ষে প্রচার চালিয়েছি! উল্টোটাই বরং ঠিক, বইটা বরং ওই বিশ্রী ব্যবস্থার প্রতিবাদ।

সমরেশ ধীরে ধীরে বলে, প্রকাশক হিসাবে নিজের নাম কেন দেব না বলেছিলাম জানো? প্রণতির জন্য মনটা বিগড়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম যে তুমি প্রণতির মত মেয়েদের সমর্থন করেছ আর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল।

নন্দিতা জোর দিয়ে বলে, প্রণতি চাকরী করছে, স্রেফ চাকরী করছে। আমি স্বামীর দাসীত্ব করি, আমার চেয়ে ওর বেশী সম্মান প্রাপ্য।

ভবানীর সঙ্গে চরম কলহের জন্য সমরেশ প্রস্তুত হয়েছিল।

অনেক বিরোধিতা করেও কিন্তু কলহটা সে কোনমতেই ঘটিয়ে তুলতে পারল না।

ভবানী তার সঙ্গে কলহ করতে রাজী নয়।

নীতি হিসাবেই যেন তার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করাটা ভবানী বাতিল করে দিয়েছে।

ভবানীর হিসাব অনুসারে সে অনেক রকম অন্যায় আব্দার করে, নানারকম অপমানজনক কথা বলে। ভবানী সয়ে যাবে এটা কল্পনাও করতে পারে না।

ভবানী যেন কাণেও তোলে না তার বিশ্রী কথা—তার ব্যবহার লক্ষ্য করে না। কাগজ পত্র ছাখে, একে ডেকে ওকে ডেকে কাজের কথা বলে, মান অপমানের ধার যেন সে ধারেই না।

সমরেশ বুঝতে পারে, এটা তার চাল।

কিন্তু কিসের চাল? তাকে একেবারে বাতিল করে দিলেই বা কি আসে যায় ভবানীর?

তার অপমান পর্য্যন্ত গায়ে মাখে না, কাযদা করে উড়িয়ে দেয়—এর একটা গুরুতর তাৎপর্য্য নিশ্চয় আছে !

অনিমা বলে ভাগ্নে, তুমি তো এবার আমায় বিপদে ফেললে! প্রেস চালাতে পারছ না, অথচ প্রেসটাই চালাবে গোঁ ধরেছে, তাই মেনে নিয়ে উনি আমায় জব্দ করছেন।

: জব্দ করেছেন মানে ?

: তাদের কমিয়েছেন, আব্দার মানছেন না।

: তোমার ব্যাপার তো নয় !

: আমার ব্যাপার বই কি। আমাকে বাদ দিয়ে কি তোমার প্রেস চলছে ভাগ্নে ? আমি গোঁ না ধরলে চলত ? আমার গোঁ-টাকেই এবার ও কাজে লাগাচ্ছে, আমার দফা নিকেশ করছে।

: আমি তো বলেছি নিজে চালাব।

: তুমি পাগল হয়ে গেছ !

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না ছোটমামী, সে অবস্থা আর নেই। তুমিই সত্যি প্রথমে মামাকে দিয়ে ব্যবস্থাটা করিয়ে দিয়েছিলে, আমি তখন মামার হুকুমে উঠতাম, বসতাম। তারপর নিজের ব্যবস্থায় চালাব ঠিক করে মামার কাছে সময় চেয়ে নিয়েছি—তোমায় কিছু বলতে আসি নি। মামা অবশ্য এমনিতে সময় দেয় নি, সর্ত করেছিল যে ছ'মাসে কিছু করতে না পারলে তোমাকে দিয়ে মামাকে আর জ্বালাতন করতে পারব না।

অনিমা গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা এসব কথা আমায় তুমি জানাও নি !

সমরেশ বলে, জানাবার উপায় ছিল না। তারপর আমি লাভ

দেখিয়ে মামাকে খুসী করেছি। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে একেবারে অন্যরকম। যেরকম ব্যবস্থায় লাভ দেখিয়েছিলাম সেটা বাতিল করে আমি আবার নতুন রকম ব্যবস্থা করেছি, মামা কিছুই বলছে না। ভেবেছিলাম ভয়ানক চটে যাবে—টুঁ শব্দ করছে না।

অণিমা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সমরেশ বলে, এ ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না আমি। ও মাসে গোকুলের যে বইটা বেরোল, তাতে সোজাসুজি মামাদের ঠোকা হয়েছে—ভীষণভাবে ঠোকা হয়েছে। মামা যদি মনে করত যে বিশেষভাবে ওকেই ঠোকা হয়েছে আমি আশ্চর্য্য হতাম না। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, বইটা পড়ে মামা শুধু আমায় জিজ্ঞেস করল—কত বই ছাপিয়েছি, কত কপি বিক্রি হয়েছে।

সমরেশ হাসবার চেষ্টা করে।—কাজেই বুঝতে পারছ দায়টা এখন আর তোমার নয়, মামার সঙ্গে আমার সোজাসুজি ঠোকাঠুকি চলছে।

অণিমা ম্লানমুখে হেসে বলে, দায় আমারই। তুমি রেহাই দিয়ে থাকলে কি হবে, উনি রেহাই দেবেন না। তাই তো ভাবছিলাম, আমার খাতির কেন এত কমে গেল।

নন্দিতা সব শুনে বলে, বাঁচলাম। ছোটগিন্নী কোনদিন ভাবতেও পারবে না আমার জন্য ওর খাতির কমেছে—হিংসায় বুক ফেটে মরবে না।

সমরেশ বলে, কিসে কি হবে না হবে সে বিষয়ে নিজের মতটাকে এত বেশী নির্ভুল ধরে রেখো না।

অনেকেই বলছে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে সমরেশের। নইলে ভবানীর সঙ্গে বিবাদ বাধায়, অজ্ঞাত অখ্যাত অল্প বয়সী লেখক-লেখিকার বিশ্রী রকম গরম গরম বই ছাপতে সুরু করে!

কুমারকে ভবানী অন্য চাকরীতে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তার মাইনে বেড়ে গেছে একশ' টাকা।

সুমিত্রা কিন্তু খুসী নয়।

সে বলে, তেমনি খাটুনি বেড়েছে তিনগুণ। যদিও বা বাঁচার কোন আশা ছিল—এবার দাদা আর বাঁচবে না।

: চিকিৎসা করাচ্ছে।

: এত খাটলে শুধু চিকিৎসা করে কারো রোগ সারে? দাদার উচিত ছিল কাজকর্ম বন্ধ করে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা সারানো।

: তোমাদের না খাইয়ে মেরে?

: আমার মরলে দাদার কি? দাদা মরলে আমাদের সেই এ কই অবস্থা হবে না?

: নিজে মরলে মা বোন মরবে এটা জেনেও নিজে বাঁচার জন্য কোন মানুষ মা বোনকে মরতে দিতে পারে না।

: তুমি একটু সামলাও না দাদাকে?

সমরেশ চুপ করে থাকে।

তার জ্বালা বোধ হয় যে সুমিত্রাও খেয়াল রাখে না কতদিকে তার কত দায়।

কুমার সত্যই দিন দিন আরও বেশী জীর্ণশীর্ণ হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে।

কেবলমাত্র নও-জোয়ান লেখক লেখিকাদের নিয়ে মাসিক আর বই ছাপানোর কারবার বছর খানেক চালিয়ে যাবার পর দেখা যায় সমরেশ লোকসান দিচ্ছে না, এভাবে চালাতে পরলে আর ছ'মাস একবছরের মধ্যে বরং কিছু কিছু লাভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

নও-জোয়ানেরা এসে আড্ডা জমায়। সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রেসটা হাসি গল্পে মুখরিত হয়ে থাকে।

সমরেশের আজকাল রাত্রে গভীর ঘুম হয়—কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় টেরও পায় না।

আগেও কম খাটত না—সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও রাত্রে ঘুমের জন্য ছটফট করত। চিন্তায় চিন্তায় জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল তার দেহ আর মন।

চিন্তা এখনো আছে—আগের চেয়ে বরং গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা নিয়েই এখন তার কারবার।

কিন্তু কাজের মূল সুরটা পালটে দিয়ে সমাজ আর জীবনের নতুন মূল্যের হিসাব কষে একার বদলে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলার নীতি আঁকড়ে ধরে সে যেন জীবনের আসল ছন্দ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

প্রীতি মাঝে মাঝে আসে, সে খুসী হয়ে বলে, তবু একটু মানুষের মত চেহারা হচ্ছে। কিন্তু এ রকম গরম গরম লেখা ছাপছিস, তোকে তো জেলে নিয়ে যাবে?

: উচিত কথা গরম হয়, করব কি!

প্রীতি নন্দিতাদের বাড়ীতেই থাকে। ইংরাজী মাসের তিন তারিখে বিরাম তাকে মনিঅর্ডার করে খোরপোষের টাকা পাঠায়। খরচ নিতে নন্দিতার বাবা কোন আপত্তি করে না।

কুমারকে বেশী মাইনের ভাল চাকরীতে লাগিয়ে দেবার পরেই ভবানী নন্দিতার কাছে হপ্তায় তিন দিনের বদলে সর্ব্বদা তার বাড়ীতে বাস করার দাবী জানিয়েছে এবং তাই নিয়ে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ বাধার উপক্রম হতেই কুমারকে ডাকিয়ে তাকে মধ্যস্থ মেনেছে!

এবং কুমার সমর্থন করেছে ভবানীকে।

: চাকরীর খাতিরে ওর দিকে টানছ ?

: না, এভাবে সপ্তাহে তিন দিন স্বামীর বাড়ী ঘিরে থাকার কোন মানে হয় না, উল্টোটা বরং বেখাপ্পা হয় না—দু'চারদিন পরে বাপের বাড়ী গিয়ে একটা দিন থেকে আসা।

নন্দিতা কিছুদিন সময় চেয়ে নিয়েছে। সে যে নতুন বইটা লিখছে সেটা শেষ করার পর নতুন ব্যবস্থা কি করা যায় সে বিবেচনা করবে।

মিত্রসাহেবের বাড়ীতে সুমিত্রার চব্বিশ ঘণ্টার চাকরী—সে কিন্তু অবসর বুঝে মিত্রসাহেবের বাচ্চা দুটোকে সঙ্গে করে দু'এক ঘণ্টা বাড়ীতে কাটিয়ে যায়।

কুমারের চেহারা আরও খারাপের দিকে যেতে থাকায় এবং চিকিৎসায় মোটা টাকা খরচ হতে থাকায় মেয়ের চাকরী নিয়ে পরের বাড়ী চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকাটা বোধ হয় মনে মনে মেনে নিয়েছে।

মেয়ে বাড়ী এলে আর গোমড়া মুখে চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকায় না, শান্তভাবে কথাবার্তা বলে।

সুমিত্রা মাঝে মাঝে সমরেশের আপিসে গিয়েও হাজির হয়। নওজোয়ানদের আড্ডায় অনায়াসে মিশ খেয়ে যায়।

কেউ কেউ তামাসা করে তাকে বলে, দেখলে মনে হয় কিন্তু বাচ্চা দুটো আপনারি !

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমারি তো ! খাওয়াই-দাওয়াই ঘুম পাড়াই —চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনা করি। নিজের পেটের বাচ্চার জন্যও কোন মা এতটা করে না।

সমরেশ তাই মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে যে জীবনের কী বিচিত্র রূপ আর গতি।

সে বুঝতে পেরে গিয়েছে যে নন্দিতা বা অনিমার খাতিরে নয়, তারই নতুন ধারার কাজের প্রক্রিয়াকে খাতির করে ভবানী তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না।

একটা বাধ্যতামূলক সার্বজনীন ছুটির দিন তাকে দুপুরে খেতে বলে, পাশাপাশি খেতে বসে, নন্দিতা ও অনিমার সামনেই বলে, যেমন চালাচ্ছিস চালিয়ে যা—কিন্তু আমার নামটা জড়াস্ না। আমার অন্য-রকম ব্যাপার, অন্যরকম লোকের সঙ্গে কারবার, বুঝিস তো?

সমরেশ বলে, তোমার নাম জড়াব কি মামা? তোমার নাম জড়ালে বরং আমার ক্ষতি হবে!

ভবানী খুশী হয়ে বলে, আমিও তাই বলছি। আমার নামটা একদম জড়াস নে।

অণিমা দু'জনের পাতে মাছের কালি দিতে দিতে বলে, ভাগ্নেকে অত বোকা ভেবে না। তোমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী চোখা।

ভবানী হেসে বলে, সে তো আমার আনন্দের কথা। ওকে আরেকটা মাছ দাও?

অণিমা বলে, আরেক রকম মাছ আছে। কাকে কি খেতে দেব না দেব, তুমি হুকুম চালিও না। যেমন রেঁধেছি বেড়েছি তেমনি তো খেতে দেব!

রীতিমত ধমক!

সমরেশ মাথা নীচু করে থাকে।

ভবানী আবার বলে, আমি যে পেছনে আছি—টাকা পয়সা দিয়ে আর অন্যভাবে সাহায্য করছি, এসব কাউকে বলবি না।

সমরেশ বলে, ভয় পাচ্ছ কেন মামা? আমি নিজের বিচার বুদ্ধি অনুসারে কারবার চালিয়েছি, তোমার নাম জড়িয়ে আমার কোন লাভ আছে? তোমার নাম এড়িয়ে চললেই বরং আমার মঙ্গল।

অণিমা হঠাৎ যেন ক্ষেপে যায়।

রেগে আগুন হয়ে বলে, তুমি তো সত্যি সত্যি আজকাল বড় ছোটলোক হয়ে গেছ ভাগ্নে? ওই সব ব্যবস্থা করে দিল, মুখের ওপর ওকেই তুমি এভাবে অপমান করছ।

সমরেশ বুদ্ধিমানের মত মুখ বন্ধ রাখে। ভবানীর সঙ্গে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

অনিমার নিজের হাতে তেল ঝাল মসলা দিয়ে রান্না করা মাছের ঝোল তৃপ্তির সঙ্গে ঘবে গলানো বিদেশী মাখনের ঘিয়ে তৈরী পরোটা দিয়ে খেতে খেতে ভবানী বলে, আমরা কাজের কথা বলছি, দরকারী কথা বলছি। এসব হল স্রেফ কি করা ভাল আর কি করা ভাল নয় তার হিসাব নিকাশ। আমার নাম রাখবে কি রাখবে না সেটা হিসাবের ব্যাপার—তাতে আমার মান অপমানের প্রশ্নই নেই। তুমি কিছু না বুঝে অযথা ওকে গঞ্জনা দিলে।

সমরেশ নীরবে খেয়ে যায়। দু'রকম মাছের মেশানো স্বাদে সে যেন একেবারে মজে গেছে।

সমরেশের পাতে আরেক টুকরা মাছ তুলে দিয়ে অনিমা জিজ্ঞাসা করে, রাগ করলে নাকি ভাগ্নে?

সমরেশ মুখ তুলে বলে, এ রকম মাছ রাঁধতে কোথায় শিখেছ ছোট মামী? হোটেলকে যে হার মানালে।

ভবানী মাথা নীচু করে খেয়ে যায়।

অনিমা খিল খিল করে হাসে।



॥ সমাপ্ত ॥